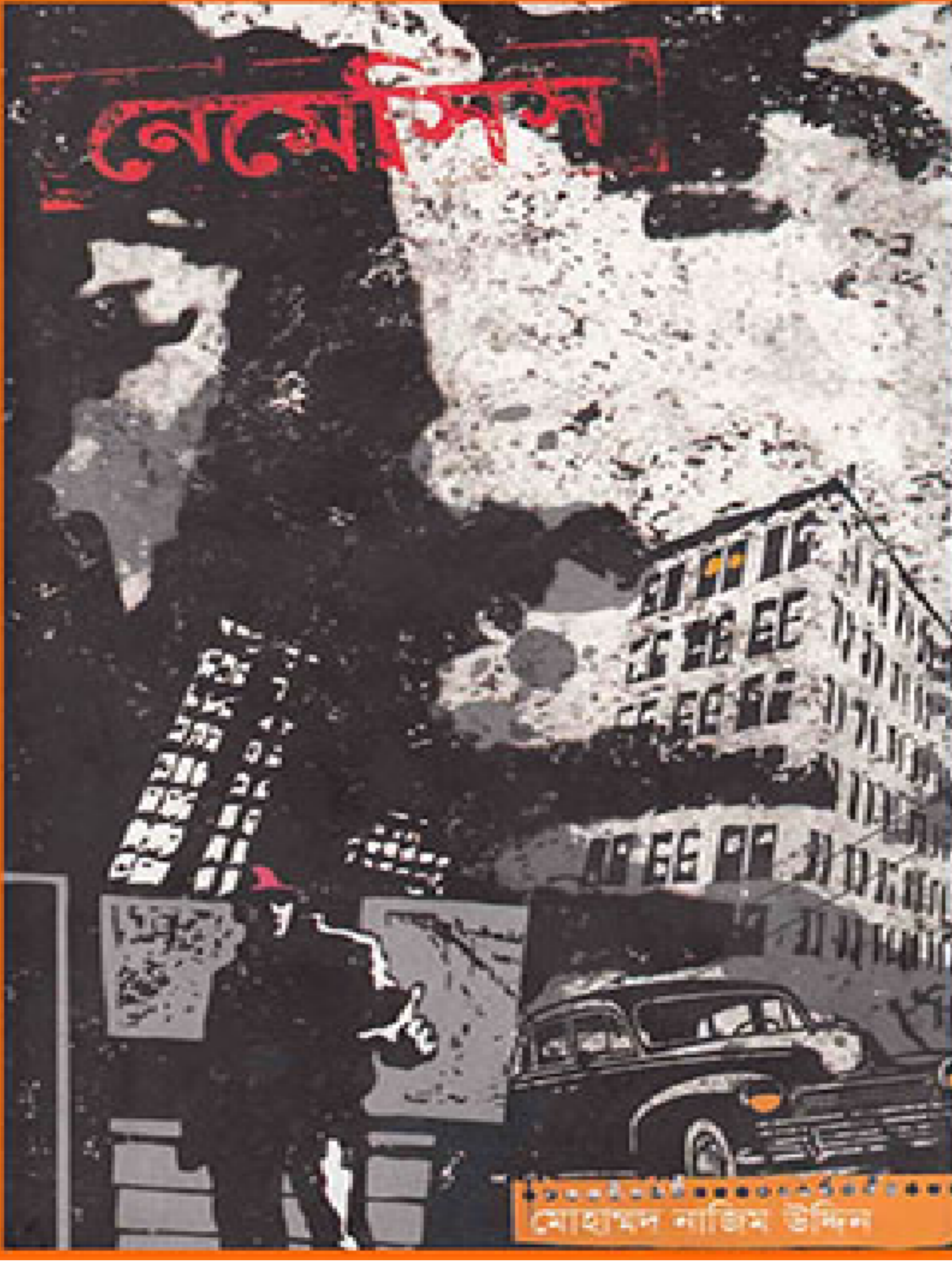

নেমেসিস
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

নেমেসিস



নেমেসিস
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

বাতিঘর প্রকাশনী

নেমেসিস
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

NEMESIS
Mohammad Nazim Uddin

তৃতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০১২
দ্বিতীয় সংস্করণ: মার্চ ২০১০
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১০

বাতিঘর প্রকাশনী
৩৭/১ বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তল), ঢাকা-১১০০
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কতৃক প্রকাশিত
মুদ্রণ: একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট
৩৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
কম্পোজ: লেখক

মূল্য: দুইশত টাকা মাত্র

সপ্তদশ মুদ্রণের ভূমিকা :

আমার প্রথম মৌলিক উপন্যাস নেমেসিস প্রকাশিত হয়েছে আজ থেকে এগারো বছর আগে, ২০১০ সালে। প্রকাশ হবার পর থেকে সময় যতই গড়াচ্ছে বইটির পাঠকপ্রিয়তা ততই বাড়ছে। নিঃসন্দেহে লেখক হিসেবে এটা আমার জন্য সুখকর। কখনও ভাবিনি প্রথম মৌলিক উপন্যাসটি এতদিন পরও পাঠক আগ্রহভরে পড়বে। এ জন্যে পাঠকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তারাই আমাকে বাধ্য করেছিল নেমেসিস-এর সিকুয়েল কন্ট্রাক্ট লেখার জন্য, আবার তারাই এই সিরিজটির নামকরণ করেছে 'বেগ-বাস্টার্ড' সিরিজ হিসেবে কোনো সিরিজের বেলায় এমনটি ঘটেছে বলে অন্তত আমার জানা নেই।

সিরিজ হলেও আমি সব সময় চেষ্টা করেছি প্রতিটি গল্প ভিন্ন আমেজে উপস্থাপন করতে- সিরিজের গৎবাধা নিয়মে আবদ্ধ থাকতে চাইনি কখনও। সেজন্যে এই এটি কখনও মার্ডার মিস্ট্রি, কখনও বা পলিটিক্যাল কন্সপিরেসি থ্রিলার, বিশুদ্ধ ক্রাইম-ফিকশন, ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির গল্প থেকে এসপিওনাজ থ্রিলারও হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতেও আমি এ ধারা অব্যাহত রাখবো। সিরিজের ষষ্ঠ বইটি এ বছরেই বেরুবে।

নেমেসিস আমার প্রথম মৌলিক উপন্যাস হিসেবেই কেবল নয়, বাংলায় মৌলিক থ্রিলারকে শক্তপোক্ত একটা ভিত্তি তৈরি করতেও সাহায্য করেছে। মৌলিক থ্রিলারের নতুন এই অধ্যায়ের সৃষ্টিতে রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, তাই এই বইটির নতুন মুদ্রণ হলেই আমার অন্য রকম একটি অনুভূতি হয়। যেমনটা হচ্ছে এখন।

প্রিয় পাঠক, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন।

–মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
আগস্ট, ২০২১
ঢাকা

উৎসর্গ **:**

যাকে আমি পাইনি...

আমার বাবা মরহুম মোহাম্মদ বদরুদ্দিন

এবং

যাকে আমি পেয়েছিলাম...

আমার বড়চাচা মরহুম মোহাম্মদ আলাউদ্দিন

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে, পিডিএফ-এ বেশীরভাগ সময় খাকে না।) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

অধ্যায় ১

অন্ধকার ঘরের চারপাশটা তার কাছে একটু একটু করে উদ্ভাসিত হতে লাগল। ঠিক কতোক্ষণ আগে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বুঝতে পারছেন না। আজকাল গাঢ় ঘুম হয় না বললেই চলে। শরীর যখন সচল ছিল কোনোরকম প্রচেষ্টা ছাড়াই ঘুমিয়ে পড়তেন। আজ তিনি গাছের মতোই অচল; ছবির মতো স্থির; কিন্তু ঘুম তার কাছে দূর্লভ হয়ে গেছে। স্লিপিং পিল ছাড়া ঘুম আসে না। কয়েক ঘণ্টা আগে হাউজ-নার্স ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিয়ে গেলে একটা ঘোর ঘোর ভাব এসে ভর করেছিল দুচোখের পাতায়।

পাশের ঘর থেকে পরিচিত একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। এই শব্দটিই তার স্বল্পদৈর্ঘের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। খুব ক্ষীণ হলেও কানে বেশ পীড়া দিচ্ছে। সেটা। ইদানিং তার ইন্দ্রিয়গুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রখর হয়ে উঠেছে। নিঃশব্দের মধ্যেও অনেক শব্দ শুনতে পান। এমন অনেক কিছু বুঝতে পারেন যা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। চারপাশের অনেক কিছুই তার কাছে এখন নতুন মাত্রায় উপস্থিত হয়। কোনো ঘটনা ঘটার আগেই তিনি টের পেয়ে যান। ঠিক এ রকম একটি অনুভূতি এখন তার হচ্ছে।

অবশ্য কখনও কখনও তার মনে হয় সন্দেহবাতিকতায় ভুগছেন হয়তো। সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন বুঝি, কিংবা পুরোটাই তার বিভ্রান্তি। হেলুসিনেশন? তিনি কোনো উপসংহারে আসতে পারেন না।

নারী কণ্ঠটা খুবই পরিচিত। পুরুষ কণ্ঠটা চেনার চেষ্টা করলেন। তাদের উচ্ছ্বাসের প্রকাশ তাকে ঈর্ষাকাতর করে তুলল, কিন্তু অনেক দিন পর, তিনি বেশ অবাক হয়েই টের পেলেন, উত্থান ঘটেছে। এ রকম নিশ্চল-নিথর দেহে এতো তীব্র আর অস্বাভাবিক উত্থান ঘটলো বলে তিনি বিস্মিতই হলেন। মানুষ খুবই বিচিত্র। মস্তিষ্কের চেয়ে তার শরীর কোনো অংশে কম বিচিত্র নয়। বিগত এক বছরে এই প্রথম এ রকমটি হলো। সেটাও কি না এ রকম অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে!

নারী কণ্ঠটা এখন বেশ তুঙ্গে উঠে গেছে। পুরুষটি অনেক বেশি সচেতন আর সতর্ক; নিজের সমস্ত আবেগ দমিয়ে রেখেছে সে। চোরেরা একটু বেশিই সতর্ক থাকে, কথাটা যেন তার আড়ষ্ট ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে প্রায় উচ্চারিত হয়েই যাচ্ছিল।

একটু পর আর কোনো সাড়া শব্দ নেই। হয়ে গেছে। তিনি ভাবতে লাগলেন তারা এখন কী করছে। এ রকম সময় তিনি কি করতেন? একটা। সিগারেট ধরাতেন। নয়তো একেবারে চুপ মেরে পড়ে থাকতেন বিছানায়। আর গোলর? সঙ্গে সঙ্গে আরো অসংখ্য মুখ তার মনের পর্দায় ভেসে উঠল। ইচ্ছে করেও তিনি সেইসব মুখ কোনোভাবেই সরাতে পারলেন না। একেকটা মুখ একেকটা দৃশ্যের অবতারণা করছে।

আফিয়া, মিতুল, শর্বরী, রিমি, মেরি, ইরা...! মাথাটা ঝাঁকিয়ে এইসব নাম আর দৃশ্যগুলো বিদায় করতে চাইলেন, কিন্তু সেই সাধ্য তার নেই। এখন আর ইচ্ছেমতো নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াতে পারেন না। আজকাল তার কাছে সবচাইতে ভয়ঙ্কর মুহূর্ত হলো এটিই। স্মৃতির উপরে মানুষের নিয়ন্ত্রণ যে কতো কম সেটা এই অবস্থায় না এলে হয়তো কখনই বুঝতেই পারতেন না।

আজকাল শৈশবের কথা খুব মনে করতে চান, কিন্তু সেই স্মৃতি এতোটাই ঝাপসা হয়ে গেছে যে, সেটা আরো বেশি পীড়াদায়ক ঠেকে তার কাছে। অথচ কোনোরকম প্রচেষ্টা ছাড়াই তিক্ত আর নষ্ট স্মৃতিগুলো অযাচিতভাবে এসে পড়ে।

আরেকটা শব্দ তার চিন্তায় ব্যঘাত ঘটালো-টয়লেট ফ্লাশ করা হচ্ছে। কে করছে?

পুরুষ আর নারী কণ্ঠের মৃদু ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে এখন। তারা কথা। বলছে। এসবের পরে কথা বলার কোনো মানে হয় না। তিনি নিজে এ রকম মুহূর্তে কোনো কথা বলতেন না। পর পর কয়েকটা সিগারেট শেষ করে ঘুমিয়ে পড়তেন অথবা নতুন কোনো আইডিয়া মাথায় চলে এলে লিখতে বসে যেতেন।

নারী-পুরুষের ফিসফিসানিটা এখনও চলছে। চাপা কণ্ঠে কী নিয়ে যেন কথা বলছে তারা। আস্তে আস্তে তার হাতের পশম কাটা দিয়ে উঠল। শরীরে এক ধরণের অনুভূতি বয়ে যাচ্ছে। আজকাল এই ব্যাপারটা নিয়ে ভেতরে ভেতরে বেশ ভয়ে থাকেন। প্রায়ই মনে হয় তার চারপাশের মানুষজন তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে। তার এই সন্দেহটা কি সম্পূর্ন অমূলক?

খ্যাচ করে একটা শব্দ হলে তার ইন্দ্রিয় আবারো সজাগ হয়ে উঠল। এই ঘরের জমিনটা যেন তার নিজের শরীর। কেউ এখানে পদার্পণ করলে তিনি টের পেয়ে যান। এখনও তার সে-রকম অনুভূতি হচ্ছে। অন্য কেউ হলে এই সামান্য শব্দ নিয়ে মাথা ঘামাতো না-একটা বেড়াল কিংবা বাতাসের ঝাঁপটা। অথবা সবটাই তার বিভ্রান্তি। না কি হেলুসিনেশন? তার সবচাইতে প্রিয় শব্দ। এই শব্দটাকে তিনিই জনপ্রিয় করেছেন।

মানুষের নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন। খুবই মৃদু। একেবারে কাছ থেকে! তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন না। এটা তার পক্ষে সম্ভবও নয়। পুরো শরীরের মধ্যে ডানহাতটাই সচল আছে, বামহাতটা থেরাপি করার পর এখন সামান্য নড়াচড়া করতে পারেন। অনেকের কাছে এটি অলৌকিক একটি ব্যাপার। এর ফলে তার লেখালেখিতে কোনো ছেদ পড়েনি, বরং আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে তার লেখার পরিমাণ বেড়ে গেছে। আগে হাতে লিখলেও এখন ল্যাপটপে লেখেন। হাতে লিখতে গেলে বেশিক্ষণ লিখতে পারেন না। টাইপিংয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। ইদানিং বিছানায় শুয়ে শুয়ে সারা দিনই লেখালেখি করেন তিনি।

ঘরে কোনো বাতি জ্বলছে না। আজ পূর্ণিমা। দক্ষিণের বেলকনির স্লাইডিং ডোরটা খোলা থাকায় বাইরের জ্যোৎস্না ঘরে ঢুকে পড়েছে। এ রকম জ্যোৎস্না সব সময়ই তার ভালো লাগে, কিন্তু আজকে তার কাছে এটা অসহ্য লাগছে।

হঠাৎ জ্যোৎস্নার সেই মৃদু আলোয় আবছায়া এক মূর্তি তার সামনে এসে দাঁড়াল। কালো পোশাকের কারণে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। মুখটা দেখার জন্যে চোখ কুচকালেন তিনি কিন্তু চশমা ছাড়া যে এই স্বল্প আলোতে কিছু দেখবেন না সেটা বুঝে ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে।

সব মেনে নিয়েছেন এ রকম একটি ভঙ্গি করে নিস্তেজ হয়ে গেলেন। দীর্ঘদিন এ রকম মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করেছেন-চূড়ান্ত পরিণতির সময় একেবারে স্বাভাবিক আর স্থির থাকবেন। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও বেঁচে থাকার জন্যে কোনোরকম পাগলামী করবেন না। অন্তিম মুহূর্তটি প্রজ্ঞা আর বিচক্ষণতার সাথে গ্রহণ করবেন।

“কে?” অলৌকিকভাবে কথাটা উচ্চারণ করলেন। দীর্ঘ সময় অব্যবহৃত থাকার ফলে কণ্ঠটা ফ্যাসূফেসে শোনালো। বিস্ময়করভাবেই তার সামনে। দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি চমকালো না বলে তিনি অবাকই হলেন।

দ্বিতীয়বার কিছু বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না। লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবছে।

এক সেকেন্ড। দুই সেকেন্ড। তিন সেকেন্ড।

একেবারেই নড়ছে না।

তিনিও অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এবার আস্তে করে কাছে এসে লেখকের মুখ চেপে ধরল সে। লেখকের ডানহাত লোকটার কব্জি ধরে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে, অনেকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই, কিন্তু লেখকের শক্তিহীনতার জন্যে তাতে কোনো প্রতিরোধ তৈরি হলো না।

আরেকটা হাত দিয়ে অজ্ঞাত লোকটি সজোরে লেখকের বুকের বামদিকে, ঠিক যেখানটায় বছরখানেক আগে ওপেনহার্ট সার্জারি হয়েছে, ঘুষি চালাল।

লেখক নিজে থেকে নয়তো ঘুষির কারণে চোখদুটো বন্ধ করে ফেললেন। ঘন অন্ধকারে তার সমস্ত জগত ঢেকে গেল নিমেষে। সেই গাঢ় অন্ধকারে শৈশবের কথা ভাবার চেষ্টা করলেন তিনি। শেষ মুহূর্তে কিছু সুন্দর দৃশ্য দেখতে চাইলেন। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। খুব সম্ভবত আরেকটা ঘুষি তার বুকের বামদিকে করা হয়েছে, কিন্তু তিনি নিশ্চিত হতে পারলেন না। কেবল বুঝতে পারলেন, পুরো বুকটা চেপে আসছে চারপাশ থেকে। যেন দু-হাতে কেউ তার বুকটা সজোরে চেপে ধরেছে।

কয়েক সেকেন্ড পর তার শরীরটা উধাও হয়ে গেল। শুধু মস্তিষ্কটা কাজ করছে এখন। তিনি বুঝতে পারছেন মৃত্যু তাকে আলিঙ্গণ করছে। এই অভিজ্ঞতাটি কেমন সেটা নিয়ে অনেক ভেবেছেন, নিজের সৃষ্ট অনেক চরিত্রের মৃত্যুদৃশ্য নির্মাণ করতে যেয়ে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু এখন তার যে অনুভূতি হচ্ছে সেটা বর্ণনাতীত। অনির্বচনীয়! এই অভিজ্ঞতা পৃথিবীর কেউই বর্ণনা করে যেতে পারে না।

কতোক্ষণ লাগবে?

ব্যাপারটা দ্রুত শেষ হয়ে গেলে তার মুক্তি ঘটবে। কিন্তু প্রক্রিয়াটি শেষ হচ্ছে না। শৈশবের একটা ছবি ভাবার চেষ্টা করলেন। আসছে না। নিজের এই অবস্থা ভুলে সুন্দর কোনো মুহূর্ত স্মরণ করার চেষ্টা করছেন, পারছেন না। বুঝতে পারলেন সত্যের কোনো মূল্য নেই। অন্তত এই মুহূর্তে তার কাছে সত্যের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন একটা সুন্দর মুহূর্তের। সে-রকম কোনো সুন্দর সুখস্মৃতির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তিনি।

অবশেষে ছবিটা ভেসে উঠল । কিন্তু খুব বেশি সময় কি আছে?

একটা সরু খালে দুটো বাচ্চা ছেলে ডিঙ্গি নৌকায় করে শাপলা ফুল তুলছে আর একে অন্যের দিকে পানি ছুঁড়ে মারছে...

***

ঠিক একই সময়ে, ভিটা নুভা অ্যাপার্টমেন্টের সামনের রাস্তার ফুটপাতে অল্পবয়সি এক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টি রাস্তার ওপারে ভিটা নুভার ছয় তলার কর্নার ফ্ল্যাটের বেলকনির দিকে। গভীর মনোযোগের সাথে কী যেন দেখছে সে। ছেলেটার ভাবভঙ্গি দেখে যে কেউ সন্দেহ করবে। সত্যি বলতে, ছেলেটা স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।

রাত প্রায় দুটো। পুরো শহর ঘুমিয়ে আছে। শহর কখনও ঘুমায়—ঢাকার জন্যে এ কথাটি প্রযোজ্য নয়। এক কোটি লোকের এই শহর মাঝরাতের দিকে প্রায় ভুতুরে শহরে পরিণত হয়। যদিও এর আসল এবং অদ্ভুত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে নিঝুম রাতেই। সেটা নিশাচরেরাই ভালো জানে।

প্রশস্ত রাস্তাগুলো একেবারে ফাঁকা নয়, দুয়েকটা ভারি যানবাহন আর পুলিশের টহল গাড়ি আসছে যাচ্ছে। আধঘণ্টা আগে স্থানীয় থানার একটি টহল গাড়ি এই রাস্তায় টহল দিয়ে গেছে। আরেকবার এখান দিয়ে গাড়িটা যাবে। আজকের রাতের ডিউটি শেষ করে একটু পরে থানায় ফিরে যাবে এ পথ দিয়েই।

চার্লি ফোরের দায়িত্বে থাকা ইন্সপেক্টর এলাহী নেওয়াজ আরেকটা বিশেষ সিগারেট ধরাল। কাটাবন থেকে সন্ধ্যার দিকে উপঢৌকন হিসেবে পেয়েছে। রাতের ডিউটি দিতে তার

একটুও ভালো লাগে না। কিন্তু পুলিশের চাকরি করলে ভালো-মন্দ বলে কিছু থাকতে নেই। যে লোককে এই চাকরিটা পাইয়ে দেবার জন্যে দেশের জমিজমা বেচে নগদ দুই লাখ টাকা দিয়েছিল তাকে যদি এখন হাতের কাছে পেতো...

"গাড়ি থামাও!" গর্জে উঠল এলাহী। পিকআপ ভ্যানের ভেতরে বসে থাকা তিনজন কনস্টেবল আর ড্রাইভার চম্‌কে উঠল।

"কি হইছে, স্যার?" পাশে বসে থাকা ড্রাইভার ওয়াদুদ বলল।

"আরে, আগে গাড়িটা থামাও।" বলেই সে রাস্তার ডানদিকে ইঙ্গিত করল। ড্রাইভার দৃশ্যটি দেখার আগেই তাদের গাড়ি বেশ কিছুটা দূরে চলে এসেছে।

খ্যাচ্‌ করে গাড়ি ব্রেক করার যে শব্দ হলো তাতে করে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটি একটুও চমকালো না। এটা একেবারেই অস্বাভাবিক আচরণ। এলাহী নিজের পিস্তলটা হোলস্টার থেকে বের করে হাতে নিয়েই ক্ষান্ত হলো না, সেফটি লটাও খুলে ফেলল। এক অজানা আশঙ্কা তার ষষ্ঠইন্দ্রিয়কে সজাগ করে তুলেছে। ইন্সপেক্টর ভ্যানের পেছনে বসা তিনজন কনস্টেবলকে ইশারা করলে তারাও পুলিশ বাহিনীতে সদ্য বিতরণ করা অত্যাধুনিক মার্ক ফোর রাইফেল নিয়ে ভ্যান থেকে নেমে পড়ল। তাদের তিনজনের কেউই এখন পর্যন্ত এই অস্ত্রব্যবহার করেনি। তাদের অভিজ্ঞতা বলতে প্রথম মহাযুদ্ধে ব্যবহার করা থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল। এখন এই নতুন অস্ত্র তাদেরকে দেয়া হলেও ফায়ারিং প্র্যাকটিসে পাঁচটি গুলি করা ছাড়া সত্যিকারের কোনো অ্যাকশনে ব্যবহার করা হয়নি। আজকেও যে করা হবে তার কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছে না।

একটা নিরীহ মাল।

তিনজন কনস্টেবল আর পিস্তল হাতে উদ্যত এক ট্রিগারহ্যাপি ইন্সপেক্টরকে মোকাবেলা করা তার পক্ষে কখনও সম্ভব হবে না।

এলাহী পিস্তলটা নিচু করে রেখে ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেল। তাকে অনুসরণ করল তিনজন কনস্টেবল। তারা যখন মাত্র দশ গজ দূরে তখনই ছেলেটা তাদেরকে দেখতে পেল। ছয় তলার বেলকনির দিকে এমনভাবে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল যে এতোক্ষণ কিছুই খেয়াল করেনি। পুলিশ দেখেই ভড়কে গেল সে। সব দুষ্কৃতিকারীই পুলিশ দেখলে ভড়কে যায়।

"অ্যাই ছেলে, এতো রাতে এখানে..." এলাহী বাক্যটি শেষ করার আগেই ছেলেটি তাদেরকে অপ্রস্তুত করে আচমকা দৌড় দিল।

এলাহী ছেলেটার পেছন পেছন দৌড়ে গেল না। আটত্রিশ বছর বয়সে তার ভুড়ির অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে এই ছোকরার পেছনে দৌড়ে সে কুলাতে পারবে না।

"শালারে ধরো," হতভম্ব তিন কনস্টেবল, যারা অফিসারের উপস্থিতিতে নিজস্ব বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে অভ্যস্ত নয়, এলাহী তাদেরকে নির্দেশ দিল।

কনস্টেবল তিনজন নিজেদের ভারি রাইফেলটা কোনোরকম সামলে নিয়ে ছেলেটার পেছনে ছুটলো। ইতিমধ্যে ছেলেটা বেশ দূরে চলে গেছে।

এলাহী ভ্যানে উঠতে উঠতে ড্রাইভারকে বলল, "ওয়াদুদ, জলদি চলো।"

গাড়ির ইঞ্জিন চালুই ছিল, মুহূর্তে ছুটতে শুরু করল সেটা।

***

পানির ঝাঁপটা মুখে এসে লাগতেই অদ্ভুত এক ভালো লাগার অনুভূতিতে আক্রান্ত হলেন তিনি। এই দম বন্ধ অবস্থায়, সুতীব্র যন্ত্রণায় এ রকম অনুভূতি তার কাছে স্বর্গের মতো মনে হচ্ছে। মনেপ্রাণে তিনি চাচ্ছেন মৃত্যু যেন দ্রুত গ্রাস করে তাকে।

শৈশবের ছবিটা মিইয়ে গিয়ে একে একে অসংখ্য ছবি ভেসে উঠল তার মনের পর্দায়।

কোনোটা সুখের, কোনোটা সুতীব্র দুঃখের, আবার কোনোটা অনুশোচনার। সবই জীবনের অংশ।

বুকটা আরো চেপে এল। এখন তার মনে হচ্ছে সমস্ত প্রাণটা মুখ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। বমি করার মতো একটা অনুভূতি হলো। আমি কি বমি করছি?

এ ক-দিন তিনি নিজেকে সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত বলে মনে করেছিলেন, আজকের এই ঘটনায় তার সেই ধারণার অবসান হয়েছে। এই একটা সুখস্মৃতি তাকে শেষবারের মতো কিছুটা হলেও শান্তি দিল, কিন্তু এই মুহূর্তের সব কিছুই খুব বেশি ক্ষণিকের। একটা মুখ ভেসে উঠতেই তার সব শান্তি তিরোহিত হয়ে গেল নিমেষে।

কতো মায়াবী মুখটা! একসময় এই মুখটি তাকে কিভাবেই না আন্দোলিত করতো। মুখটার করুণ অভিব্যক্তি তাকে পীড়িত করল। কতো গল্প জড়িয়ে আছে একে নিয়ে! এই মুখটা এক সময় তাকে অনুপ্রেরণা দিতো। জাগিয়ে তুলতো। এক নজর দেখার জন্যে ছুটে আসতে পারতেন বহু দূর থেকে, কিন্তু এখন! মুখটার মলিনতা, বিমর্ষতা তাকে মৃত্যুর চেয়েও

সুতীব্র যন্ত্রণা দিচ্ছে। তিনি এ থেকে পরিত্রাণ চান। মৃত্যুর কৃষ্ণগহ্বরে হারিয়ে গিয়ে এ থেকে নিষ্কৃতি চান।

লেখক মারা গেছে কি না নিশ্চিত হবার জন্যে ঘাতক লেখকের মুখ থেকে তার বামহাতটা সরিয়ে একটু ঝুঁকে এল। লেখকের চোখদুটো বন্ধ। নিস্তেজ শরীরটায় কোনো প্রাণ আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। বুকের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল শ্বাসপ্রশ্বাসে আন্দোলিত হচ্ছে না সেটা।

কিন্তু হঠাৎ করেই যেন এই জড়বৎ মৃতদেহের মুখটা ক্ষণিকের জন্যে সজীব হয়ে উঠল। তবে এতো অল্প সময়ের জন্যে যে ঘাতককে তেমন কিছু করতে হলো না।

লেখক শেষ যে কথাটি বললেন সেটা এই পৃথিবীর কেউই হয়তো বুঝতে পারবে না। এ রকম মুহূর্তে এটাকে নিছক অসংলগ্ন কোনো কথা বলেই মনে হবে। তিনি ছাড়া এ ঘরে একমাত্র যে ব্যক্তিটি আছে কথাটা নিশ্চয় তাকে উদ্দেশ্য করেও নয়। খুনি নিজেও কথাটা শুনে প্রথমবারের মতো একটু চমকে উঠল।

“…আমাকে ক্ষমা করে দিও!”

অধ্যায় ২

আধো আলো অন্ধকার একটি ঘর। রকিংচেয়ারে একজন মানুষ বসে আছেন। তার চোখে ঘুম নেই। সিভাস রিগালের প্রভাবে একটু ঝিমুনি এলে চোখদুটো কেবল বন্ধ করেছিলেন, তা-ও দশ মিনিটের বেশি হবে না।

একটা ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছেন। একজন বিজনেস টাইকুন হিসেবে রাত-বিরাতে অনেক ফোনই তাকে রিসিভ করতে হয়, এটা তার জন্যে নতুন কিছু নয়, তবে অনেক সময় নির্দিষ্ট কলটি আসতে দেরি করে আর তখনই তার মেজাজ বিগড়ে যায়, মনে নানা রকম আশঙ্কা হতে থাকে। আজকের ফোনটাও দেরি করছে। বলা যায় খুব বেশিই দেরি করছে। এখন ভোর চারটা। শীতের দিন বলে বাইরে তাকালে মনে হবে রাত একট কি দুটো বাজে। তিনি জানেন শীতের দিনে রাত একটা আর ভোর তিনটা চারটার মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য থাকে না।

খুব তেষ্টা পেলে চোখ খুললেন। সামনে রাখা সিভাস রিগালের প্রায় খালি হওয়া বোতলটা একটু ঝুঁকে হাতে তুলে নিলেন।

আছে, এখনও একটু আছে।

গ্লাসে না ঢেলে সরাসরি বোতল থেকেই বাকিটা শেষ করে ফেললেন।

সিভাস রিগাল পাকস্থলীতে পড়তেই শরীরটা একটু চাঙ্গা হয়ে গেল। মুখটাও বিস্বাদ লাগছিল এতোক্ষণ, সেই ভাবটাও কেটে গেল মুহূর্তে। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চাটতেই তার সেলফোনটা বেজে উঠল।

প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে। অপরিচিত একটি টিঅ্যান্ডটি নাম্বার। একটু অবাক হলেন তিনি। বুঝতে পারলেন না রিসিভ করবেন কি না। অবশেষে কলটা রিসিভ করলেও নিজে থেকে কিছু বললেন না। এটাই তার স্বভাব। ফোন করেছো তুমি, তুমিই আগে নিজের পরিচয় দেবে।

ওপাশ থেকে যে কণ্ঠটা শুনতে পেলেন সেটা তাকে খুবই বিস্মিত করল। কিন্তু নিজের এক্সপ্রেশন লুকিয়ে রাখার মধ্যেই অর্ধেক সফলতা নিহিত থাকে—আজীবন এই কথাটা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এসেছেন তাই ফোনের ওপর পাশের ব্যক্তিটি কোনোভাবেই বুঝতে পারল না তিনি বেশ অবাকই হয়েছেন।

"সি ই এ সিদ্দিকী বলছেন?" কণ্ঠটা কর্তৃত্বপরায়ণ। এ রকম কর্তৃত্ব ফলায় বড় আমলা, সামরিক বাহিনীর অফিসার আর পুলিশের লোকেরা। প্রথম দুটি দল এতো রাতে তাকে ফোন করবে সেই সম্ভাবনা একেবারেই কম। অতএব এটা যে পুলিশের সেটা বুঝে নিতে মাত্র দু-সেকেন্ড সময় লাগল তার।

"কেন, কি হয়েছে, তিনি নিজের পরিচয়টা নিশ্চিত করলেন না, সরাসরি প্রসঙ্গে চলে গেলেন।

ওপাশের লোকটি খুব তাড়ায় আছে, সে-ও সরাসরি আসল কথায় চলে এল। "আপনার ছেলে ইরামকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি।"

সিদ্দিকীসাহেব একটু অবাক হলেন। শেষবার যখন ইরামের ঘরে উঁকি মেরেছিলেন তখনও দেখেছেন তার ছেলে ইন্টারনেট ব্রাউজ করছে। সেটা অবশ্য রাত এগারোটার দিকে-এখন থেকে পাঁচ ঘণ্টা আগে।

"কি করেছে সে, কোত্থেকে অ্যারেস্ট করেছেন?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

শেষরাতে গ্রেফতার হওয়া ছেলের বাবা হিসেবে লোকটার কণ্ঠস্বর বেশ স্বাভাবিক-

ফোনের অপরপ্রান্তে থাকা ইন্সপেক্টর এলাহী নেওয়াজ ভাবলো। “ধানমণ্ডি থেকে। আর বাকিটা শুনতে হলে আপনাকে যে একটু থানায় আসতে হবে, স্যার...” এলাহী কেন স্যার সম্বোধন করল বুঝতে পারল না। এখনও সে মধ্যবিত্তের জি হুজুর’সুলভ মনোভাব পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। লোকটার শীতল আর রাশভারি কণ্ঠ তাকে দিয়ে স্যার বলিয়ে নিয়েছে।

“...এক্ষুণি ধান-”

কথাটা শেষ করার আগেই সিদ্দিকীসাহেব ফোনটা রেখে দিলেন। তাকে এখন আরেকটা জায়গায় ফোন করতে হবে। এতো রাতে এ রকম এক হোমরাচোমরাকে ফোন করার জন্যে তিনি মোটেও ইতস্তত বোধ করলেন না। তার মতো ধনীদের সেবা করতে পারলে এইসব ক্ষমতাবানেরা ধন্য হয়ে যায়।

তার এই ফোনের সিমে খুব বেশি নাম্বার নেই। হাতেগোনা কয়েকটা নাম্বারই এতে সংরক্ষিত আছে।

রিং হচ্ছে। একবার...দু-বার...তিনবার...

রাতের এ রকম সময় কেউ ফোনের কাছে বসে থাকবে সে আশা তিনি করেন না। বিশেষ দরকার না হলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন, কিন্তু এখন অপেক্ষা করা যাবে না।

লাইনটা কেটে গেলে এলাহী কী করবে বুঝতে পারল না। সে কি আবার ফোন করবে?

ক্লান্ত শরীরটা চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে ফোনটা বুকের কাছে কিছুক্ষণ ধরে রাখল। তারপর ফোনটা রেখে হুঙ্কার দিল সে, “জলিল, এক কাপ চা দিতে এতোক্ষণ লাগে?”

অনেক ধকল গেছে। এই আধপাগলা ছেলেটা বেশ ভুগিয়েছে। আধমাইল দৌড়ে অবশেষে দম ফুরিয়ে নিজে থেকে ফুটপাতে বসে না পড়লে তাকে ধরা যেতো কি না সন্দেহ। তার তিনজন কনস্টেবল রাইফেল সামলাবে না দৌড়াবে এই সিদ্ধান্ত নিতে নিতে অবশেষে যে দৌড় দিয়েছে সেটা দেখলে কার্টুন ছবির কথাই বেশি মনে পড়ে যায়।

আর এই ছেলেটা! উফ! আস্ত একটা গজব। কিছুতেই মুখ খুলছে না। কয়েকদিন আগে ধানমণ্ডি এলাকায় এক বাড়িতে ডাকাতি হবার সময় এলাহী ঘটনাচক্রে সেই বাড়ির সামনে দিয়ে টহল দিতে গিয়ে এ রকমই এক ছেলেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। তারপরের ঘটনা পত্রিকায় বড় বড় শিরোনাম হয়ে সারা দেশে আলোড়ন তুলেছে। আজকের ঘটনাটাও এলাহী সে-রকম কিছু বলে সন্দেহ করছে। তবে ছেলেটা এখন পর্যন্ত মুখ খোলেনি। এলাহী আরেকটা টহল দল থেটাকে পাঠিয়েছে ভিটা নুভা নামের অ্যাপার্টমেন্টে, যেটার দিকে ছেলেটা তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন দেখছিল।

বেশ দামি একটা টি-শার্ট আর জিন্স প্যান্ট পরে আছে, ডাকাত দলের সদস্য বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু এলাহী জানে, আজকাল নেশাগ্রস্ত অনেক বড়লোকের ছেলে নেশার টাকা জোগাড় করার জন্যে ডাকাতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। এলাহী এই ছেলেটাকে নিয়ে গভীর সন্দেহ করছে। ছেলেটার সঙ্গে মোবাইল ফোন কিংবা মানিব্যাগ নেই। কোনো এক অজ্ঞাত ড্রাগ নিয়েছে সে-এ ব্যাপারেই কেবল নিশ্চিত। বাকি সবকিছুই বেখাপ্পা ঠেকছে তার কাছে। এইমাত্র ফোনে ছেলেটার বাবার সঙ্গে যে কথা হলো সেটা আরো বেশি বেখাপ্পা লাগছে। এই হারামজাদা কোনো কথাই বলেনি, অল্প একটু টর্চার করার পর অবশেষে তার বাবার ফোন-নাম্বার আর নামটা বলেছে কেবল। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে বড়লোকের নাম। দীর্ঘ নাম থাকে তাদের। ছোট নামের কোনো বড়লোকের দেখা আজ পর্যন্ত সে পায়নি।

তার ডেস্কের ফোনটা বেজে উঠলে এলাহীর মনে হলো সিদ্দিকীসাহেব হয়তো ফোন করেছেন। কিছুক্ষণ আগে কথা বলার মাঝখানে যান্ত্রিক কারণে লাইনটা কেটে গিয়েছিল

তাহলে।

ফোনটা তুলে নিতেই যে কণ্ঠটা শুনতে পেল সেটার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না সে। কণ্ঠটা শুনেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল। এ রকম প্রায়ই হয়ে থাকে। তার রাত জাগার তিক্ততা আরো বেড়ে গেল। এখন পুরো ঘটনাটি তাকে বলতে হবে। ক্লান্তির কারণে কোনো কথা বলতে ইচ্ছে না করলেও তাকে এই অপ্রিয় কাজটি করতেই হবে। যতোটুকু সম্ভব সংক্ষেপে ঘটনাটা বলল।

সব শুনে ওপাশ থেকে ওসি আলী হোসেন সাহেব ঘুম ঘুম কণ্ঠে বললেন, "কী যে করেন না। একটা ছেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল আর অমনি তাকে ধরার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন?"

"না, মানে, সন্দেহজনক ছিল, স্যার, এলাহী ব্যাখ্যা করতে চাইল।

"এতো দিন ধরে ধানমণ্ডি থানায় আছেন, বোঝেন না? বড়লোকের পোলাপান, রাতে হয়তো মাগি-টাগি খুঁজতে বের হয়েছিল।"

ওসির মুখে 'মাগি' শব্দটা শুনে একটু লজ্জা পেল এলাহী।

"আমাদের হোম মিনিস্টারকে এতো রাতে ঐ লোক ঘুম থেকে ডেকে উঠিয়েছে। বুঝুলেন?"

"জি, স্যার, এলাহী কিছু বলতে গিয়েও বলল না।

"সি ই এ সিদ্দিকী নিজেই হয়তো আসতে পারেন...একটাই তো সন্তান। খুব ভালো ব্যবহার করবেন। ঠিক আছে?"

"জি, স্যার।"

ফোনটা রেখে দেয়া হলেও এলাহী কিছু সময়ের জন্যে উদাস হয়ে থাকল। আরেকটা বাঘের বাচ্চার গায়ে হাত দিয়েছে সে।

চা দেয়া হলে অন্যমনস্ক ভাবটা কেটে গেল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে একটা গালি দিল মনে মনে, বড়লোকের মায়রে আমি...

ঠিক তখনই থানার বাইরে একটা দামি পোর্শে গাড়ি এসে থামল। এলাহীর সামনের জানালা দিয়ে থানার প্রবেশপথটি দেখা যায়, যে-ই এখানে প্রবেশ করুক, জানালা দিয়ে দেখতে পায় সে।

এই রকম দামি গাড়ির সাথে সে পরিচিত। বিশেষ করে গত বছর দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের সময় এক ধানমণ্ডি থানা এলাকায়ই ত্রিশটি বিলাসবহুল গাড়ি জব্দ করা হয়েছিল। আর এলাহী নিজেই করেছে দশটি গাড়ি। পোর্শে... হামার...ভভভা...বিএমডব্লিউ...কোটি কোটি টাকা দামের একেকটা গাড়ি। বৈধভাবে সারা জীবনে সে এক কোটি টাকা কামাতে পারবে কি না সন্দেহ আছে।

এলাহী চেয়ার ছেড়ে উঠে রিসেপশন রুমে চলে এল।

সি ই এ সিদ্দিকী আটদশ জন ধনীর মতোই দেখতে। এইসব ধনীদের গায়ের রঙ কালো হোক আর সাদা হোক, একধরণের জেল্লা জেল্লা ভাব থাকে। তাদের পোশাক স্পষ্টতই অন্যদের চেয়ে তাদেরকে আলাদা করে রাখে।

সিদ্দিকী সাহেবের বয়স হবে পঞ্চান্ন কি ষাট। মাথার সব চল পেকে গেলেও কলপ দেয়া আছে বোঝা যায়। ক্লিন শেভ করা। কপালের সামনের দিকে হেয়ার লাইন অনেকটা পিছু হটে গেছে। গায়ে তার দামি নাইটড্রেস। যেমনটি নাটক-সিনেমায় দেখা যায়। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো লোকটার চোখে ঘুমের কোনো লেশমাত্রও নেই। মনে হয় জেগেই ছিলেন।

বাবা রাত জেগে মদ খাচ্ছিল আর ছেলে রাস্তায় রাস্তায় খুঁজছিল মাগি।

এলাহী অবশ্য অন্য কিছুও ভাবছে। এই ছেলেটা কিছু একটা করার পরিকল্পনা করছিল,

এলাহী এ ব্যাপারে নিশ্চিত। তবে এখন আর এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কোনো উপায় নেই।

রিসেপশন রুমে ঢুকেই তিনি একজন অফিসারকে জিজ্ঞেস করতে গেলে এলাহী এগিয়ে এসে বলল, "আমিই আপনাকে ফোন করেছিলাম..." এবার বেশ সচেতনভাবেই স্যার সম্বোধনটা এড়াতে পারল সে।

সিদ্দিকী সাহেব হাত বাড়িয়ে দিলেন। এলাহী প্রস্তুত ছিল না। বড়লোকেরা ছোটখাট পুলিশ অফিসারকে পাত্তা দেয় না। তাদের সাথে সম্পর্ক থাকে পুলিশের আইজি কিংবা কোনো মিনিস্টারের। সে একটু থতমত খেয়ে বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরল।

"এলাহী নেওয়াজ। ইন্সপেক্টর।"

সিদ্দিকী সাহেব ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, "থানার ইনচার্জ কে?"

"আলী হোসেন সাহেব। উনি ওসি। এখন ডিউটিতে নেই," বলল এলাহী।

"আমার ছেলে কোথায়?" সিদ্দিকী সাহেব হাতটা ছেড়ে দিয়ে জানতে চাইলেন।

'লকাপে।"

কথাটা শুনে লোকটা তেমন প্রতিক্রিয়া দেখাল না। "বসুন।"

একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল এলাহী।

সিদ্দিকী সাহেব চেয়ারে বসতেই আরেকজন লোক এসে হাজির হলো। এই সাত সকালেও কালো কোটটা পরতে ভুলে যায়নি।

"কে, ডিউটি অফিসার কে?" চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল লোকটা।

সিদ্দিকী সাহেব অনেকটা ধমকের সুরে বললেন, "রফিক উল্লাহ্!"

সিদ্দিকী সাহেবকে দেখতে পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে আচরণ বদলে গেল লোকটার। "স্যার, আপনি? আপনি না এলেও তো হোতো।"

লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে এলাহীর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

পাশের একটা চেয়ারে তাকে বসার ইশারা করলেন সিদ্দিকী সাহেব। "অস্থির হবে না। তেমন কিছু না। তোমার আসার কোনো দরকার ছিল না।" লোকটা কিছু বলতে যাবে তখনই সিদ্দিকী সাহেব হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে এলাহীকে বললেন, "তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি?"

"হ্যাঁ, অভিযোগ কি?" উকিল লোকটি সিদ্দিকী সাহেবের কথার প্রতিধ্বনি করল।

এলাহী কটমট চোখে উকিলের দিকে তাকিয়ে সিদ্দিকী সাহেবের দিকে ফিরে বলল, "না, মানে, ফিফটি ফোর-এ আটক করেছি। রাস্তায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল, স্যার," কথাটা বলেই মনে মনে জিভ কাটল এলাহী। আবারো মুখ ফসূকে স্যার বলে ফেলেছে।

উকিল ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই আবারো সিদ্দিকী সাহেব বলতে লাগলেন, "ওকে বাড়িতে নিয়ে যেতে হলে কী করতে হবে?" বোঝাই যাচ্ছে। সময়ক্ষেপন করতে চাচ্ছেন না।

এলাহী একটু ভেবে বলল, "কিছু করতে হবে না। নিয়ে যেতে পারেন।"

"ধন্যবাদ, আপনাকে।" সিদ্দিকী সাহেব উঠে দাঁড়ালে একজন কনস্টেবলকে ইশারা করল এলাহী, কিছুক্ষণ পরে ইরামকে দুজন কনস্টেবল ধরে নিয়ে এল। তার বাম চোখের নিচে আঘাতের চিহ্ন। সেখানে তাকিয়ে রইলেন সিদ্দিকী সাহেব। ইরাম অনেকটা অপ্রকৃতিস্থ।

সিদ্দিকীর দৃষ্টি অনুসরণ করে বুঝতে পারল এলাহী। "দৌড়ে পালিয়েছিল। ধস্তাধস্তির সময় একটু..."।

হাত নেড়ে থামিয়ে দিলেন সিদ্দিকী সাহেব। "ঠিক আছে। আমরা তাহলে যাই, না কি?"

"একটা কথা বলি, আপনাকে?" এলাহী আচম্‌কা কথাটা বলল। যদিও এর জন্যে তার কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না।

“বলুন,” সিদ্দিকী সাহেব তার উকিলকে ইশারা করলে ভদ্রলোক ইরামকে নিয়ে পোর্শে গাড়িতে গিয়ে উঠল। সিদ্দিকী সাহেব আর দশজন বাবার মতো পিতৃত্ব বোধের কোনো উকট বহিপ্রকাশ ঘটালেন না।

“আমার মনে হয় আপনার ছেলে নেশা করে।”

সিদ্দিকী সাহেব এই প্রশ্নেও কোনো রকম অবাক হলেন না। একটু চুপ থেকে বললেন, “হ্যাঁ, করে।”

“কি নেশা করে সেটা কি আপনি জানেন?” কথাটা বলেই এলাহীর মনে হলো এই প্রশ্নটি না করলেই বোধহয় ভালো হোতো।

সিদ্দিকী সাহেব এবার কোনোরকম সময় না নিয়েই আস্তে করে বললেন, “এল এস ডি।”

“কি!?” এলাহী কিছু বুঝে উঠতে না পেরে বলল।

“একটা ভয়ংকর নেশা। এ দেশে খুব কমই পাওয়া যায়।” বলেই তিনি গটগট করে চলে গেলেন এমন ভঙ্গিতে যেন তিনিই ঠিক করে দিলেন আর কোনো প্রশ্ন করা যাবে না।

এলাহী নেওয়াজ দেয়াল ঘড়িতে তাকিয়ে দেখল ভোর সাড়ে চারটা বেজে গেছে।

অধ্যায় ৩

টহল গাড়ি থেটার নেতৃত্বে আছে সাব-ইন্সপেক্টর সমীর দাস। একটু আগে ওয়াকিটকিতে ইন্সপেক্টর এলাহী নেওয়াজ তাকে ধানমণ্ডির ভিটা নুভা নামের একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং চেক করে আসতে বলেছে। তেমন কিছু না। কয়েক সপ্তাহ আগে এই এলাকায় এ রকম একটি বিল্ডিংয়ে ডাকাতি হয়েছিল। এলাহী নেওয়াজ আজ একটু আগে ভিটা ভার সামনে থেকে এক ছেলেকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করার সময় অ্যারেস্ট করেছে। ইন্সপেক্টর সাহেবের সন্দেহ ভিটা নুভায় কিছু একটা হলেও হতে পারে। সমীর জানে গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে বলে এলাহী তাকে পাঠিয়েছে এই বিল্ডিংটা একটু চেক করে দেখার জন্য।

সমীর দাসকে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে ভিটা নুভার ছয় তলার কর্নার ফ্ল্যাটটার দিকে ছেলেটা লক্ষ্য রাখছিল। ঐ ফ্ল্যাটে গিয়ে একটু দেখে এলেই হবে। তার সঙ্গে আছে পাঁচজন কনস্টেবল। যদি কোনো ডাকাতির ঘটনা হয়ে থাকে সেজন্যে তাদের এই বড় দলটি পাঠানো হয়েছে। এলাহী নিজেই আসতে পারতো। কিন্তু ছেলেটাকে ধরতে গিয়ে থানার খুব কাছে চলে এসেছিল বলে সে থানাতেই চলে গেছে, সমীরকে পাঠিয়েছে ব্যাপারটা একটু দেখে আসতে।

সমীর অবশ্য সেরকম কোনো কিছুর আশঙ্কা করছে না। সাধারণত কোনো এলাকায় বড়সড় ডাকাতির ঘটনা ঘটে গেলে মাসখানে ‘বন্ত আর তেমন কোনো ঘটনা ঘটে না। হয়তো এলাহীও তা জানে, এজন্যেই খামোখা একটা কাজে সময় নষ্ট করতে চায়নি, বেগাড় খাটুনি খাটতে পাঠিয়েছে তাকে। তারপরও একটু কনফার্ম হতে হবে।

ভিটা নুভার সামনে এসে গাড়িটা থামলে সমীর ছয় তলার কর্নার ফ্ল্যাটের বেলকনির দিকে তাকাল। বাইরে থেকে অবশ্য কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তাকে ফ্ল্যাটে গিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে নিশ্চিত হতে বলেছে এলাহী নেওয়াজ। কিন্তু এই অসময়ে, প্রায় ভোর বেলায় এই কাজটা করতে গেলে ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা যে খুবই বিরক্ত হবে সেটা নিশ্চিত। সেধে সেধে লোকজনের গালি খাওয়া আর কি!

সমীর গাড়ি থেকে নেমে একজন কনস্টেবলকে ডাকলো।

“রহিম? টর্চটা দাও।”

এক কনস্টেবল লম্বা একটি টর্চ সমীরের হাতে দিলে সে ভিটা নুভার ছয় তলার কর্নার ফ্ল্যাটের বড় বড় দুটি বেলকনি আর একটি জানালার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখল। একটি জানালা আর বেলকনি অন্ধকার, কিন্তু ডান দিকের বেলকনি দিয়ে মৃদু ডিম লাইটের আলো দেখা যাচ্ছে।

সমীর সেই বেলকনিতে টর্চের আলো ফেলল।

যদিও সে জানে এটাতে তেমন কোনো কাজ হবে না। খালি খালি ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদেরকে বিরক্ত করা। তার উদ্দেশ্য খুব পরিস্কার। ইন্সপেক্টর এলাহী যে ছেলেটাকে গ্রেফতার করেছে সে না কি এই ফ্ল্যাটের বেলকনির দিকেই তাকিয়ে ছিল। ঘরের বাসিন্দাদের কেউ যদি আলো দেখে জানালা দিয়ে উঁকি দেয় তো নিচ থেকেই কাজটা সেরে নেবে, কষ্ট করে ছয় তলার ফ্ল্যাটে যাবার কোনো দরকার নেই।

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

সমীর এবার কনস্টেবলদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। “চলো, একটু দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে দেখি।”

তিন মাস ধরে চলা এই অভিসারে কোনো সমস্যা হয়নি। নির্বিঘ্নে একেকটা রাত কেটে

গেছে প্রবল সুখের আবেশে। দু'জনের এই উদ্দাম মিলনের আকর্ষণ দিন দিন বেড়েই চলছে। এই ব্যাপারটি নিয়েই তারা একটু চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছে ইদানিং। তবে আশা একটাই, খুব জলদিই এই অবস্থার অবসান ঘটবে।

পূর্বপরিকল্পনা মতোই সব হচ্ছিল। ঘুণাক্ষরেও কেউ কিছু জানতে পারেনি। আজকের রাতটা তারা দারুণভাবে কাটিয়েছে। একে অন্যেকে তীব্রভাবে ভালোবাসতে বাসতে হারিয়ে গিয়েছিল তারা। সুখের আবেশে গাঢ় ঘুমে দু'জনে ঢলে পড়েছে মাঝরাতে। কী যেন একটা শব্দ হতেই বর্ষার ঘুম ভেঙে গেল।

বিছানার পাশে ছেলেটাকে দেখতে না পেয়ে অ্যাটাচড বাথরুমের দিকে তাকাল সে। দরজার নিচ দিয়ে কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না। চোখ দুটো কচলে ঘরের চারপাশে তাকাল। ছেলেটা কোথাও নেই। বুকটা কেঁপে উঠল তার। উঠে বসল সে। এমনিতেই হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেলে তার বুক ধরফর করে ওঠে, এখন সেটা আরো বেড়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে তার দু'চোখ সয়ে এলেও ছেলেটাকে দেখতে পেল না। এক অজানা অশংকায় হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

বিছানা থেকে উঠে যে খুঁজে দেখবে সেই শক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেল। বর্ষার। টের পেল নিশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠছে। নিজেকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করে বুক ভরে দম নিয়ে যে-ই না বিছানা থেকে নামতে যাবে অমনি একটা শব্দে চমকে উঠল সে।

দক্ষিণ দিকের বেলকনির স্লাইডিং ডোরটা খুলে একটা ছায়ামূর্তি চুপিসারে ঘরে ঢুকছে। প্রচণ্ড ভয়ে বর্ষার গলা শুকিয়ে গেল।

***

ভিটা নুভার নাইটগার্ড আসলাম মেইন গেটের বক্সের ভেতরে বসে আরাম করে দুচোখ একটু বন্ধ করেছিল মাত্র। পঁচিশ বছরের যুবক আসলাম ছয় মাস কুয়েতে কাজ করেছে, তারপর জন্ডিসে আক্রান্ত হলে ঐ দেশের সরকার তাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়। গ্রামের বাড়ির জমিজমা বেঁচে দিয়ে বিদেশ গিয়েছিল। ফিরে এসে একেবারে চোখে অন্ধকার দেখে। তার গ্রামেরই এক লোক এই চাকরিটা জুটিয়ে দিয়েছে তাকে।

থাকা খাওয়া ফ্রি। বেতন তিন হাজার টাকা। তারপরেও আসলাম কুয়েত যাবার স্বপ্ন দেখে। প্রচুর টাকা কামাবে, গ্রামের বাড়িটা পাকা করবে, লোকজন তার দিকে ঈর্ষার চোখে তাকাবে তখন। তোমার দিকে যদি লোকে ঈর্ষার চোখেই না তাকাল তাহলে কিসের সুখ!

রাতের এই ডিউটিটা তার প্রথম দিকে খুব খারাপ লাগতো। এখন, এই দু'বছরের চাকরি জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট একটা কাজ। শুধু বসে বসে রাত জাগা। তাকে অবশ্য প্রতি রাতে ডিউটি করতে হয় না। তারা দুজন এ কাজটি করে। মহব্বত নামের অন্য আরেকটি ছেলে আছে। তার ডিউটি ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

হঠাৎ মেইন গেটে এমন জোরে শব্দ হলো যে বক্সে বসে ঝিমুতে থাকা আসলাম চমকে টুল থেকে পড়েই যাচ্ছিল। তার বুকটা ধরফর করে উঠল। খুব দ্রুত ধাতস্থ হয়ে বোঝার চেষ্টা করল ব্যাপারটা কি।

"কে?" খুবই দুর্বল কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

কিন্তু ওপাশ থেকে কোনো জবাব এল না, দরজায় আরো জোরে আঘাত করা হলো।

"আরে ভাই, কে?" এবার একটু জোরেই কথাটা বললে দরজায় আঘাতের শব্দটা থেমে গেল। তারপরই একটা কণ্ঠ বলল, "আমরা পুলিশ, গেট খোল।" পাঁচজন কনস্টেবলের একজন জবাব দিল।

"পুলিশ?" আসলাম ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

"আরে ব্যাটা, গেট খোল," অন্য একজন কনস্টেবল অধৈর্য হয়ে বলল।

আসলাম এবার আর কোনো প্রশ্ন না করেই গেটটা খুলে দিল। পাঁচ ছয়জন পুলিশকে এক সঙ্গে দেখে ভড়কে গেল সে।

"সালামালাইকুম, স্যার," বলল আসলাম।

***

বর্ষার মুখ দিয়ে অস্ফুটভাবে বের হয়ে এল : "কে!?"

কথাটা শুনে চমকে উঠল ছেলেটা। "আমি!" বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল সে। তার আচরণ খুবই অস্বাভাবিক। কপালে রীতিমতো বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে। বর্ষা ভালো করে তাকিয়ে দেখল ছেলেটার হাতও কাঁপছে।

চাপা কণ্ঠে ছেলেটা তাকে বলল, "আস্তে!" কথাটা বলেই বিছানার প্রান্তে বসল সে।

"কী হয়েছে?"

"পুলিশ!"

"কী!" বর্ষার সারা দেহের রোমকূপ খাড়া হয়ে গেল মুহূর্তে।

"রাস্তা থেকে পুলিশ বেলকনিতে টর্চের আলো ফেলে কী যেন দেখছে," চাপা কণ্ঠে বলল ছেলেটা। তাকে বেলকনির স্লাইডিং ডোরের কাছে নিয়ে গিয়ে পর্দা একটু ফাঁক করে দেখালে ভয়ে অসাড় হয়ে গেল বর্ষা।

ভুরু কুঁচকে বর্ষা ছেলেটার দিকে তাকাল। "তুমি ঘুম থেকে উঠলে কখন? বেলকনিতে কি করছিলে?"

"ঘুম ভেঙে গেছিল। একটু সিগারেট খাওয়ার জন্য..."

শেষ রাতে পুলিশের এই আগমন তাদেরকে জীবনের সবচাইতে ভয়ংকর একটি পরিস্থিতিতে দাঁড় করিয়েছে। প্রায় দশ মিনিট তারা নিশ্চুপ বিছানার উপর বসে রইল। এক একেকটি সেকেন্ডকে যন্ত্রণাকাতর কয়েক ঘণ্টা বলে মনে হলো তাদের কাছে। তবে ভাগ্য ভালো, তেমন কিছু আর হলো না । রাস্তা থেকে তিন-চারজন পুলিশ তাদের এই ফ্ল্যাটের দিকে চেয়ে চেয়ে কী যেন দেখে চলে গেল।

দেশের সবচাইতে জনপ্রিয় লেখকের দ্বিতীয় স্ত্রী বর্ষা। বহুল আলোচিত আর প্রচারিত একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে গত চার বছর আগে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তখন বর্ষার বয়স ছিল মাত্র একুশ। সবে ছোট পর্দায় নায়িকা হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করা এক তরুণী। কেবল লেখকের নিজের মেয়েরই সমবয়সি নয়, আক্ষরিক অর্থেই তার বান্ধবী ছিল সে।

আজ প্রায় এক বছর আগে লেখকের ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে আর আট মাস আগে এক স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে প্যারালাইসিস হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন তিনি।

বর্ষা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। কিছুতেই বুঝতে পারছে না পুলিশ কেন এতো রাতে তাদের ফ্ল্যাটের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে। তাদের বেলকনিতে টর্চের আলো ফেলবে। কেউ কি তাদের এই ব্যাপারটা জেনে গেছে? অসম্ভব। তারা বেশ সতর্ক আর সজাগ। কিন্তু তাদের সব হিসেব পাল্টে দিয়েছে পুলিশের এই আগমন।

ভাগ্য ভালো পুলিশ অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকেনি। কী যে অঘটন ঘটে যেতে কথাটা ভাবতেই বর্ষার গা শিউরে উঠল। রাতের সমস্ত উত্তেজনা আর অভিসার তিরোহিত হয়ে এখন কেবল আশঙ্কা আর অনুশোচনা হচ্ছে।

বর্ষা টয়লেটে ঢুকলে ছেলেটা নিজের টেনশন দূর করার জন্যে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে আরেকটা সিগারেট ধরাল কিন্তু কয়েক টান দেয়ার পরই মুখটা বিস্বাদে ভরে গেল তার। অর্ধেকটা খাওয়ার পরই বেলকনির দিকে ছুঁড়ে ফেলে বিছানায় এসে বসল সে।

টয়লেট থেকে বের হয়ে এল বর্ষা। টেনশনে থাকলে মেয়ে মানুষ কি ঘন ঘন টয়লেটে যায়? মনে মনে বলল ছেলেটি।

বর্ষা এখন পাতলা একটি নাইটি পরে আছে। এটা তাদের অভিসারের পোশাক। ঘুমানোর আগে তাদের প্রথম মিলনের পর এই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা সমস্ত আনন্দটাকে মাটি করে দিয়েছে। বর্ষাকে টয়লেট থেকে বের হতে দেখে আবারো উত্তেজনা অনুভব করছে ছেলেটা। বিছানা থেকে উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল ড্রেসিংটেবিলের সামনে।

"উফ। এসব এখন আর ভালো লাগছে না। ছাড়ো তো," অনেকটা বিরক্ত হয়েই বর্ষা বলল, কিন্তু ছেলেটা তাতে একটুও দমে গেল না। বর্ষার কাঁধে মুখ ঘষতে শুরু করল।

ছেলেরা কী করে টেনশনে থেকেও এসব করার মতো মুডে থাকে ভেবে পেল না সে।

"অতো চিন্তা কোরো না তো।"

"তোমার কি মনে হয়, পুলিশ টর্চের আলো ফেলছিল কেন?"

"মনে হয় অন্য কোনো ফ্ল্যাটে খোঁজ করতে গিয়ে ভুলে এখানে আলো ফেলেছে।"

"অন্য ফ্ল্যাটেই বা কেন টর্চ দিয়ে আলো ফেলবে?" ব্যাখ্যাটা বর্ষার পছন্দ হলো না।

"তাতো জানি না। তবে আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আমাদের নিয়ে নয়। বাদ দাও তো। যদি তেমন কিছু হোতো পুলিশ বাইরে থেকে টর্চের আলো ফেলে চলে যেতো না। এই ফ্ল্যাটে আসতো।"

"তারপরও আমার খুব ভয় হচ্ছে।"

"কিন্তু আমার খুব উত্তেজনা লাগছে।"

"টয়লেটে গিয়ে মথায় পানি দিয়ে ঠাণ্ডা করে আসো, একটু মুচকি হেসে বলল বর্ষা।

ছেলেটা আয়নায় তাকিয়ে বর্ষার হাসিটা দেখতে পেয়ে একটু উফুল্ল হলো। আরো বেশি জড়িয়ে ধরে বলল, "কাকতালীয় ব্যাপার, ডালিং। ভয় পেয়ো না।"

"আমাকে সাহস দিচ্ছো! তোমার অবস্থা তো আমার চেয়েও খারাপ।"

কথাটা আমলে না নিয়ে বর্ষার ডান স্তন মুঠোতে পুরে ফেলল সে। বর্ষা এবার আর কোনো বাধা দিল না। নাইটির সামনের বোতাম খুলে ফেললে ছেলেটার হাত নাইটির ফাঁক গলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

মিনিট খানেক পরে তারা দুজন আবার বিছানায়। আবারো দু'জনের শরীর দু'জনকে গ্রাস করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। বর্ষার গলায় আর বুকে পাগলের মতো চুমু খাচ্ছে ছেলেটা। তারপর আচমকাই বিরতি। বর্ষা টের পেল অন্ধকারে তার প্রেমিক কাগজের মতো কিছু একটা ছিঁড়ে বিছানার এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বুঝতে পেরে মুচকি হেসে দ্বিতীয়বারের মতো প্রস্তুত হলো সে।

এবার তারা দুজনে সচেতনভাবেই কোনো রকম শব্দ করল না। যদিও পাশের ঘরে লেখক তাদের এই শব্দ শোনার মতো অবস্থায় নেই। তিনি এখন। সব কিছুর উর্ধ্বে।

* * *

"আমি তো উল্টাপাল্টা কিছু দেখতাছি না, স্যার," সমীর দারোগাকে বলল ভিটা নুভার নাইটগার্ড আসলাম।

সমীর ছয় তলার বেলকনির দিকে তাকিয়ে আবার বলল, "ওখানেই তাহলে জায়েদ রেহমান থাকেন, এটা কোনো প্রশ্ন ছিল না, অনেকটা আপন মনে বিড় বিড় করেই কথাটা বলল। "ইন্টারকমের জবাব দিচ্ছে না কেন?" জানতে চাইল সমীর। অবশ্য এর জবাব সে নিজেও জানে। এতো ভোর বেলায় কে বসে আছে ফোন ধরার জন্যে?

"ঘুমায়া আছে," আসলাম খুব সহজ করে বলল। "তারা তো দেরি কইরা ঘুম থেইকা

ওঠে।”

“ঠিক আছে। তুমি চোখকান খোলা রেখো।” কথাটা বলেই সে তার দলবল নিয়ে চলে গেল।

“হালার পুলিশের কি কুনো কাম নাই, খালি বেহুদা কাজকারবার।” পুলিশের দলটি চলে গেলে আসলাম অনেকটা জোরেই বলল কথাটা।

প্রথমে ভেবেছিল ফোনটা বাজছে, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল ইন্টারকমে রিং হচ্ছে।

সবেমাত্র তাদের দ্বিতীয়বারের মতো মিলনপর্ব শেষ হলে ছেলেটা চিৎ হয়ে শুয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল আর মেয়েটা একপাশ ফিরে চেষ্টা করছিল ঘুমাতে।

ইন্টারকমে রিং হলে তারা দু'জনে আবারো ভীষণভাবে চমকে যায়। কী করবে ভেবে না পেয়ে ইন্টারকমের জবাব দেয়নি।

অধ্যায় ৪

এলাহী নেওয়াজ নিজের চেয়ারে বসে ঝিমিয়ে পড়েছিল। গাঁজার নেশা আর সারা রাত জেগে থাকার ক্লান্তিতে গাঢ় ঘুম এসে লেগেছে দু'চোখে।

"স্যার, ঘুমিয়ে গেছেন না কি?" সমীর দারোগা তার টেবিলের সামনে এসে বলল। এলাহীর কোনো সাড়া শব্দ নেই। "স্যার!" এবার বেশ জোরে, প্রায় চিৎকার দেবার মতো করে বললে এলাহীর বুকটা ধরফর করে উঠল। চমকে উঠে দেখতে পেল সমীর দাসকে। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে কিছুটা ধাতস্থ হলো সে।

"স্যার, সব ঠিক আছে," সমীর বলল।

"কি ঠিক আছে?"

"ভিটা নুভায়। ওখানে কোনো সমস্যা নেই, স্যার।"

এবার বুঝতে পারল এলাহী। আধঘণ্টা আগে সমীরকে ভিটা নুভায় পাঠিয়েছিল। "আচ্ছা," বলল সে। একটু চুপ থেকে প্রশ্ন করল, "অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে সব ঠিক আছে তো?"

সমীর একটু কাচুমাচু করল। "না, মানে, ভেতরে তো যাইনি। ইন্টারকমে চেষ্টা করেছি, কেউ ধরেনি।"

এলাহীর চোখ দুটো কুঁচকে গেল। "বলো কি! তাহলে সব আর ঠিক থাকল কেমনে?"

সমীরও রাত জেগে ক্লান্ত। এ কথার কোনো জবাব দিল না। মাথা নিচু করে রাখল।

এলাহী চেয়ারে সোজা হয়ে বসল এবার। "ইন্টারকমে জবাব দেয়নি মানে, নিশ্চয় কোনো সমস্যা হয়েছে!?"

সমীর চোখ তুলে তাকাল। "ঘুমিয়ে আছে সবাই। এই ভোর বেলায় কে আর ইন্টারকমের জবাব দেয়ার জন্যে জেগে থাকবে?"

এলাহী একটু ভিরমি খেলো। এই ছেলে তো ঠিকই বলেছে। ইন্টারকমে জবাব না দেয়াটা মোটেও অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। এলাহী বুঝতে পারল সে অতিমাত্রায় সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠছে দিনকে দিন। এটা হলো চোরবাটপারদের সাথে থাকার কুফল। সব কিছুতেই সন্দেহ করা তার বাতিক হয়ে গেছে। তার এই স্বভাবটি বদলাতে হবে। এটা কোনো সুস্থ মানুষের লক্ষণ নয়। ইদানীং সে নিজের বউয়ের অগোচরে তার মোবাইল ফোন চেক করে দেখে। মনের মধ্যে কেবল সন্দেহ আর অবিশ্বাস। কিন্তু পরক্ষণেই সি ই এ সিদ্দিকীর ছেলের কথাটা মনে পড়তেই তার সন্দেহের ব্যাপারটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

"ঠিক আছে, তুমি যাও।" সমীরকে বিদায় করে দিল সে। চেয়ার ছেড়ে উঠতেই মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ইন্সপেক্টর এলাহী নেওয়াজ।

বর্ষা খুব চিন্তায় পড়ে গেছে। পুলিশ তাদের অ্যাপার্টমেন্টে কেন ফোন করল? ব্যাপারটা কি? বার বার পুলিশ আসছে কেন? অজানা আশঙ্কায় রক্ত হিম হয়ে এল তার। কেউ কি বুঝে ফেলেছে? অসম্ভব! তারা এতো বেশি সতর্ক যে, এই বাড়িতে যে দুজন কাজের মানুষ আর একজন নার্স আছে তারাও কিছু বুঝতে পারেনি।

এই অ্যাপার্টমেন্টটা দুটো ফ্ল্যাটের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে, ফলে এর প্রবেশ দরজা দুটো। একটা ব্যবহার করা হলেও অন্যটা বন্ধ রাখা হয়। তবে সাত-আট মাস আগে স্ট্রোকের পর লেখক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লে সেই দরজাটা খোলা হয়েছে আবার। এটি দিয়ে প্রবেশ করলে যে ঘরটা প্রথমে পড়ে সেটা আগে ড্রইংরুম থাকলেও এখন এটাকে বর্ষা তার বেডরুম হিসেবে ব্যবহার করে। লেখকের সাথে তার থাকা হয় না। তার পক্ষে পক্ষাঘাগ্রস্ত একজন মানুষের সাথে রাত কাটানো সম্ভব নয়। লেখককে দেখাশোনা করার জন্যে নিয়োজিত আছে

একজন সার্বক্ষণিক নার্স। সেই নার্স থাকে লেখকের ঘরের ঠিক পাশেই। আগে লেখক যে ঘরে লেখালেখির কাজ করতেন এখন সেখানেই তিনি থাকেন-থাকেন মানে, মরার মতো পড়ে থাকেন।

বর্ষার ঘর এই ফ্ল্যাট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন, তবে এই ঘরের ডান দিকের দেয়ালের পেছনেই রয়েছে লেখকের ঘরটি।

বর্ষা আর তার প্রেমিকের চোখে এক ফোঁটাও ঘুম নেই। বেচারা টেনশন দূর করার জন্যে আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছে। বর্ষার চেয়ে সে আরো বেশি চিন্তিত, তবে ভাব করছে একটুও ভয় পায়নি। বর্ষার কাছে নিজের পৌরুষ জাহির করার চেষ্টা করছে সে। একটু আগেই ফজরের আজান হয়েছে। দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে এখন।

নিচের রাস্তায় একটা গাড়ি থামার শব্দ শুনতে পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে বেলকনির স্লাইডিং ডোরের পর্দার আড়াল থেকে দেখার চেষ্টা করল বর্ষা।

যে দৃশ্য সে দেখতে পেল সেটা তার হৃদস্পন্দনকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে থামিয়ে দিল। হারিয়ে ফেলল নড়াচড়ার শক্তি।

এলাহী নেওয়াজের দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এলেও চোখ দুটো টেনে টেনে ভিটা নুভার পাঁচ তলার কর্নার ফ্ল্যাটের দিকে তাকাল। পুলিশের জিপটা একটু আগে ভিটা নুভা'র সামনে এসে থেমেছে। ফজরের আজান হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। পথে হাতেগোনা কিছু লোকজন দেখা যাচ্ছে। নামাজ পড়েতে যাচ্ছে তারা। একটু পরে এই এলাকার অনেক লোকে জগিং করতে বের হবে। অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে এলাহীর তেমন অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ছে না। কিন্তু এমনও তো হয়, বাইরে থেকে সব ঠিকঠাক-ভেতরে অন্য কিছু। এর আগের ডাকাতির ঘটনাটি এ রকমই ছিল।

এলাহী সিদ্ধান্ত নিলো অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে না গিয়ে সে কোনোভাবেই নিশ্চিত হবে না। এখন ভোর হয়ে গেছে। এই সকালে কাউকে ঘুম থেকে ওঠালে খুব বেশি অন্যায় হবে না। এখন তো অনেকে ঘুম থেকে উঠেও গেছে।

দারোয়ান ছেলেটা আবারো পুলিশের আগমনে শুধু অবাকই হলো না, তার চোখেমুখে স্পষ্ট বিরক্তি। এই অ্যাপার্টমেন্টে এমন কি হয়েছে যে একটু পর পর পুলিশ আসছে?

এলাহী তার তিন জন কনস্টেবলের দুজনকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল, একজনকে রাখল গেটের বাইরে।

"ঐ ফ্ল্যাটের লোকজনকে এখান থেকে কেমনে ফোন করা যায় রে?" এলাহী জিজ্ঞেস করল দারোয়ান ছেলেটাকে।

"ইন্টারকম দিয়া করা যায়, স্যার," ছেলেটা জবাব দিল।

"ফোন কর।"

কয়েক বার রিং হলেও কেউ ধরল না। এলাহী নেওয়াজ আবারো ইশারা করল রিং করার জন্যে।

রিং হচ্ছে। কেউ ধরছে না।

"স্যার, ধরছে," দারোয়ান রিসিভারটা এলাহীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল।

"হ্যালো।" নারী কণ্ঠটা খুবই কাঁপা আর ভীত।

"আমরা ধানমণ্ডি থানা থেকে এসেছি," বলল এলাহী।

"কি জন্যে?" কণ্ঠটা আরো ভয়ার্ত শোনাচ্ছে এখন।

ডাকাত দলের লোকজন মহিলাকে পিস্তল ঠেকিয়ে কথা বলাচ্ছে। ডাকাতির সময় এ

রকম ঘটনা হতেই পারে। এলাহীর উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনার ডানা পাখা মেলতে শুরু করল। গাঁজার নেশা খুব গাঢ় হতে শুরু করেছে। "আপনার অ্যাপার্টমেন্টে কোনো সমস্যা হয়েছে কি, ম্যাডাম?"

"সমস্যা?"

"মানে কোনো রকম-"

মহিলা তার কথা শেষ করতে দিল না। "না। না। কোনো সমস্যা নেই। সব ঠিক আছে।"

এলাহীর সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। মহিলা এতো তাড়াহুড়ার ভাব করছে কেন? "ঠিক আছে, আমরা আপনার ফ্ল্যাটে একটু আসতে চাইছি।"

"কেন?" সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা প্রতিবাদের সুরে বলল মহিলা।

"একটু দেখার জন্যে। কোনো সমস্যা না হলে তো ভালোই। আপনাদের ডিস্টার্ব করবো না। শুধু এসে দেখে যাবো।"

"আমি বুঝতে পারছি না, আপনারা খামোখা কেন আমাদেরকে এতো সকালে বিরক্ত করবেন? আপনারা কি জানেন না লেখক জায়েদ রেহমান এই ফ্ল্যাটে থাকেন। উনি খুব অসুস্থ।"

"জানি, ম্যাডাম। আর সেজন্যেই তো একটু চেক করে

এলাহী কথাটা পুরোপুরি শেষ করতে পারল না। টেলিফোনের অপরপ্রান্ত থেকে চাপা একটা আর্তনাদ শোনা গেল। আরেকটা মেয়েলী কণ্ঠ!

ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে আর কোনো জবাব পাওয়া যাচ্ছে না এখন। এলাহীও সেই জবাবের অপেক্ষায় নেই। রিসিভারটা রেখে সোজা লিফটের দিকে ছুটে চলল দুজন কনস্টেবলকে নিয়ে।

লিফটটা যখন ছয় তলার দিকে উঠে যাচ্ছে এলাহী টের পেল তার হৃদপিণ্ডটা রীতিমতো লাফাচ্ছে। সেই সাথে এও মনে হচ্ছে, খুব ধীর গতিতে উঠছে লিফটটা।

চারতলায় পৌঁছাতেই এলাহীর কপাল বেয়ে ঘাম ঝরতে শুরু করল শীতের এই কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে। সে বুঝতে পারছে বিরাট একটা সমস্যা হয়েছে। তার আশঙ্কাই সত্যি হতে যাচ্ছে। ঘটনা খুবই খারাপ। খুব খারাপ!

অধ্যায় ৫

শীতের দিনে ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠতে বেগ'র কোনো বেগ পেতে হয় না। বিগত তিন বছর ধরে সে ভোর বেলায় নিয়মিত জগিং করে আসছে। ভার্জিনিয়ায় ট্রেনিং নিতে যখন গেল তখন থেকেই এই অভ্যাস। তার রুমমেট ছিল এক আমেরিকান তরুণ। আপাত দৃষ্টিতে তাকে বিট জেনারেশনের একজন মনে হলেও স্বাস্থ্য সচেতন এক যুবক। যৌন জীবন আরো বেশি সক্ষম আর দীর্ঘস্থায়ী করতেই না কি সে জগিং করে। শরীরটাকে ফিট রাখে। বেগ অবশ্য এ রকম কোনো কারণে নয়, তার পেশা এ রকম ফিটফাট থাকাটা দাবি করে। সেই আমেরিকান তরুণ এখন এফবিআই'র উদীয়মান কর্মকর্তা। সে-ই তাকে জোর করে ঘুম থেকে তুলে জগিং করতে নিয়ে যেতো। পুরো একটি বছর এ রকম করতে করতে জগিং করাটা তারও অভ্যাস হয়ে গেছে। কেবল শরীর খারাপ থাকলে এর ব্যত্যয় ঘটে। বৃষ্টিতেও তার জগিং চলে সীমিত পরিসরে। এক নাগারে দু'তিন মাইল না দৌড়ালে এখন ম্যাজ ম্যাজ করে তার শরীর।

ধানমণ্ডির আট নাম্বারের লেকের সামনে ফুচকার যে ভ্রাম্যমান দোকানটা আছে সেখানে এসে হাপিয়ে গেল সে। ব্যক্তিগত একটা কারণে তার মনমেজাজ ভালো নেই তাই দৌড়াতে দৌড়াতে প্রতিদিনকার চেয়ে অনেক বেশি পথ জগিং করে ফেলেছে। রাশান কালচার সেন্টারের সামনে আসতেই বিপরীত দিকের ফুটপাতে বসে পড়ল বেগ।

কোমরে বেল্টের সাথে লাগানো ক্যান থেকে পানি খেয়ে নিলো। দম ফুরিয়ে এখন হাফাচ্ছে। এক দু'মিনিটেই শ্বাসপ্রশ্বাস ঠিক হয়ে যাবে। সারাটা শরীর ঘেমে একেবারে ভিজে গেছে তার। গায়ের টি-শার্টটা ভিজে ঘাম চুঁইয়ে পড়ছে। ট্রাউজারের কিছু অংশ পর্যন্ত ভিজে একাকার। সব সময়ই এ রকমটি হয়। এটাই জগিংয়ের উদ্দেশ্য। তোমার শরীর যতোক্ষণ না ঘেমে উঠবে, বুঝবে জগিং হয়নি। রবার্ট অ্যালান জিমারম্যান, সেই আমেরিকানটি তাকে সব সময় এ কথা বলতো।

ক্যানের অবশিষ্ট কিছু পানি দিয়ে মুখটাও ভিজিয়ে নিলো। ঘামে ভিজে যাওয়া মাথার চুলগুলো হাত দিয়ে ব্যাক ব্রাশ করে হাতের স্পোর্টস ঘড়িটায় দেখল সকাল ৬টা ২০মিনিট।

রাশান কালচার সেন্টারের মূল প্রবেশ পথের ডান দিক থেকে একটা পরিচিত গাড়ি আসতে দেখে অবাকই হলো সে। গাড়িটা তার সামনে এসে থেমে গেলে সিটি হোমিসাইডের সহকারী ইনভেস্টিগেটর জামান বের হয়ে এল।

বেশি দিন হয়নি ডিপার্টমেন্টে ঢুকেছে ছেলেটি। খুবই কর্মঠ। এখনও বিয়ে করেনি, ফলে রাতের ডিউটি তার ভাগেই বেশি পড়ে। এটাকে তারা বলে অনলাইন ডিউটি। একটা ফোনের সামনে সারাটা রাত বসে থাকা। খুব কমই ইমার্জেন্সি কল আসে। তারপরেও কাজটার গুরুত্ব অনেক। ছেলেটার রাত জাগার অভ্যাসের কারণে এই ডিউটিতে তাকে রাখা হয়।

জেফরি বেগ বসে থেকেই বলল, "কী ব্যাপার?" তার নিশ্বাস এখনও স্বাভাবিক হয়নি।

"ধানমণ্ডি থানায় একটা ঘটনা ঘটেছে," বলল জামান। "হোমিসাইডকে প্রাথমিক তদন্ত করা জন্য বলা হয়েছে, স্যার।"

"ঘটনা কি?"

"লেখক জায়েদ রেহমান মারা গেছেন।"

বিস্মিত হলো বেগ। কেউ মারা গেলে পুলিশের কি? স্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে তো পুলিশকে মাথা ঘামাতে হয় না, সে যতো বড় ভিআইপি-ই হোক না কেন। এই ছেলেটা বলছে, লেখক জায়েদ রেহমান মারা গেছেন। খুন হয়েছেন বলছে না কেন? যদি বলতে খুন হয়েছে বেগ মোটেও অবাক হোতো না। হোমিসাইডে ঢোকার পর এ রকম কথা শুনে সে অভ্যস্ত হয়ে

গেছে। অবশ্য জামান ভুল করেও খুন না বলে মারা গেছে বলতে পারে।

"কখন?" ছোট্ট করে জানতে চাইল সে।

"মনে হয় বেশিক্ষণ আগে নয়। আমরা কনফার্ম হয়েছি এইমাত্র। এক ঘন্টা আগে," গাড়িতে উঠতে উঠতে জামান বলল। সে আগে বেগকে ওঠার জন্যে পেছনের সাইড দরজাটা খুলে দিয়ে নিজে বসল ড্রাইভারের পাশে।

"তুমি বলছো মারা গেছে, খুন হননি। তাহলে আমাদের দরকার পড়ল কেন?" বেগ ধীর কণ্ঠে বলল।

"স্যার, আসলে কেউ বুঝতে পারছে না, উনি মারা গেছেন না কি খুন হয়েছে। এজন্যেই হোমিসাইডকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। ফারুক স্যার আপনার মোবাইলে কল করে পাননি। আমাকে বললেন আপনাকে বাড়ি থেকে তুলে ক্রাইমসিনে নিয়ে যেতে। কিন্তু আমি তো জানি আপনি এই সময় এখানে জগিং করেন।"

"আচ্ছা," বেগ ব্যাপারটা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামালো না। ঘটনাস্থলে গিয়েই দেখবে কী হয়েছে। আগেভাগে মাথা খাঁটিয়ে লাভ নেই। হত্যার ঘটনা সব সময়ই জটিল।

"ব্যাপারটা কি সবাই জানে?" বেগ জিজ্ঞেস করল।

জামান বুঝতে পারছে সবাই বলতে আসলে মিডিয়ার কথাই বলা হচ্ছে। "না, এখনও জানে না, স্যার।"

"ভালো।" মিডিয়ার ব্যাপারে তাদের ক্ষোভ রয়েছে। সব সময়ই কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তারা। ঝামেলা বাধানো তাদের প্রধান কাজ। তদন্ত করার সময় তাদের প্রচারণা আর রিপোর্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো কাজেই লাগে না। "আমাদের ইউনিট কি ওখানে পৌঁছে গেছে?"

"হ্যাঁ, বাকিরা অনেক আগেই চলে গেছে।"

"জায়েদ রেহমান তো একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন, না?" বেগ বলল।

"হ্যাঁ। আপনি চেনেন না কি?" জামান জানতে চাইল।

"হাঁ, চিনি। একবার একটা কাজে গিয়েছিলাম।" একটু চুপ থেকে আবার বলল, "আগে আমার বাড়িতে চললো। জামা কাপড় পাল্টে নিতে হবে। এই ফাঁকে তুমি ফটোগ্রাফার আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট টিমকে ওখানে পাঠিয়ে দাও। ওদের বলে দাও আমি না আসা পর্যন্ত কেউ যেন কোনো কিছু স্পর্শ না করে। মোবাইল এভিডেন্স টিমকেও রেডি হতে বলে দাও। আর ঐ অ্যাপার্টমেন্টের কেউ যাতে বাইরে যেতে না পারে সেটা নিশ্চিত করো। আমরা পনেরো মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবো।"

"নাস্তা করবেন না?" জামান জানতে চাইল।

"না। কাজ শেষ করে করবো।" জামানের দিকে তাকিয়ে বেগ বলল, "তুমি নাস্তা করেছো?"

"না, স্যার।"

"তাহলে আমারা দুজনেই একসাথে নাস্তা করছি।"

"এখন করবেন না কি পরে?" জানতে চাইল জামান।

"আমারা একসাথেই নাস্তা করবো।"

"দেরি হয়ে যাবে না?"

"মনে হচ্ছে খুব বেশি সময় লাগবে না," বেগ হেসে বলল।

কিন্তু তার ধারণাই নেই কতো সময় লাগতে পারে। দিনটা তার জন্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বিভিন্ন করণে। দীর্ঘ দিন পর সকালের নাস্তা ছাড়াই একটা দিন পার করতে যাচ্ছে সে। তাদের গাড়িটা ভিটা নুভার সামনে আসতেই বেগ দেখতে পেল গেটের সামনে কোনো

জটলা নেই। সব কিছুই স্বাভাবিক। সকাল সাতটা। রাস্তায় অল্প কিছু যানবাহন আর লোকজন রয়েছে। পুরো শহরটা জেগে উঠছে আস্তে আস্তে। জগাররা জগিং করতে বের হচ্ছে, আর যারা আগেভাগে বের হয়েছিল তারা ফিরতে শুরু করেছে এখন।

ভালো, মনে মনে বলল বেগ।

গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে জামান পুরো ঘটনাটা যতোদূর সম্ভব বেগকে বলেছে : ইন্সপেক্টর এলাহী মাঝরাতে টহলগাড়িতে করে ঐ অ্যাপার্টমেন্টের সামনে দিয়ে যাবার সময় এক তরুণকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা থেকে শুরু করে সবই সংক্ষেপে বলে গেল সে।

ছেলেটাকে অবশ্য ধরতে পারেনি ইন্সপেক্টর। পালিয়ে গেছে। থানায় ফিরে এসে এলাহী সাহেবের মনে সন্দেহ হলে একজন সাব ইন্সপেক্টরকে পাঠায় ভিটা নুভায়। কিন্তু এতেও যখন এলাহী সন্তুষ্ট হতে পারে না তখন থানা থেকে বাড়ি ফেরার পথে ভিটা নুভায় যায়। বাইরে থেকে সব কিছু ঠিক থাকলেও ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক নিশ্চিত হবার জন্য পার্কিং এরিয়ার ইন্টারকম থেকে লেখক জায়েদ রেহমানের অ্যাপার্টমেন্টে কল করে। রিসিভার তুলে নিয়েছিলেন লেখকের স্ত্রী। তার সঙ্গে কথা বলার সময়ই ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে একটা নারী কণ্ঠের চিৎকার শুনে ইন্সপেক্টর ছুটে যায় অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর। ওখানে গিয়ে লেখক জায়েদ রেহমানকে নিজের শয্যায় মৃত অবস্থায় পায় সে।

পরে জানতে পারে লেখকের হাউজনার্স ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে যথারীতি ঘুম থেকে উঠে লেখকের মলমূত্র পরিস্কার করার জন্য ঘরে ঢুকতেই এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে পেয়ে ভড়কে যায়। পঞ্চাশোর্ধ মহিলা বেশ শক্তসামর্থ্য হলেও নিজের আর্ত চিৎকার থামতে সক্ষম হয়নি। আর সেই চিৎকারই ইন্সপেক্টর এলাহীকে ঘটনাস্থলে টেনে নিয়ে আসে।

লেখকের মুখে একটা বালিশ চাপা দেয়া ছিল। অভিজ্ঞ হাউজনার্স ভড়কে গেলেও সেই বালিশটা সরিয়ে দেখেনি। মহিলা তার দীর্ঘ নার্সিং জীবনে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনকে অনেকবারই মোকাবেলা করেছে। সে জানে অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলে আলামত সংগ্রহের জন্যে লাশের সুরতহাল অবিকৃত রাখতে হয়। অবশ্য লেখকের স্ত্রীকে মহিলা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার আগেই পুলিশ এসে হাজির হয় তাদের অ্যাপার্টমেন্টে।

মহিলা শুধুমাত্র লেখকের নাড়িস্পন্দন পরীক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করেনি। তার অবশ্য এ কাজটা করার কোনো দরকার ছিল না। দীর্ঘ কর্মজীবনে সে অনেক লাশ দেখেছে। লেখকের বরফের মতো ঠাণ্ডা আর ফ্যাকাশে হাতটা ধরতেই মহিলা বুঝতে পেরেছিল বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই তিনি মারা গেছেন।

পুরো বাড়িতে লেখক, তার স্ত্রী আর দুই বছরের সন্তান ছাড়াও দু'জন কাজের লোক আর একজন হাউজনার্স থাকে। লেখকের স্ত্রী অন্য একটা ঘরে ঘুমান। বাড়িতে কারো ঢোকা কিংবা বের হবার কথা জানা যায়নি। কেউ বলেওনি।

"অ্যাপার্টমেন্টের অন্য অ্যালোটিরা কি জানে জায়েদ রেহমান মারা গেছেন?" জামানকে জিজ্ঞেস করল বেগ।

গাড়িটা ভিটা নুভায় প্রবেশ করল। ওখানকার দারোয়ান আসলামের জায়গায় এখন গেট নিয়ন্ত্রণ করছে ধানমণ্ডি থানার এক কনস্টেবল। সে-ই গেটটা খুলে তাদের গাড়িটা ঢুকতে দিল। গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখে পুলিশের চিনতে অসুবিধা হয়নি, এটা সিটি হোমিসাইডের গাড়ি। জামান নিজেই ডাইভ করছে। গাড়িটা পার্ক করে সে বেগের প্রশ্নের জবাব দিল। "জানে, তবে তাদের সবাইকে আপাতত মুখ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। তাদেরকে জানানো হয়েছে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এটা শুনে ভয়ে চুপ মেরে আছে সবাই।"

“ভালো,” মুচকি হেসে ছোট্ট করে বলল বেগ। মুখ বন্ধ রাখার ভালো ব্যবস্থা এটা।

গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে জামান বলল, “খুব বেশি লোক এখানে থাকে, না স্যার।”

বেগ কিছু বলল না। পার্কিং এলাকার দিকে তার চোখ। এলাকাটি বেশ বড়। নিজেই দরজা খুলে বের হয়ে এল সে।

ছয় তলার অ্যাপার্টমেন্টের গ্রাউন্ড ফ্লোরটার পুরোটাই পার্কিংএরিয়া, দারোয়ানদের ছোট ছোট দুটো ঘরও আছে সেখানে।

“স্যার, এই দিকে আসুন,” জামান লিফটের দিকে এগোতে এগোতে বলল।

অধ্যায় ৬

সারা রাতে এক মিনিটের জন্যেও সি ই এ সিদ্দিকী ঘুমাতে পারেননি।

জরুরি যে ফোনটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেটা এসেছে অনেক দেরিতে কিন্তু সে কারণে নয়, তার মেজাজ খারাপ হয়ে আছে একমাত্র সন্তান ইরামকে ভোরবেলা থানা থেকে ছাড়িয়ে আনার ঘটনায়।

পুরো ব্যাপারটায় তিনি বিরক্ত এবং যারপরনাই হতাশ। এই ছেলেকে কোনোভাবেই আঁটকে রাখতে পারেন না। আজ দু'বছর ধরে মারাত্মক এক নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে ইরাম। সিদ্দিকী সাহেব ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকেন, মা মরা এই ছেলেটার দেখাশোনা করে সিদ্দিকী সাহেবের এক বিধবা খালাতো বোন। বড়িতে সাত জন কাজের লোকের চোখ ফাঁকি দিয়ে বার বার এই ছেলেটা কিভাবে বাইরে চলে যায় সেটা সিদ্দিকী সাহেবের কাছে একটা রহস্যই বটে। তিন তিনবার তাকে রিহ্যাবে ভর্তি করিয়েও কোনো ফল পাওয়া যায়নি। তার স্মার্ট ছেলে তিনবারই কড়া নিরাপত্তার মধ্য থেকে পালিয়েছে।

প্রথমবার যখন পালাল তখন ভাগ্য ভালো ছিল। দুঘণ্টার মধ্যেই তাকে ধরে ফেলা সম্ভব হয়েছিল পুলিশের কল্যাণে। দ্বিতীয়বার তাকে খুঁজে বের করতে আড়াই দিন লেগে যায়। সিদ্দিকী সাহেবের ঘনিষ্ঠ লোক অমূল্য বাবুর কারণে সেবার তাকে ধরা হয় বনানীতে তার মায়ের কবরের সামনে থেকে। কাকতালীয়ভাবে ঐদিনটি ছিল তার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী।

কিন্তু মাসখানেক আগে যখন পালাল তখন বাপের ঘাম ঝরিয়ে ছেড়েছে। পুরো একটা সপ্তাহ তাকে পাওয়া যায়নি। তৃতীয় দিনের মাথায় পুলিশের কথামতো পত্রিকায় ছবিসহ বিজ্ঞাপন দিলে কয়েক দিন পর তার সন্ধান পাওয়া যায়। বলাই বাহুল্য বিজ্ঞাপনে পুরস্কার হিসেবে যে টাকার কথা ছিল সেটা মোটা অঙ্কের ছিল না। সিদ্দিকী সাহেবের জন্য অবশ্য মোটা অঙ্কের পুরস্কার দেয়া কোনো ব্যাপারই ছিল না, কিন্তু তিনি ভালো করেই জানেন, এতে করে লোভী আর অপহরণকারীদেরকেই প্রলুব্ধ করা হবে। খুব সতর্কতা অবলম্বন করেই বিজ্ঞাপনের ভাষা এবং পুরস্কারের টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছিল :

মানসিক ভারসাম্যহীন এক ছেলে। এতিমখানা থেকে পালিয়েছে।

রাঙামাটি থেকে এক আর্মি অফিসার তাকে পাকড়াও করে বিজ্ঞাপনে দেয়া এতিমখানার নাম্বারে ফোন করলে ফোনটা আসলে ধরেছিল অমূল্য বাবু।

সিদ্দীকি সাহেবের স্মার্ট ছেলে রাঙামাটিতে এক শিব মন্দির খুঁজতে বেরিয়েছিল। একটা বইতে এ সম্পর্কে আজগুবি কিছু কাহিনী পড়ে তার ভেতর অ্যাডভেঞ্চারের নেশা চাপে।

বই, মনে মনে বললেন সি ই এ সিদ্দিকী। তার আরেকটা নেশা। অমূল্য বাবু ঘরে ঢুকতেই তার ভাবনায় ছেদ পড়ল।

তার সব কর্মচারীর মতো অমূল্য বাবু কখনই তাকে সালাম কিংবা নমস্কার দেয় না। মৃদুভাষী এই লোক প্রতিদিন সকালে মৌব্রত পালন করে। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলেও সকাল দশটার আগে কোনো রকম কথাবার্তা বলে না। তবে আজ সেই ব্রত বজায় রাখা সম্ভব হবে না।

তাকে দেখে সিদ্দিকী সাহেব অনেকটা হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। এই লোক হচ্ছে তার সমস্ত মুশকিল আসান। মাঝে মাঝে তার মনে হয় অমূল্য বাবুর মধ্যে অলৌকিক কোনো ক্ষমতা আছে বুঝি। এখন পর্যন্ত কোনো কাজে ব্যর্থ হয়নি এই লোক। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে আছে সিদ্দিকী সাহেবের সঙ্গে। এটা বন্ধুত্ব কিংবা মালিক-কর্মচারী সম্পর্কের অনেক উর্ধ্বে।

অমূল্য বাবু কোনো কথা না বলে সিদ্দিকী সাহেবের সামনের চেয়ারে বসে পড়ল।

তারা বসে আছে সিদ্দিকী সাহেবের বাড়ির স্টাডিরুমে। এটা এক রকমের অফিসঘরই।

এখান থেকে তিনি তার ব্যবসায়ি সাম্রাজ্য পরিচালনা করে থাকেন। দিন এবং রাতের বেশিরভাগ সময় এখানেই কাটিয়ে দেন তিনি। গতকাল রাত বারোটার পর ঢাকা ক্লাব থেকে ফিরে এসে এ ঘরেই আছেন। মাঝে ভোরবেলায় অল্প সময়ের জন্য একটু বাইরে যেতে হয়েছিল-ধানমণ্ডি থানায়।

সিদ্দিকী সাহেব বুঝতে পারছেন না অমূল্য বাবুর মৌনতা তিনি নিজে ভাঙবে কি না। একটু সময় চুপ করে থাকলেন এই আশায়, বাবু হয়তো নিজেই নিজের ব্রত ভাঙবে।

তাই হলো। "থানায় কি রেকর্ড আছে?" নম্রকণ্ঠে জানতে চাইল অমূল্য বাবু।

ইরামের গ্রেফতার হওয়া এবং থানা থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনার সব ঘটনাই অমূল্য বাবু জানে। তার উকিল রফিকউল্লাহ থানা থেকে অমূল্য বাবুর বাড়ি গিয়ে সব বলে এসেছে। অমূল্য বাবু তখনও নিজের মৌনতা ভঙ্গ করেনি। কেবল চুপচাপ শুনে গেছে। আর একতরফাভাবে পুরো ঘটনা বলতে গিয়ে রফিকউল্লাহর মনে হয়েছিল এরচেয়ে বিরক্তিকর কাজ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। যেন মরা কোনো লাশের কানে কানে ঘটনাটা বলে যাচ্ছে সে।

এ কেমন লোক! কোনো রকম কৌতূহলী হয়ে প্রশ্নও করল না! অমূল্য বাবুর বাড়ি থেকে বের হবার সময় রফিকউল্লাহ ভেবেছিল।

"না। খান নিজে ফোন করে ব্যাপারটা মিটমাট করেছে," সিদ্দিকী সাহেব বললেন। এই খান হলো বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফরহাদ খান।

বাবু কিছু বলল না। অনেকক্ষণ চুপ থেকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে বলল, "এখন কি করতে চাচ্ছেন?"

"দেশের বাইরে পাঠাতে চাইছি," কথাটা আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলেন তিনি।

"কোথায়?"

"কোথায় পাঠাবো সেটা বড় কথা নয়, কতো দ্রুত পাঠানো যাবে সেটাই হলো সমস্যা।"

অমূল্য বাবু একটু ভাবলো। "কবে পাঠাতে চাচ্ছেন?"

"আজই। পারলে এক্ষুণি।"

গাড়িতে করে আসার সময়ই বাবু ভেবে রেখেছিল সম্ভাব্য কি করা যেতে পারে। "ঠিক আছে।" অমূল্য বাবু কথাটা এমনভাবে বলল যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

সিদ্দিকী সাহেব এই ছোট্ট কথাটা শুনে যে স্বস্তি পেলেন সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। যেন তিনি নিজেও জানেন অমূল্য বাবু সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন। অনেকটা নির্ভার হয়ে বললেন, "তাহলে এখন কি করতে হবে?"

"আপনাকে কিছু করতে হবে না। আপনি একদম স্বাভাবিক থাকুন। আমি দেখছি।"

সিদ্দিকী সাহেব এমনভাবে তাকালেন যেন আরো কিছু জানতে চাইছেন তিনি।

"ইরামকে বিদেশের কোনো রিহ্যাবে অ্যাডমিট করিয়ে দেবো। ইউরোপ-আমেরিকায় এখন পাঠানো যাবে না। সময় লাগবে। বোম্বেতে একটা ভালো রিহ্যাব আছে। প্রেয়ারহল। ওখানে ভর্তি করানো যাবে। আমি ব্যবস্থা করছি।"

"বোম্বে? ওকে, ফাইন। আজ কখন ফ্লাইট ধরতে পারবো?" সিদ্দিকী সাহেব জানতে চাইলেন।

একটু চুপ করে রইল অমূল্য বাবু। যেন মনে মনে হিসেব করে নিচ্ছে। "...দেখি কতো তাড়াতাড়ি করা যায়। আশা করছি বিকেলের মধ্যেই সম্ভব হবে।"

সিদ্দিকী সাহেব এতোটা আশা করেননি। অতীতের অজস্রবারের মতোই আরেকবার অমূল্য বাবুর কাছ থেকে ম্যাজিকের মতো সমাধান পাচ্ছেন তিনি। "ওকে, দ্যাটস গুড।

অ্যাকাউন্ট ম্যানেজারকে বলে দিচ্ছি আপনার যা যা লাগবে তা যেন দিয়ে দেয়।”

উঠে দাঁড়াল অমূল্য বাবু। দরজার কাছে থেমে ফিরে তাকাল সে। “ইরাম এখন কোথায়?”

সিদ্দিকী সাহেব ছাদের দিকে চোখ তুললেন। স্বল্পভাষী লোকের সংস্পর্শে এসে তিনিও প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন।

বিকেলের আগপর্যন্ত সামলে রাখুন।”

কথাটা শুনে ভেতরে ভেতরে কাচুমাচ বোধ করলেন সিদ্দিকী সাহেব। যেন তার গাফলতির জন্য মৃদু ভত্‌সনা করা হয়েছে।

অমূল্য বাবু নিজের মৌনতা ভাঙার জন্য একটুও অনুতপ্ত হলো না, কারণ দিনটা আর সব দিনের মতো স্বাভাবিক নয়। আজ তাকে অনেক ফোন করতে হবে। অনেক কাজ করতে হবে।

অধ্যায় ৭

ভিটা নুভা অ্যাপার্টমেন্টের ছয় তলার দুটো ইউনিট নিয়ে থাকেন লেখক জায়েদ রেহমান। দুটো ইউনিটকে এক করে চমৎকার একটা ফ্ল্যাটে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ভেতরের ডেকোরেশন করেছে দেশের সবচাইতে নামী এক স্থপতি। পাঁচ বছর আগে জায়গাটা কিনে নেন, পরে ডেভেলপারকে দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট বানিয়েছেন তিনি। নিজের জন্য একটা রেখে বাকিগুলো বিক্রি করে দিয়েছেন।

ভিটা নুভা-অ্যাপার্টমেন্টের এই নামটি লেখক নিজে দিয়েছেন। হেনরি ওয়ার্ডসওর্থ লংফেলোর কাব্যগ্রন্থ ভিটা নুভা'র নামানুসারে এ নাম রেখেছেন তিনি, যার মানে নতুন জীবন। আক্ষরিক অর্থে এখানে চলে আসাটা তার জন্যে তা-ই ছিল।

চার বছর আগে লেখক তার প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে এখানে ওঠেন। দ্বিতীয় স্ত্রীকে বিয়ে করার আগে একবছর লিভ টুগেদার করেছেন এই ফ্ল্যাটেই।

দুবছর বয়সি এক ছেলে আর দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে এখানে তিনি বসবাস করে আসছেন আজ চার বছর ধরে। সারা জীবন রহস্য করে যাওয়া লোকটি আজ হঠাৎ করে মারা গেলে আরো বড় একটি রহস্য তৈরি হয়েছে তার মৃত্যুকে ঘিরে। পুলিশকে এখন খুঁজে বের করতে হবে এটা কি স্বাভাবিক মৃত্যু না কি হত্যাকাণ্ড।

একজন সেলিব্রিটি হওয়ায় সিটি হোমিসাইডকে প্রাথমিক তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাদেরকে আগে বের করতে হবে এটা হত্যা না কি স্বাভাবিক মৃত্যু। যদি হত্যা হয়ে থাকে তবে নিশ্চিতভাবে তাদের উপরেই এই হত্যার তদন্ত কাজটি দেয়া হবে।

সিটি হোমিসাইডের উদীয়মান ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ বিশেষ বিশেষ হোমিসাইড কেসগুলো দেখাশোনা করে। আমেরিকার এফবিআই যে প্রশিক্ষণ নেয়, জেফরিরও রয়েছে ঠিক সেই প্রশিক্ষণ। এজন্যে তাকে ডিপার্টমেন্টে একটু ঈর্ষার চোখে দেখা হয়। তবে এই সুযোগটি সে পেয়েছে নিজ যোগ্যতার বলেই। রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে তাকে অর্জন করতে হয়েছিল ভার্জিনিয়ার টিকেট। এক বছরের প্রশিক্ষণে জেফরি বেশ ভালো করেছে। এটা তার ইন্সট্রাক্টরের দেয়া মূল্যায়ন রিপোর্টে উল্লেখ আছে। এফবিআই'র সাথে যোগাযোগ থাকায় দুয়েকটি আন্তর্জাতিক কেসও সে বেশ সফলতার সাথে সমাধা করেছে।

গত বছরের একটি বহুল আলোচিত ঘটনা তাকে একজন গোয়েন্দা হিসেবে দেশে ছোটখাট পরিচিতি এনে দিয়েছে। পত্রিকাগুলো তার ডাক নাম দিয়েছে জেফরি হোমস বলে। এটা জেফরির একদম অপছন্দ। শব্দটা ডিটেক্টিভদের জন্য ক্লিশে পরিণত হয়েছে।

অবশ্য তার নিজের ডিপার্টমেন্টে তাকে অনেকেই জেফবিআই বলে ডাকে জেফরি বেগ দ্য ইনভেস্টিগেটরের সংক্ষিপ্ত রূপ।

অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরটা বহুমূল্যবান আসবাব দিয়ে সাজানো হয়েছে। এটা লেখকের দ্বিতীয় স্ত্রী বর্ষার রুচির বহিপ্রকাশ। বিদেশি জিনিসের প্রতি যার রয়েছে দূর্বার আকর্ষণ।

বেগ সরাসরি ক্রাইম সিনে চলে এল।

বিশাল ঘরটা দেখে হল রুম বলেই মনে হচ্ছে। এই ঘরটা বিশেষভাবে বানানো হয়েছে লেখকের ফরমায়েশে।

ঘরে ঢুকেই জেফরি বেগ দেখতে পেল একটা মেডিকেল বেডের চারপাশে তিন চারজন পুলিশ ঘিরে রয়েছে, তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। তাকে ঢুকতে দেখে পুলিশের দলটি নিজেদের মধ্যে কথা বলা থামিয়ে বিছানার কাছ থেকে সরে যেতেই লেখকের নিথর-নিষ্প্রাণ দেহটি জেফরির গোচরে এল। মুখে এখনও বালিশটা অবিকৃত অবস্থায়ই আছে।

একজন পুলিশ বেশ আগ্রহভরে তার দিকে এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিল। "স্যার,

আমি ধানমণ্ডি থানার ইন্সপেক্টর এলাহী নেওয়াজ।”

এখানে আসার পথেই জামানের কাছ থেকে বেগ জানতে পেরেছে ধানমণ্ডি থানার ইন্সপেক্টর এলাহী নেওয়াজের কল্যাণে এই ঘটনাটি উদঘাটিত হয়েছে। বেগ প্রশংসার সুরে বলল, “ও, আপনিই তাহলে এলাহী নেওয়াজ! ওয়েল ডান,” বলেই হাতটা বাড়িয়ে দিল ইন্সপেক্টরের দিকে।

এলাহী বেশ গর্বিতভাবে হাত মেলাল জেফরি বেগের সাথে।

“জেফরি বেগ,” নিজের পরিচয় দিয়ে বলল সে।

“জানি, স্যার, আপনাকে আমি চিনি।”

“আচ্ছা,” বলেই আনমনা হয়ে গেল সে। তার নজর এখন মেডিকেল বেড়ে পড়ে থাকা মৃতদেহের দিকে। ইন্সপেক্টর এলাহী মৃতের মুখ থেকে বালিশটা সরিয়ে দিল।

চোখ দুটো এখনও খোলা অবস্থায় আছে। বলা ভালো কোটর থেকে দুটো যেন ঠিকরে বের হবার চেষ্টা করছে।

মুখটা একটু খোলা। লেখকরে আধ বোজা দৃষ্টি তার বাম দিকে ফেরানো। মাথাটা সেদিকেই কাত হয়ে আছে। ডান হাতটা বুকের বাম পাশে রাখা। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে হয়তো বুকটা চেপে ধরেছিলেন।

দুয়েকটা মাছি লেখকের মুখের চারপাশে ভন ভন করে উড়ে বেড়াচ্ছে। দৃশ্যটা বীভৎস্য। যতো সময় গড়াতে থাকে ততোই ভয়ংকর হতে শুরু করে লাশ। এমন কি মৃতের নিকটজনেরাও তখন ভয় পেতে শুরু করে। তাদের কাছে আর মনে হয় না এটা তাদেরই ঘনিষ্ঠজনের মৃতদেহ।

একটা কটু গন্ধ নাকে এল বেগের। লাশ পচতে শুরু করেছে। এই গন্ধটি বাড়তে থাকবে। এক সময় অসহ্য ঠেকবে। বোঝাই যাচ্ছে মধ্যরাতে মারা গেছেন। অথবা খুন!

গল্পটা বলার জন্যে অনেকটা মুখিয়ে ছিল এলাহী নেওয়াজ তবে বেগের মধ্যে সে রকম কোনো আগ্রহ দেখতে না পেয়ে হতাশই হলো সে। চারপাশে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবছে বেগ। তার কাছ থেকে গল্প শোনার ব্যাপারে যে তার মনোযোগ নেই সেটা বুঝতে পেরে চুপসে গেল এলাহী।

“গ্লাভস নিয়ে আসো,” বেগ জামানকে বললে সে পাশের ঘরে চলে গেল। ঐ ঘরে ফাইন্ডার ইউনিটের লোকজন এসে নিজেদের সরঞ্জাম গোছগাছ করছে।

“আপনি খুব ভালো কাজ করেছেন। পরে আপনার সাথে কথা বলবো,” এলাহীকে বলল বেগ।

“স্লামালেকুম, স্যার।” এলাহী ঘর থেকে বের হয়ে আসার সময় মনে মনে ভাবলো জেফরি বেগের ধর্মটা কি? এর আগে এই প্রশ্নটি তার মনে উদয় হয়নি। কিন্তু এখন হঠাৎ করেই কথাটা মনে পড়ল।

বেগের পূর্ণ মনোযোগ এবার নিথর দেহটার দিকে। হাতে গ্লাভস পরে নিলো এই ঘরে যাতে কোনো লোকের আঙুলের ছাপ পড়ে। ঘর থেকে সবাইকে বের হয়ে যেতে বলে দিলে জামান সবাইকে চলে যেতে বলল, রয়ে গেল কেবল সে নিজে।

লাশের শরীরে এমন কোনো চিহ্ন নেই যে এটাকে হত্যাকাণ্ড বলে মনে করা যাবে। নিথর দেহটা বিছানায় পড়ে আছে-আট মাস ধরেই এভাবে পড়ে আছে মি. রেহমান। মুখটা হা করা। চোখ দুটো আধ বোজা। এটা কোনো অদ্ভুত ব্যাপার নয়। যদিও দেখতে খুব ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

জায়েদ রেহমানের পরনে আছে একটা ফতুয়া জাতীয় নাইটড্রেস আর পাজামা। শীতকাল

বলে মোটা একটা কম্বলও রয়েছে গায়ে। সেটা বুকের নিচে নামানো।

"স্যার, উনার ওপেনহার্ট সার্জারি হয়েছিল এক বছর আগে," পাশ থেকে জামান আস্তে করে বলল। আরেকটু উৎসাহী হয়ে উঠল সে, "সার্জারির পর হার্ট অ্যাটাক হয়। শরীরের অবস্থা এমনিতেও খুব একটা ভালো ছিল না।"

"তোমার ধারণা এটা নেচারাল ডেথ?" বেগ লাশের দিকে তাকিয়েই বলল।

"সেটা কি করে বলি? লাশের মুখের উপর বালিশ চাপা দেয়া ছিল।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জেফরি বেগ লাশের একেবারে সামনে চলে গেল। ফতুয়ার বুকের দিকটা একটু ফাঁক করে ওপেন হার্ট সার্জারি করার জায়গাটা দেখল। কমপক্ষে চৌদ্দ ইঞ্চির মতো দীর্ঘ একটা কাটা দাগ। বেশ স্পষ্ট। বুকের ঠিক মাঝখানে। নাভির দু'ইঞ্চি উপরে থেমে গেছে, আর শুরু হয়েছে গলার দু'ইঞ্চি নিচ থেকে।

বুকের বাম দিকে, যেখানে হৃদপিণ্ডটা থাকে, ঠিক সেখানে দুই ইঞ্চি বাই এক ইঞ্চির মতো ছোট্ট একটা বৃত্ত। চামড়ার উপর আবছা নীলচে একটা ছোপ। লেখক বেশ ফর্সা বলে এটা বোঝা যচ্ছে। তার গায়ের রঙ কালো কিংবা শ্যাম বর্ণের হলে হয়তো এটা খালি চোখে ধরা পড়তো না।

ময়নাতদন্ত করবে যে তাকে বলে দেবে এটা খতিয়ে দেখতে।

পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে লাশের সেই জায়গাটার এবং ঘরের ভেতরর কয়েকটা ছবি তুলে নিলো জেফরি। কাজটা জামানকে দিয়েও করানো যেতো, কিন্তু বেগ এই কাজটা নিজেই করতে চায়। জামান ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখে যাচ্ছে। এ রকম দৃশ্যের সাথে সে বেশ পরিচিত।

ছবি তোলা শেষ করে জামানের দিকে তাকাল সে। "অন্য ঘরগুলোর কি অবস্থা?"

"আনটাচ আছে," জবাব দিল জামান। একটু ভেবে বেগ আবার বলল, "ভদ্রমহিলা কোন্ ঘরে থাকেন?"

"ভেতরের ঘরে।"

"উনি কোথায়?"

"লিভিংরুমে। এই অ্যাপার্টমেন্টের সবাইকে ওখানে জড়ো করে রাখা হয়েছে," জামান বলল। সে জানে কথাটা শুনে বেগ খুশি হবে।

"গুড।" কথাটা বলেই ঘরের চারপাশে আরেকবার তাকাল। নিজের মোবাইলটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

জামান জানে এখন সে কি করবে। ক্রাইমসিনের অবিকৃত অবস্থা তদন্তের জন্য খুবই জরুরি। কারণ এই অবস্থা খুব বেশিক্ষণ অবিকৃত থাকে na

মোবাইলটা মুখের কাছে ধরল। "লাশের বাম বুকে একটা লালচে ছোপ আছে... পোস্টমর্টেমে এটা দেখতে হবে...আর কোনো অস্বাভাবিকতা নেই...ঘরটা বিশ বাই পঁচিশ... আনুমাণিক...একটা দরজা...পূর্ব দিকে...জানালা চারটা...দক্ষিণ দিকে একটা বেলকনি... স্লাইড ডোর...ভিকটিমের অবস্থান উত্তর-পূর্ব দিকে...মেডিকেল বেডে..." একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল সে। "বেলকনির কাঁচের স্লাইড ডোর আর জানালাগুলো বন্ধ... ঘরে এসি আছে..."

ঘরের এক কোণে একটা কফি টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় একটি ল্যাপটপ দেখেতে পেল, ল্যাপটপটাতে এখনও কানেকশান দেয়া আছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল সেটা চালু অবস্থায়ই রয়েছে। "একটা ল্যাপটপ আছে...এখনও সেটা চালু রয়েছে।"

বেলকনির স্লাইড ডোরের কাছে গিয়ে থেমে গেল বেগ। স্লাইড ডোরটা খোলার প্রয়োজন

নেই। কাঁচের মধ্য দিয়েই দেখতে পাচ্ছে নিচের মেইন রোডটা। “...ঘরে আর কিছু নেই-” কথাটা বলেই থেমে গেল। তার চোখ গেল ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটা বাক্স আকৃতির জিনিসের দিকে। একটু কাছে এগিয়ে যেতেই বুঝতে পারল সেটা কি।

“...ঘরে একটা আইপিএস আছে।” রেকর্ডিং করা থামিয়ে দিয়ে বেগ ভাবলো এই তথ্যটা হয়তো কোনো কাজেই লাগবে না। তারপরও অভ্যাশবশত তথ্যটা নিতে ভুল করল না সে। খুঁটিনাটি সব তথ্য নেয়াই ভালো। তবে একটা খুনের সাথে আইপিএস'র সম্পর্ক থাকবে কিভাবে সেটা বেগ নিজেও ভেবে পেল না। তবে পরে যখন সব জানতে পারবে তখন এ কথাটা ভেবে খুবই বিস্মিত হবে ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ।

মোবাইলটা বন্ধ করে জামানের দিকে ফিরল এবার। “মিসেস রেহমানের ঘরটা কোথায়?”

“এখনই যাবেন?”

“হ্যা।আর এই ঘরে ফিঙ্গারপ্রিন্ট টিমকে কাজ করতে শুরু করে দিতো বলো। বেলকনির স্লাইড ডোরটা ভালো করে যেন চেক করে দেখে।” মিসেস রেহমানের ঘরের দিকে যেতে যেতে বেগ আরো বলল, “প্রসিডিংগুলো কি করেছো?”

“জি, স্যার। এই ভবনের সব লোককে বলে দিয়েছি বাইরে যেন না বের হয়। এই ঘরে যারা কাল রাতে ছিল তাদের সবাইকে লিভিংরুমে রেখে দিয়েছি। পুরো এলাকা সিল করা আছে। নাইটগার্ডদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। তেমন কিছু পাওয়া যায়নি।”

লিভিংরুম দিয়ে যাওয়ার সময় বেগ লক্ষ্য করল এক যুবতী মেয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে সোফায় বসে আছে। লেখকের তরুণী স্ত্রী, বুঝতে পারল সে। আরো কয়েকজন আশেপাশে আছে। আর আছে পুলিশের লোক। তারা সবাই সম্ভ্রমের সাথে বেগ আর জামানকে পথ করে দিল।

মিসেস রেহমানের শোবার ঘরটা বেশ বড়। প্রায় ফাঁকাই বলা যায়। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলো বেগ। বিছানা ছাড়া ঘরে একটা ড্রেসিং টেবিল আর টিভি আছে। আর কিছু নেই। আশ্চর্য!

এই বাড়ির জৌলুশের তুলনায় এটা একেবারেই বেমানান।

“এটাই কি ভদ্রমহিলার শোবারঘর?” জামানকে জিজ্ঞেস করল।

“জি স্যার।”

“কিন্তু ঘরটা খুব বেশি ফাঁকা, আসবাব তেমন নেই।” অনেকটা আপন মনে বিড়বিড় করে বলল সে। “আচ্ছা, জায়েদ সাহেব প্যারালাইজড হবার আগে কি এই ঘরে ঘুমাতেন?”

জামানের এটা জানা নেই। সে মাথা নেড়ে জবাব দিল।

“বাড়ির কাজের লোকদের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।”

“এক্ষুণি?”

“হ্যাঁ।”

ঘরে একটাই দরজা। দক্ষিণে একটা জানালা আর বেলকনি। একটা কটু গন্ধ আছে ঘরে। গন্ধটা কিসের বেগ খুব সহজেই বুঝতে পারল।

“স্যার।”

বেগ পেছনে ফিরে দেখল জামান ফিরে এসেছে।

“আরেকটা বেডরুম আছে, কিন্তু ভদ্রমহিলা ওটা আর এখন ব্যবহার করেন না। এটাই উনি ব্যবহার করেন।”

“আচ্ছা।” বেগ অ্যাটাচ বাথরুমের ভেতর ঢুকলো।

বাথরুমটা খুবই পরিস্কার আর স্বাস্থ্যকর। একেবারে আধুনিক একটি টয়লেট। চমৎকার

বেসিন আর কমোডের পাশাপাশি একটা পর্দা দিয়ে আলাদা করা আছে মাঝারি আকারের বাথটাব। বাথরুমে ঢুকে পড়লে জামান বুঝতে পারল না সেও ভেতরে ঢুকবে কি না। বাথরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল সে। এক মিনিট পরেই বেগ বের হয়ে এল। তার মুখে কোনো কথা নেই। ভাবছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চুলটা ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল যেন।

বেগের ভাবসাব দেখে জামানের কাছে মনে হচ্ছে ইন্সপেক্টর এলাহী কাকতালীয়ভাবে একটা স্বাভাবিক মৃত্যুর সময় ঢুকে পড়ে পুরো পরিস্থিতিটাকে জটিল করে তুলেছে। লেখক জায়েদ রেহমান খুন হননি। একটাই খটকা : মৃত লেখকের মুখের উপর বালিশ দেয়া ছিল।

জেফরি বেগ আয়নায় নিজের চল ঠিক করে বেডের চারপাশটা ভালো করে দেখতে লাগল। এই ঘরের গন্ধটার উৎস খুঁজছে। কোথাও নেই। বিছানার পাশে যে জানালাটা আছে সেটার স্লাইড-ডোর খুলে নিচের মেইন রোডের দিকে তাকাল। এই ঘরের একটা বেলকনি আছে, বিশাল স্লাইড ডোরটা একপাশে টেনে দিয়ে বেলকনিতে এসে দাঁড়াল সে।

যা ভেবেছিল তাই। এখানে পাওয়া গেল গন্ধের উসটা। হাঁটু ভেঙে বসে বেলকনির মেঝেতে পড়ে থাকা সেই ছোট্ট বস্তুটা ভালো করে দেখে পেছনে ফিরে জামানের উদ্দেশ্যে বলল, "এভিডেন্স ব্যাগ নিয়ে আসো।"

স্বচ্ছ পাস্টিকের ছোট ছোট চারকোণা ব্যাগগুলো এভিডেন্স সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করা হয়। এগুলোর মুখ ক্লিপের মতো আর্টকে রাখা যায় খুব সহজে। এদেশের অনেক পণ্যে এই সব ব্যাগ ব্যবহার করা হয়। জামান যে ব্যাগগুলো নিয়ে এল সেটা দেখে কান পরিস্কার করা কটন-স্টিকের ব্যাগ বলেই মনে হবে।

গ্লাভ পরা হাত দিয়ে ছোট্ট জিনিসটা ব্যাগে ভরে জামানের হাতে দিয়ে দিল বেগ। কোনো কথা না বলে ব্যাগটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল জামান।

উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশটা ভালো করে তাকিয়ে দেখল বেগ। ডান দিকে লেখক জায়েদ রেহমানের ঘরের যে বেলকনিটা আছে সেটা দেখতে পেল। পাশাপাশি দুটো ঘর; পাশাপাশি দুটো বেলকনি। স্থপতিরা যাকে বলে হ্যান্ডশেক বেলকনি। জেফরি অবশ্য নিশ্চিত নয় দু'জন মানুষ এখান থেকে হাত মেলাতে পারবে কি না।

আবারও ঘরের ভেতর বিছানার কাছে ফিরে এল সে, তার সাথে সাথে জামানও। জেফরি বেগের মনোযোগ ব্যাঘাত হবে এই ভয়ে জামান কিছুই বলছে না। বিছানার ডান পাশে উপুড় হয়ে কী যেন খুঁজতে শুরু করল বেগ। জামান অবশ্য ভেবে পাচ্ছে না সেটা কি। দেয়াল থেকে খাটের এই অংশটার দূরত্ব দুই ফুটের মতো হবে।

সিলভার রঙের ছোট্ট দুটো কাগজের টুকরোর মতো জিনিস পড়ে আছে। খাটের এখানটায়। অবিবাহিত হলেও এই জিনিসটা বেশ ভালো করেই চেনে জেফরি বেগ। তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ছোট্ট এই জিনিসটা তাকে পুরো ঘটনাকে নতুন করে ভাববার সুযোগ করে দিচ্ছে এখন। কিছুক্ষণ আগেও নাস্তা করেনি বলে যে ক্ষিদের ভাবটা ছিল সেটা এক নিমেষে উধাও হয়ে গেল। জেফরি বেগ এই তদন্তে পুরোপুরি ঢুকে পড়েছে। এ রকম একটা ক্লু আর এভিডেন্স থাকলে ম্যাজিকের মতোই সে রহস্য উদঘাটন করতে পারবে সে বিশ্বাস তার রয়েছে। জামানের কাছ থেকে আরেকটা এভিডেন্স ব্যাগ হাতে নিয়ে খুব সাবধানে সিলভার রঙের ছোট্ট জিনিস দুটো ব্যাগের ভেতর ভরার সময় জামানও সেটা দেখতে পেল। জেফরির মতো সেও চিনতে পারল সেটা। একটু লজ্জা বোধ করল সে। কারণ সেও অবিবাহিত।

"মিসেস রেহমানের সাথে কথা বলতে হবে," জামানকে বলল সে।

***

সদ্য স্বামী হারানো মহিলাদের মতো লাগছে না মিসেস রেহমানকে। একটু বিপর্যস্ত কিন্তু যতোটা হলে মৃতের বাড়ির আত্মীয়স্বজন আড়ালে-আবডালে এ কথা বলবে না যে, মহিলার হৃদয় পাষাণ, স্বামীর প্রতি যথেষ্ট টান নেই, ততোটা ভেঙে পড়েননি। দূরের আত্মীয় মারা গেলে যতোটুকু শোক শোক ভাব না করলেই চলে না মহিলার মধ্যে সেরকম পরিমিত শোক দৃশ্যমান। বেগের কাছে মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলা স্বামী হারানোর চেয়ে অজ্ঞাত এক আশঙ্কায়ই যেন বেশি ঘাবড়ে আছেন। তবে সে এও জানে, তার ধারণা ভুল হতে পারে। আবেগ প্রকাশের বেলায় সবাই এক রকম হয় না। লিভিংরুমের সোফায় মিসেস রেহমানের সাথে কথাবার্তা বলতে শুরু করল সে।

"আপনি তাহলে নিজের ঘরেই ছিলেন?" বেগ জানতে চাইল মিসেস রেহমানের কাছে।

মহিলা মাথা নিচু করে রেখেছে। সে অবস্থায়ই মাথা নেড়ে সায় দিল।

"ঘুমাচ্ছিলেন?" আবারো একইভাবে মাথা নেড়ে জবাব দিল ।

একটু সময় নিয়ে আচমকা বেগ বলল, "স্মোক করেন?"

চমকে উঠে মহিলা মুখ তুলে তাকাল। যেন সদ্য বিধবার সাথে নির্মম রসিকতা করেছে সে। "আমাকে বলছেন?"

"জি," বেশ স্বাভাবিকভাবেই বলল সে।

মহিলা অনেক কষ্টে নিজের রাগ দমিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "না। আমার ওসব বদ অভ্যাস নেই।"

"ভালো। আমারও নেই।" আরো স্বাভাবিকভাবে বলল বেগ। মহিলার বিরক্তিটাকে আমলেই নিলো না।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জামান জম্পেশ একটা জিজ্ঞাসাবাদের আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে জেফরি বেগ সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। "ঠিক আছে, আপনাকে ধন্যবাদ। আমি আসলে এ রকম মুহূর্তে আপনাকে বিরক্ত করতে চাচ্ছিলাম না, নিতান্তই অফিসিয়াল কারণে দুয়েকটা তথ্য জেনে নিলাম। আপনার মনের অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি। আপনার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই।"

মহিলা এমনভাবে বেগের দিকে তাকালেন যেন বুঝতে পারছেন না এটা নতুন কোনো ঠাট্টা কি না। পুলিশ সম্পর্কে আগের যেসব ধারণা তার ছিল তার সাথে এটা একেবারেই যাচ্ছে না। যেখানে তাকে সন্দেহ করে আক্রমণাত্মকভাবে জেরা করা হবে বলে আশঙ্কা করেছিল সেখানে কি না এই ইনভেস্টিগেটর ভদ্রভাবে শোক প্রকাশ করছে!

মহিলাকে বিস্ময়ের মধ্যে রেখেই জেফরি বেগ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জামান এতোটাই হতভম্ব যে নড়তে পারল না। কয়েক সেকেন্ড পর ধাতস্থ হতেই তাড়াহুড়া করে বেগের পেছন পেছন দৌড়ে গেল সে।

লেখকের ঘরে ঢুকলো বেগ, তার পেছন পেছন অনেকটা দৌড়ে চলে এল জামান। "স্যার, মহিলাকে আর কিছু-"

বেগ তার কথার মাঝখানে বাধা দিল হাত তুলে। থেমে ঘুরে তাকাল সে। "মোবাইল এভিডেন্স ভ্যান এসেছে?"

থতমত খেয়ে জামান বলল, "ফোন করে দেখছি।"

কিন্তু তাকে আর ফোন করতে হলো না। লেখকের ঘরে হলুদ রঙের ওভারঅল পরা এক লোককে ঢুকতে দেখেই বুঝে গেল মোবাইল এভিডেন্স ভ্যান এরইমধ্যে এসে পড়েছে।

"স্যার," লোকটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল জামান।

“ঠিক আছে। আমি নিচে যাচ্ছি। তুমি এখানকার সবার আঙুলের ছাপ নিয়ে রাখবে। আর ঘরের বিভিন্ন জায়গায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট টিমকে খুঁজে দেখতে বলবে কিছু পাওয়া যায় কি না। বিশেষ করে জায়েদ রেহমান এবং মিসেস রেহমানের ঘরে একটু বেশি চেক করতে বলবে। তুমি নিজে থেকে কাজটা তদারকি কোরো।”

“এখানে আপনার কাজ শেষ?”

“আপাতত।” কথাটা বলেই জেফরি বেগ ঘর থেকে দ্রুত বের হয়ে গেল। ক্ষিদেটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। খুব দ্রুত কাজ সেরে নাস্তা করে নিতে হবে। তার হাতে যে আলামতগুলো আছে তাতে করে কাজটা খুব দ্রুত করতে পারবে বলে মনে করছে সে। তার পকেটে থাকা ছোট্ট দুটো আলামত এই হত্যারহস্য উন্মোচন করে দেবে। একেবারে ম্যাজিকের মতো, মনে মনে বলল জেফরি বেগ।

অধ্যায় ৮

মোবাইল এভিডেন্স ভ্যান আদতে একটি বড়সড় মাইক্রোবাস। অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত এই গাড়িটি ঢাকা সিটি হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ। প্রায় তিন কোটি টাকা দামের এই গাড়িতে রয়েছে একটি মিনি ফরেনসিক ল্যাব। তাৎক্ষণিকভাবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট থেকে শুরু করে ডিএনএ টেস্ট পর্যন্ত করা যায় এই ভ্রাম্যমান ল্যাবে। মাত্র তিন মাস আগে এটি কেনা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এটির সর্বোত্তম ব্যবহার করা হয়ে ওঠেনি। জেফরি বেগ এই ভ্যান কেনার ব্যাপারে বেশ ভালো ভূমিকা রেখেছিল। ফলে ডিপার্টমেন্টের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা তার ঈর্ষাকাতর শত্রুরা ইদানিং আড়ালে আবডালে বলে বেড়াচ্ছে খামোখাই এতগুলো টাকা গচ্চা দেয়া হয়েছে। কথাটা জেফরি বেগের কানেও গেছে। সে পাত্তা দেয়নি। অপেক্ষা করেছে এটির সর্বোত্তম ব্যবহারের দিনটির জন্য। লিফটে করে নিচের পার্কিংলটে যাবার সময় তার মনে ক্ষীণ আশা উঁকি দিল, হয়তো আজকের দিনটাই হতে পারে সেই দিন।

সাদা রঙের অ্যাম্বুলেন্সসদৃশ্য গাড়িটা অ্যাপার্টমেন্টের গ্রাউন্ডফ্লোরের পার্কিংলটে লিফটের পাশেই পার্ক করা আছে। এর পেছনের ডাবলডোরের একটা পাল্লা খোলা। ভেতরে ফরেনসিক টিমের প্রধান সাবের কামাল এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট-অ্যানালিসিস টিমের এডলিন ডি কস্তা বসে আছে। টিমের বাকি সদস্যরা আগেই এখানে এসে গেছে। তারা এখন জায়েদ রেহমানের ঘরের বিভিন্ন স্থানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর ডিএনএ থাকতে পারে এ রকম বস্তু সংগ্রহ করে যাচ্ছে।

জেফরি বেগকে দেখে সাবের কামাল হাত তুলে হ্যালো জানালেও এডলিন ডি কস্তা কম্পিউটার মনিটর থেকে একটুও চোখ তুলল না। এই মেয়েটি জেফরির উপস্থিতিতে আড়ষ্ট হয়ে যায়। কারণটা আন্দাজ করতে পারে বেগ, কিন্তু সেও ব্যাপারটা না বোঝার ভান করে। টিনএজারদের মতো আচরণ করছো মেয়ে, মনে মনে বলল জেফরি।

"কিছু পেলেন?" গাড়ি থেকে নেমে সাবের জানতে চাইল।

পকেট থেকে দুটো এভিডেন্স ব্যাগ বের করে তুলে ধরল বেগ। "এই হলো তোমার চাবি। এখন এটা দিয়ে কি ভোলা যাবে সেটা বের করার দায়িত্ব তোমাদের।"

ব্যাগ দুটো হাতে নিয়ে ভালো করে দেখল সাবের কামাল। সিলভার রঙের কাগজের টুকরো দুটো দেখে আস্তে করে শিষ বাজিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল বেগের দিকে।

"এটাই আসল চাবি। এটাতে খুব সম্ভবত আঙুলের ছাপ আছে।"

"অবশ্যই আছে," বেশ জোর দিয়ে বলল সাবের। "এই জিনিস কেউ পা দিয়ে খোলে না। আমি নিশ্চিত, দু'হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর স্পষ্ট ছাপ থাকবে।"

"আমার একটা হলেই চলবে," কথাটা বলে বেগ আড়চোখে এডলিনের দিকে তাকালে তাদের চোখাচোখি হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্য। যেন কিছুই হয়নি এ রকম একটা ভান করে আবারও কম্পিউটার মনিটরে নজর দিল মেয়েটি।

সাবের প্লাস্টিকের ব্যাগ দুটো হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে যাচ্ছে। সিলভার রঙের কাগজের টুকরোর ব্যাগটা তার হাত থেকে নিয়ে নিলো বেগ। "এটা তোমার জন্য নয়।"

"তা ঠিক। আমি তো এসব ব্যবহার করি না। আমার বউ পিল খায়।" অশ্লীল কথা বলতে পারঙ্গম সাবের কামাল নারী সহকর্মীর সামনে এ রকম একটি সুযোগ হাতছাড়া করল না।

এডলিন কথাটা স্পষ্ট শুনতে পেলেও অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে যথারীতি। যেন দিন-দুনিয়ার কোনো বিষয় নিয়ে সে মাথা ঘামাচ্ছে না। তার চেয়ে অনেক জটিল আর জরুরি কাজ চোখের সামনে আছে।

নারী সহকর্মীর সামনে বেফাঁস কথা বলার জন্য সাবেরের দিকে ভৎর্সনার দৃষ্টিতে তাকাল বেগ।

"সরি, বস্।"

"নিজের কাজ করো," অন্য একটা এভিডেন্স ব্যাগের দিকে ইঙ্গিত করে বলল বেগ।

মুচকি হেসে মাথা নেড়ে সায় দিতে দিতে ভ্যানের ভেতর তার ছোট্ট ল্যাবে বসে পড়ল সে। তার কাছে যে আলামতটি আছে সেটা থেকে ডিএনএ টেস্ট করা যায় কি না খতিয়ে দেখবে এখন-আধখাওয়া সিগারেটের ফিল্টার। ওটাতে নির্ঘাত মুখের লালা লেগে আছে। তবে নিশ্চিত হবার জন্য একটা ছোটখাট কেমিক্যাল টেস্ট করতে হবে তাকে। একটু পর জায়েদ রেহমানের ফ্ল্যাটে গিয়ে ঘরের অন্যান্য বাসিন্দাদের কাছ থেকে ডিনএনএ স্যাম্পলও সংগ্রহ করতে হবে এলিমিনেশন প্রসেসের জন্য।

জেফরি বেগ এডলিনের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টিতে। সুন্দরি মেয়েরা কতোটা অবলীলায়ই না চারপাশকে অবজ্ঞা করে থাকতে পারে!

"এডলিন?" ভ্যানের ভেতর উঁকি মেরে বলল সে।

যেন এইমাত্র তাকে দেখতে পেয়েছে এ রকম একটা ভান করে এডলিন ডি কস্তা মুখে জোর করে হাসি এঁটে বলল, "গুডমর্নিং, স্যার।"

"গুডমর্নিং। কী করছেন?"

"কিছু না। সার্চ-ইঞ্জিনটা একটু ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম।"

এই মেয়েটা অভিনয়ে গেলে ভালো করবে, ভাবলো বেগ। প্রশ্নটা করার আগে আড়চোখে তাকিয়ে বেগ মনিটরটা দেখেছে। এই মেয়ে হরোস্কপিক সফটওয়্যারটি ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। এ রকম সফটওয়্যার মোবাইল এভিডেন্স ভ্যানে থাকা শক্তিশালী কম্পিউটারে ইনস্টল করা ছোটখাট বে-আইনী কাজের মধ্যে পড়ে। অবশ্য বিজ্ঞানের ছাত্রি হয়ে জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে মাতামাতি করাটা বে-আইনী কাজের মধ্যে পড়ে কি না ভাবলো জেফরি বেগ।

সিলভার রঙের কাগজের টুকরোর এভিডেন্স ব্যাগটা এডলিনের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। "এটা থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিতে হবে। কতোক্ষণ লাগবে?"

"এটা কী?" ব্যাগটা হাতে নিয়ে এডলিন জানতে চাইল।

বেগকে আর কষ্ট করে বিব্রতকর কথাটা বলতে হলো না। ঘাড় ঘুরিয়ে সাবের কামাল গুরুগম্ভীরভাবে বলল, "কনডমের প্যাকেট।"

"কী?" এডিলিনের মুখ ফসকে কথাটা বের হয়ে গেল।

"কনডম চেনেন না?!" সাবের কামাল এমনভাবে প্রশ্ন করল যেন কনডম প্রতিদিন ভাতের সাথে খাওয়া ডালজাতীয় জিনিস। এডলিনকে বিব্রত হতে দেখে সাবের কামাল আরো উৎসাহী হয়ে কিছু বলতে যাবে অমনি বাধা দিল জেফরি বেগ।

"সাবের!"

"সরি, বস্।" জিভ কেটে নিজের কাজে মন দিল সাবের। তার ঠোঁটে এখনও দুষ্টুমিভরা হাসি লেগে আছে।

নিজের বিব্রত হওয়া ভাবটা আবারো দক্ষ অভিনয়ের সাহায্যে সামলে নিতে পারল এডলিন। "স্যার, এটা থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না। কিন্তু ডাটা-ব্যাঙ্ক থেকে প্রিন্টটার ম্যাচিং বের করতে অনেক সময় লাগবে।"

এভিডেন্স ভ্যানে একটি অত্যাধুনিক স্ক্যানার রয়েছে যার সাহায্যে খুব দ্রুত যেকোনো বস্তুর উপর থেকে আঙুলের ছাপ নেয়া যায়। আগে এই কাজটি করতে অনেক সময় লাগতো।

"ঠিক আছে। আপনি আগে প্রিন্টটা নেয়ার চেষ্টা করুন। কাজ হলে আমাকে ফোন করবেন।"

"আপনার নাম্বারটা...?" একটু ইতস্তত করে বলল এডলিন।

"আমার নাম্বার আপনার কাছে নেই?"

"না, স্যার," দূর্বল কণ্ঠে বলল এডলিন।

কথাটা শুনে ভুরু কুঁচকালো বেগ। তার বিশ্বাস হচ্ছে না। ডিপার্টমেন্টের সবার কাছেই তার নাম্বার রয়েছে। এই মেয়েটা আসলে নার্ভাস হয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলছে।

আবারো সাবের কামাল ঢুকে পড়ল তাদের মধ্যে। "আমার কাছে আছে।"

"ঠিক আছে, তাহলে ওর কাছ থেকে নিয়ে..." কথাটা শেষ করল না। "...সাবের, তুমিই আমাকে ফোন দিও।"

মেজাজটা একটু খারাপ হয়ে গেল বেগের। আর কিছু না বলে সোজা চলে গেল ভিটা নুভার প্রধান দরজার সামনে।

মেইন গেট দিয়ে বের হবার সময় গেটের দায়িত্বে থাকা পুলিশ স্যালুট দিল তাকে। পুরো অ্যাপার্টমেন্টটা সিল করে দেয়া আছে দেখে খুশি হলো সে। আরো কিছুটা সময় এ রকম থাকবে। তারপর খুন না স্বাভাবিক মৃত্যু সেটা নিশ্চিত হবার পর এই অবস্থা তুলে নেয়া হবে।

রাস্তাটা পেরিয়ে ওপার থেকে পুরো ছয় তলা ভবনটি দেখে নিলো জেফরি বেগ। ইন্সপেক্টর এলাহী এখান থেকেই অজ্ঞাত এক তরুণকে সন্দেহজনকভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। ছেলেটাকে ধরতে পারলে অনেক কিছু জানা যেতো-কেন এতো রাতে এখানে এসেছিল, কারা কারা ছিল তার সাথে। ফুটপাতের বন্ধ চায়ের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে জেফরি বেগ ভিটা নুভার ছয় তলার জায়েদ রেহমানের ঘরের বেলকনি আর জানালার দিকে তাকাল। এখান থেকে লেখকের স্ত্রীর শোবার ঘরের জানালা আর বেলকনিটাও দেখা যায়। পাশাপাশি তাদের অবস্থান। ঐ ছেলেটা এখান থেকে কি দেখছিল?

মোবাইল এভিডেন্স ভ্যানে এইমাত্র যে আলামত দুটো দিয়ে এসেছে সেটা যদি ঠিকঠাক উদঘাটন করা যায় তো এই রহস্যটা মুহূর্তেই সমাধান করা যাবে।

একটা কিছু যেন তার সামনে এসে আচমকা উদয় হলো। জেফরি বেগ একটু চমকে ভিটা নুভার ছয় তলা থেকে চোখ সরিয়ে আনতেই দেখতে পেল তার ঠিক সামনে এইমাত্র একটা মোটরসাইকেল এসে থেমেছে।

ফ্রল্যান্স সাংবাদিক এবং লেখক দিলান মামুদ।

এ মুহূর্তে কোনো সাংবাদিককে দেখে খুশি হবার কথা নয় কিন্তু দিলান মামুদকে দেখে খুশি হলো বেগ। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটা দিন এই দিলান মামুদ পশ্চিমা বিশ্বের অসাধারণ ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের কাছে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছিল বিশাল একটি অপারেশন। ঘটনাক্রমে জেফরি বেগও জড়িয়ে পড়েছিল সেই অপারেশনে। সেই থেকে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সূচনা।

অনেক দিন পর দিলানকে দেখে খুশি হলেও মনের গহীনে একটা আশঙ্কাও উঁকি মারছে জেফরি বেগের : সাংবাদিকরা কি তবে জেনে গেছে?

"এতো সকালে আপনি এখানে?" বেগ বলল।

"দাঁড়ান দাঁড়ান। প্রশ্নটা আসলে আমার। আপনি এতো সকালে এখানে কি করছেন?" পাল্টা জানতে চাইল দিলান মামুদ।

জেফরি বেগ বুঝতে পারল না কী বলবে। দিলান মামুদের সাথে তার যে সম্পর্ক তাতে করে মিথ্যে বলাটা অনুচিত হবে। বোকার মতো কাজই হবে সেটা। আবার এই মুহূর্তে লেখক

জায়েদ রেহমানের মৃত্যুর খবর জানাতে চাচ্ছে না সে। সাংবাদিক আর মিডিয়ার লোকজন আরো এক-দেড় ঘণ্টা পর জানলেই সে খুশি হবে। নইলে এই তদন্ত কাজে ঝামেলা তৈরি হবে।

সম্ভবত দিলান মামুদ কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে। এটা তো লেখক জায়েদ রেহমানের অ্যাপার্টমেন্ট, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় দিল বেগ।

"তার কি কিছু হয়েছে?"

বেগ হেসে ফেলল। এখন আর না বলে উপায় নেই। "মাঝরাতে মারা গেছেন।"

দিলান মামুদ মোটেও অবাক হলো না। "মারা গেছে?" মোটর সাইকেলের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল সে। ভিটা নুভার দিকে তাকিয়ে জেফরির দিকে ফিরল। "তো, বিখ্যাত ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ এতো সকালে এখানে কি বিখ্যাত লেখকের জন্য শোক প্রকাশ করতে এসেছে? আমি জানতাম না আপনি তার বইয়ের একজন পাঠক!" মুখে মুচকি হাসি দিলানের।

"ব্রাদার, সেলিব্রেটি মানুষ। স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও একটু খতিয়ে দেখতে হয়।"

"আপনার কাছে কি মৃত্য বলেই মনে হচ্ছে, না কি..."

"আরেকটু নিশ্চিত হতে হবে," বেগ বলল।

হাতটা বাড়িয়ে দিল দিলান মামুদ। "ওকে, তদন্ত করতে থাকুন। আমি যাই। সারা রাত ঘুমাইনি। এখন খুব ক্লান্ত লাগছে।"

হাতটা ধরেই বেগ জানতে চাইল, "পার্টি ছিল না কি?"

"না। ডক্টর জেডের ওখানে ছিলাম। গতকাল তো পূর্ণিমা ছিল।"

ডক্টর জেড। জেড থিওরির প্রবক্তা এই রহস্যময় লোকটির সাথে এখনও বেগের সাক্ষাত হয়নি। দেশ-বিদেশের একটা নির্দিষ্ট মহলে তাকে নিয়ে এক ধরণের মিথ আর গালগল্প চালু রয়েছে। অনেকেই তাকে সবজান্তা বলে অভিহিত করে থাকে। আবার তাকে ভণ্ড আর শয়তান বলার লোকও কম নেই। বেগ অবশ্য বিশ্বাস করে না মানুষের পক্ষে সবজান্তা হওয়া সম্ভব। তবে লোকটি যে সাধারণ কেউ নয় সেটা মানতেই হবে। দিলান মামুদ হলো সেই রহস্যময় জ্ঞানী ডক্টর জেডের একনিষ্ঠ ভক্ত।

"দিলান, একটা অনুরোধ করবো।"

"বলতে হবে না। আমি জানি। এই খবরটা কাউকে বলবো না, তাই তো?" বলেই হেসে ফেলল সে।

"ঠিক।" বেগ অবাক হলো। এই দিলান মামুদও কি ডক্টর জেডের সাথে মিশতে মিশতে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী উঠছে না কি? "ধন্যবাদ।"

"ঐ লেখককে নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আপনি নিশ্চিন্তে কাজ করে যান। পরে কথা হবে।" বলেই মোটরসাইকেলটা ছুটে গেল ফাঁকা রাস্তা দিয়ে।

অপসৃয়মান মোটরসাইকেলটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জেফরি বেগ। এতোক্ষণ মাথার মধ্যে তদন্ত বিষয়ক যেসব জিনিস ঘুরপাক খাচ্ছিল সেটা ক্ষণিকের জন্য চাপা পড়ে গিয়েছিল। বাউন্ডুলের মতো জীবন যাপন করা দিলান মামুদকে দেখলে তার খুব ঈর্ষা হয়। জেফরি বেগ খুবই নিয়মের মধ্যে বেড়ে ওঠা মানুষ। এ রকম একটা অনিয়মের জীবনের জন্য মাঝেমধ্যেই সে লালায়িত হয়ে ওঠে।

মোবাইল ফোনের বিপ হলে পকেট থেকে সেটা বের করে হাতে তুলে নিলো।

এডলিন।

কলটা রিসিভ না করে কেটে দিয়ে দ্রুত রাস্তা পার হয়ে ভিটা মুভার পার্কিংলটে থাকা এভিডেন্স ভ্যানের সামনে চলে এল বেগ।

ভ্যানের পেছনের দরজা এখনও খোলা, এডলিন একাই বসে আছে। সাবের কামাল নেই। জেফরি জানে সাবের জায়েদ রেহমানের ফ্ল্যাটে গেছে নয়তো আশেপাশেই কোথাও সিগারেট ফুঁকছে। কাজের সময় এই লোক ঘন ঘন সিগারেট খায় কিন্তু এভিডেন্স ভ্যানে থাকা বহুমূল্যবান আর সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি থাকার কারণে এর ভেতরে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ।

বেগকে দেখেই এডলিন রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে বলল, "স্যার, দুটো প্যাকেটেই বুড়ো আঙুলের প্রিন্টটা বেশ ভালোমতোই পাওয়া গেছে। তবে একটাতে একটু বেশি ভালো অবস্থায় আছে। আমি সেটাই ডিজিটাইজ করেছি। নব্বই পার্সেন্টেরও বেশি রিকভার করা গেছে।"

খবরটা শুনে খুশি হলো বেগ। "গুড। এখন কি ডাটা-ব্যাঙ্কের সাথে ম্যাচ করে দেখা যাবে?"

"স্যার, সাড়ে আটকোটি ফাইল। সার্চ করতে অনেক সময় লাগবে। কমপক্ষে চার-পাঁচ ঘণ্টা," এডলিন বলল। "আমারা বরং হেড অফিসে গিয়ে?"

"অতো সময় লাগবে না," বলল বেগ। "ন্যারো-ডাউন করুন।"

"অপশনগুলো কি হবে?" এডলিন জানতে চাইল।

বেগ একটু সময় নিলো ভাবার জন্য।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডাটা-ব্যাঙ্ক হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের এমন একটি মূল্যবান সম্পদ যা কি না অনেকটা বিনা পয়সায় পাওয়া গেছে। কয়েক বছর আগে সারা দেশে ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরি করা হয় সম্পূর্ণ ডিজিটাল ফর্মেটে। সেই ডাটা-ব্যাঙ্কটি তৈরি করতে হাজার হাজার মানুষের লক্ষ-লক্ষ শ্রমঘণ্টা লেগেছে, ব্যয় হয়েছে কয়েক শ' কোটি টাকা। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ষাট ভাগই ভোটার। সে হিসেবে এই ডাটা-ব্যাঙ্কে দেশের ষাট শতাংশ লোকের সমস্ত তথ্য ছবিসহ ডিজিটাইজ করা আছে।

এটার সঠিক ব্যবহার এখনও হয়ে ওঠেনি। মাত্র পাঁচ মাস আগে এই ডাটা-ব্যাঙ্কটি তারা হাতে পায়। এটার সার্চ-ইঞ্জিন সফটওয়্যারটিও বিনা মূল্যে আমেরিকার এফবিআই'র কাছ থেকে সহযোগীতার নর্দশন হিসেবে পেয়েছে নতুন গঠন করা হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট। এখানেও ছিল জেফরি বেগের ভূমিকা। ভার্জিনিয়াতে এফবিআই'এর অধীনে ট্রেনিং নেবার কল্যাণে ওখানকার কিছু কর্তাব্যক্তির সাথে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। সেই সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে এ রকম একটি উন্নতমানের সফটওয়্যার উপহার হিসেবে পেয়েছে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট।

"মিস্ এডলিন," বেগ বলল।

"জি, স্যার?"

ভ্যানের ভেতর উঠে এসে এডলিনের পাশের টুলের উপর বসে পড়ল সে। লক্ষ্য করল মেয়েটি এখন আর নার্ভাস হচ্ছে না। তার মধ্যে দৃঢ় একটা ভাব চলে এসেছে। কিন্তু বেগ টের পেল তার নিজের ভেতরে অজ্ঞাত এক কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে।

"জেন্ডার-ওয়াইজ সার্চ করুন। শুধুমাত্র পুরুষ," বলল বেগ।

চোখেমুখে রহস্য মেখে জেফরির দিকে তাকিয়ে বলল সে, "শুধু পুরুষ!"

মাথা নেড়ে সায় দিল বেগ।

"ঠিক আছে।" মোনানিসার চেয়েও দুর্বোধ্য হাসি তার ঠোঁটে।

তার মানে আট কোটির জায়গায় ফাইলের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় সোয়া চার

কোটিতে। যেহেতু এ দেশের নারী-পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান সমান।

"বয়সের রেঞ্জ হবে...বিশ থেকে পঞ্চাশ।"

এডলিন কি-বোর্ডে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এবার ফাইলের সংখ্যা কমে এল পৌনে দুই কোটিতে।

"শুধুমাত্র ঢাকা সিটির মধ্যে থাকুন। এখানে ম্যাচিং না পেলে আমরা রেঞ্জ আরেকটু বাড়াবো।"

আবারো কি-বোর্ডে টাইপ করার শব্দ শোনা গেল। এখন ফাইলের সংখ্যা এক লাফে কমে গিয়ে দাঁড়াল প্রায় বিশ লাখে।

"স্যার, ফাইল অনেক কমে গেছে। এখন মনে হচ্ছে না বেশি সময় লাগবে," এডলিন প্রশংসার সুরে বলল।

মাথা নেড়ে সায় দিল বেগ। "উমমম...এক কাজ করুন। বয়সের রেঞ্জটা রি-অ্যারেঞ্জ করে বিশ থেকে পাঁচচল্লিশ করে দিন।"

খটাখট টাইপ করার শব্দ হলো আবারও সেই সঙ্গে কমে এল ফাইলের সংখ্যা।

"কততক্ষণ লাগতে পারে এখন?"

মিস্ এডলিন মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে সরাসরি বেগের দিকে তাকালে বেগ বুঝতে পারল তাদের মধ্যে মাত্র এক ফুটের ব্যবধান। সকাল সকাল ইমার্জেন্সি কল পেয়ে ছুটে এলেও তার সাজসজ্জা বেশ পরিপাটি। চুল থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ পাচ্ছে বেগ। শরীর থেকে হালকা যে পারফিউমের গন্ধটা ভেসে আসছে সেটা আরো বেশি মোহনীয়। রেবাও ঠিক এই পারফিউমটা ব্যবহার করতো। কতো দিন তার গন্ধ নেয়া হয় না!

বেগ বুঝতে পার, এতোক্ষণ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিল। একটু চমকে উঠে সামলে নিলো নিজেকে। এডলিনের ঠোঁটে সেই রহস্যময় হাসি। মেয়েরা কি না তাকিয়েও দেখতে পায়?

"আমাদের ডাটা-ব্যাঙ্কের ফাইলগুলো বর্ণানুক্রমে রয়েছে। আঙুলের ছাপটি যে লোকের তার নাম যদি প্রথম দিককার কোনো অক্ষর দিয়ে হয়ে থাকে তবে অনেক জলদি ম্যাচিং বের করা যাবে। সুতরাং যেকোনো সময় ম্যাচিং হতে পারে। তবে সবগুলো ফাইল ব্রাউজ হতে... ত্রিশ মিনিট লাগবে।" এডলিন এখন আর স্যার সম্বোধন করছে না।

বেগ বুঝতে পারল এই মেয়ের সংস্পর্শে এসে সে নিজেই এখন নাভাস বোধ করছে। তাড়াতাড়ি ভ্যান থেকে নেমে গেলে তার দিকে তাকাল এডলিন।

"ম্যাচিং হলে আমাকে ডাকবেন।"

"ঠিক আছে।" এবারও স্যার বলল না মেয়েটি।

ব্যাপারটা বেগও লক্ষ্য করেছে। তার নাভাস ভাবটা আরো বেড়ে গেল। ভ্যান থেকে কয়েক পা বাড়াতেই জামানের মুখোমুখি হলো সে।

"স্যার, পোস্টমর্টেমের জন্য লাশ কখন নিয়ে যাবো?"

"আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে।"

"আপনি কি আবারো দেখবেন?"

"না। তবে লাশ নিয়ে যাবার পর রেহমান সাহেবের ফ্ল্যাটে আবার যাবো। আরো কিছু জিনিস দেখতে হবে," বলল বেগ।

"তাহলে আমরা কি এখন এখানেই থাকব, না কি নাস্তা করে আসবো?"

"একটু ওয়েট করো। ডাটা-ব্যাঙ্ক সার্চ করা হচ্ছে। দেখি কি পাওয়া যায়।"

"অনেক সময় লাগবে তো।"

জেফরি বেগ মাথা নেড়ে বলল, "আশা করছি দশ-বিশ মিনিটের বেশি-"

কথাটা শেষ করতে পারল না সে, ভ্যানের ভেতর থেকে এডলিনের মিষ্টি কণ্ঠটা ডেকে উঠল। "স্যার! ম্যাচিং পাওয়া গেছে!"

এতোটা দ্রুত হবে আশা করেনি জেফরি বেগ। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল ভ্যানের ভেতর। তার পেছন পেছন জামান।

কম্পিউটারের পর্দায় একটা ফাইল ভেসে উঠেছে। ছবি আর বিস্তারিত তথ্য সহ একটি ডকুমেন্ট ফাইল। স্ক্যান করা আঙুলের ছাপের সাথে এই ডক-ফাইলের ব্যক্তির আঙুলের ছাপের প্রায় পঁচানব্বই পার্সেন্ট ম্যাচিং হয়েছে। অসাধারণ!

ছবিটা ত্রিশ-বত্রিশ বছরের এক সুদর্শন যুবকের। ছবির নিচে তার নাম, বাবা-মার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বারসহ যাবতীয় তথ্য রয়েছে। লোকটির নাম ইংরেজি 'এ' আদ্যক্ষরে হওয়াতে অসম্ভব দ্রুতগতিতে সার্চের ফল পাওয়া গেছে। জামান আর বেগ একে অন্যের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

"এডলিন। আমাকে এই পেজটার একটি কালার প্রিন্ট বের করে দিন," বেগ বলল প্রচণ্ড বিস্ময় আর উত্তেজনার সাথে।

.

"স্যার, এখন কী করবেন?" ভ্যান থেকে জামান আর বেগ বের হয়ে পার্কিংলটের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। তারা দু'জনেই কম্পিউটার প্রিন্টআউটটা ভালো করে দেখেছে কয়েক বার।

"ফোন করো," জামানের দিকে তাকিয়ে বলল বেগ।

নিজের মোবাইল ফোনটা বের করে প্রিন্টআউট থেকে নাম্বারটা নিয়ে কল করল জামান।

"রিং হচ্ছে, স্যার," জামানের চোখ দুটো চক চক করে উঠল।

ঠিক সেই সময়েই জেফরি বেগ ব্যাপারটা টের পেল। তার সমস্ত গা শিউরে উঠল যেন।

"স্যার, লাইন কেটে দিয়েছে!" হতাশ হয়ে বলল জামান। কানে ফোন চেপে রাখার কারণে ব্যাপারটা ধরতে পারেনি। কেবল দেখল জেফরি বেগ ডান দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে কী যেন বলছে।

অসম্ভব একটা ঘটনা ঘটে গেছে এখানে।

অধ্যায় ৮-১

ভিটা নুভার ফায়ারএস্কেপ সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে জেফরি বেগ আর জামান। এভিডেন্স ভ্যানটা পার্কিংলটের যেখানে পার্ক করা আছে তার ডানে মাত্র পাঁচ গজ দূরে সেটা অবস্থিত। ঘোরানো সিঁড়িটা নিচের পার্কিংলটে এসে থেমেছে। বাইরে থেকে কেবলমাত্র মেঝেতে নেমে আসা আটটি ধাপ দেখা যায়। সিঁড়ির বাকি অংশ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে চলে গেছে ছয়তলা পর্যন্ত।

জামান কিছু বলতে যাবে কিন্তু বেগ তাকে হাত তুলে থামিয়ে দিল। এইমাত্র ডাটা-ব্যাঙ্ক থেকে তারা যে লোকের ফাইলটা পেয়েছে সেই লোকের মোবাইল ফোনে কল করলে তিন বার রিং হতেই লাইন কেটে দেয়া হয়। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো ঠিক তখনই তিন তিনটি ফোন রিংয়ের শব্দ তারা খুব কাছ শুনতে পায়। বেগ একদম নিশ্চিত রিঙের শব্দটি এসেছে ফায়ারএস্কেপ সিঁড়ির ভেতর থেকে।

বেগ আরেকবার জামানকে ফোন করার জন্য ইশারা করলে সে কোনো কথা না বলে ডায়াল করল।

যা ভেবেছে তাই। রিং হবার স্পষ্ট শব্দ শোনা গেল ফায়ারস্কেপ সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের ভেতর থেকে।

একটা আক্ষেপে মুখটা বিকৃত হয়ে গেল জেফরি বেগের। তাড়াহুড়া করে চলে আসার কারণে সঙ্গে করে পিস্তলটা নিয়ে আসা হয়নি। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার এ রকম একটি ভুল করল সে। যদিও তার ট্রেনিংয়ে সব সময় সঙ্গে পিস্তল রাখার কথা বলা হয়েছে তারপরও এই ভুলটা করায় সে যারপরনাই বিরক্ত। ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি আজকের ঘটনায় পিস্তলের প্রয়োজন হবে।

কোনো কথা না বলে জামানকে ব্যাকআপে থাকার জন্য ইশারা করে এগিয়ে গেল সে। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে এবং গেটে পুলিশ আছে। সেই ভরসায় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জেফরি বেগ।

এভিডেন্স ভ্যানের ভেতর থেকে এডলিন ডি কস্তা পুরো ব্যাপারটা দেখে ভয়ে স্থির হয়ে আছে। এ রকম পরিস্থিতিতে সে কখনও পড়েনি। একেবারে ঘটনাস্থলে...?

বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে ফায়ারএস্কেপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়ল জেফরি বেগ।

ভেতরটায় কোনো বাতি নেই। আধো-আলো-অন্ধকার। উপরের দিকে ভালো করে তাকাতেই বুঝতে পারল কেউ একজন তার মাথার কিছুটা উপরে পেঁচানো সিঁড়ির একটি ধাপে বসে আছে। হাতে এখনও মোবাইল ফোনটা ধরা। জ্বল জ্বল করতে থাকা ডিসপ্লের আলোতে লোকটার চেহারা ভুতুরে দেখাচ্ছে। তবে লোকটা এখনও জেফরি বেগের উপস্থিতি টের পায়নি। সম্ভবত মোবাইল ফোনের রিংটোন বন্ধ করতে ব্যস্ত আছে।

“মি. আলম! একদম নড়বেন না!” বেশ দৃঢ়ভাবে বলল জেফরি বেগ।

অধ্যায় ৯

ঘটনা খুব দ্রুত পাল্টে গেছে। লেখক জায়েদ রেহমান মারা গেছেন না কি খুন হয়েছেন সে রহস্যের সমাধানই শুধু হয়নি, স্বয়ং হত্যাকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে। আর এসবই ঘটেছে বেশ দ্রুত গতিতে।

ব্যাপারটা নব-প্রতিষ্ঠিত হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের জন্য গৌরবের একটি মুহূর্ত। প্রচুর টাকা খরচ করে শ্বেতহস্তি কেনার মতো বিলাসিতা যে করা হয়নি সেটা বুঝিয়ে দেবার সময় এসেছে। আইন-শৃঙ্খলা তদারকি কাজে নিয়োজিত পার্লামেন্টারি কমিটি কয়েক দিন আগেও এই ডিপার্টমেন্টের কাজের ব্যাপারে উষ্ম প্রকাশ করেছিল। তারা না কি যথেষ্ট কাজ করছে না। এর প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ খবরটা শুনে বেশ ফুর্তির মেজাজে আছে। নিজের ডেস্কে বসে পেপারওয়েটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে যাচ্ছে মনের আনন্দে।

মাত্র দশ মিনিট আগে ঘটনাস্থল থেকে টেলিফোন করে তাকে জানানো হয়েছে খবরটা। টিভি চ্যানেল আর পত্রিকাগুলো এ রকম একটি খবর কিভাবে লুফে নেবে সেটা ভেবে বেশ মজা পাচ্ছে সে। আজকে কমপক্ষে চারটা টিভি চ্যানেলে তার ইন্টারভিউ যাবে। সে না চাইলেও এটা হবে। অবশ্য দুয়েকটা পত্রিকাও তার ইন্টারভিউ নিতে চাইবে, তবে ফারুক আহমেদ সেটা অধীনস্তদের উপর ছেড়ে দেবার কথা ভাবছে।

নিজের সেলফোনটা বেজে উঠলে পেপারওয়েটটা রেখে কলার আইডির দিকে চোখ যেতেই নড়েচড়ে উঠল মহাপরিচালক। হোমমিনিস্টার! অবাক হয়ে আপন মনে বলল ফারুক সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে রিসিভ করল কলটা।

“স্লামালাইকুম, স্যার,” নিজের চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বলল সে। “ধন্যবাদ স্যার...জি, স্যার...গ্রেফতার করা হয়েছে...না, ভদ্রমহিলাকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি...আমি অবশ্য এক্ষুণি বলতে যাচ্ছিলাম সেটা...হ্যাঁ, হা...তাতো নিশ্চয়..স্যার, নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন...জি, জি...এখনও জানানো হয়নি...ঠিক আছে, স্যার...স্লামালেকুম, স্যার...”

কলটা শেষ হতেই তার খুশির ভাব আরো বেড়ে গেল। স্বয়ং হোমমিনিস্টার তাকে ফোন করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বোঝাই যাচ্ছে মিনিস্টার সাহেব নিজেও এ ঘটনা জানতে পেরে খুশি।

সুখবরটা পাওয়া মাত্র নিজের এপিএস'কে হোমমিনিস্টারের দপ্তরে ফোন করে জানাতে বলেছিল ফারুক আহমেদ। এ রকম একজন সেলিবৃটির মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে প্রশাসনের সবাই তৎপর হয়ে ওঠে। বিশেষ করে হোমমিনিস্টার সেই সকাল থেকেই এ বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। কারণ লেখক জায়েদ রেহমানের দেশের বাড়ি তার নিজের জেলায়। স্থানীয় রাজনীতির ব্যাপার আছে এখানে। কিন্তু ফারুক আহমেদ অবাক হচ্ছে লেখকের যুবতী স্ত্রীকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়ায়। স্বয়ং হোমমিনিস্টার মহিলাকে গ্রেফতার করতে বলছেন!

মন্ত্রী নিজে না বললেও কিছুক্ষণ পর ফারুক আহমেদ নিজেও এটা বলে দিতো তার টিমকে। তারচেয়েও বড় কথা মহিলা এবং তার প্রেমিক প্রবরটিকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য খুব তাগাদা দিলেন মন্ত্রী মহোদয়। মিডিয়াকেও জানাতে বলে দিয়েছেন তিনি। ব্যাপারটা নিয়ে একটু খটকার সৃষ্টি হলেও ফারুক আহমেদ খুব একটা আমলে নিলো না। একটা নাম্বার ডায়াল করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষের একজনকে ফোন করবে এখন।

অধ্যায় ১০

ভিটা নুভার ফায়ারএস্কেপ সিঁড়ি থেকে আলম শফিক নামের এক উঠতি নাট্য নির্মাতাকে গ্রেফতার করার পরই লেখক জায়েদ রেহমানের সদ্য বিধবা স্ত্রী বর্ষাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আলম শফিকের আসল নাম ছিল শফিকুল আলম, কিন্তু অন্য অনেকের মতো মিডিয়াতে নিজের নাম উল্টেপাল্টে আলম শফিক করে নিয়েছে সে। যদি এ কাজটা না করতো তাহলে হয়তো এতো দ্রুত ধরা পড়তো না। কারণটা খুব সহজ, ইংরেজি বর্ণের প্রথম অক্ষর 'এ' দিয়ে তার নাম শুরু হওয়াতে ডাটা-ব্যাঙ্ক থেকে খুব দ্রুত খুঁজে বের করা গেছে।

আলম শফিকের গ্রেফতারের কথাটা অবশ্য মিসেস রেহমান জানে না। তাকে আসলে জানানো হয়নি। জেফরি বেগ ইচ্ছে করেই সেটা করেছে।

মহিলা মাথা নিচু করে দু'হাতে মুখ ঢেকে রেখে বসে আছে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের ইন্টেরোগেশন সেলে। ভিটা নুভা থেকে তাকে সরাসরি এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

ইন্টেরোগেশন সেলটি পঁচিশ বাই পঁচিশ ফিটের জানালাবিহীন বিশাল একটি ঘর। একটা মাত্র দরজা। সলিড লোহার। ঘরের দেয়াল আতঙ্কজনক রকমেরই ধবধবে সাদা টাইলসের। পশ্চিম দিকের দেয়ালে বিশাল একটি দ্বিমুখী আয়না রয়েছে। ঘরের ভেতরে থাকা লোকজনের কাছে এটা নিছক আয়না, তবে আয়নার ওপাশে থাকা ছোট্ট একটি কক্ষে যারা বসে থাকে তাদের কাছে এটি স্বচ্ছ কাঁচ ছাড়া আর কিছু নয়। ইন্টেরোগেশন সেলের ভেতরে কি ঘটছে না ঘটছে সবই দেখতে পায় তারা। এখান থেকে প্রত্যক্ষদর্শীরা সন্দেহভাজনদেরকে চিহ্নিতও করে থাকে। তবে সাধারণত জেরা করার কাজে বিশেষ পারদর্শী লোকজন এখান থেকে সন্দেহভাজনকে অবজার্ভ করে।

বিশাল ঘরের মাঝখানে একটা আয়তক্ষেত্রের কাঠের টেবিল আর চার পাঁচটা চেয়ার রয়েছে। টেবিলের উপর উজ্জ্বল পাওয়ারের একটা বাতি আর বিশেষ একটা চেয়ারের সামনে মাইক্রোফোন ছাড়া ঘরে তেমন কিছু নেই। সন্দেহভাজনকে যে চেয়ারে বসানো হয় সেটা আসলে পলিগ্রাফ টেস্টের চেয়ার। এই বিশেষ চেয়ারের সাথে লাগোয়া কতোগুলো ক্যাবল আর সেন্সর সন্দেহভাজনের শরীরের বিভিন্ন নার্ভ-পয়েন্টে লাগিয়ে দিলেই সত্য-মিথ্যার কারসাজি ধরা পড়তে শুরু করে।

মহিলা বলে ঘরে একজন মহিলা পুলিশ রাখা হয়েছে। হ্যাপি নামের এই তরুণী পুলিশ কনস্টেবল ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে বসে আছে চুপচাপ। জেফরি বেগ ছাড়া ঘরের চতুর্থ মানুষটি হলো জামান।

তারা দু'জন বসে আছে মহিলার ঠিক বিপরীতে। টেবিলের উপর কিছু নেই। মাথার উপর কেবল মৃদু আলোর একটি ঝুলন্ত ইলেক্ট্রিক বাল্ব জ্বলছে।

মিসেস রেহমান বুঝতে পারছে তাকে হত্যার সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে নিজের নিদোষিতা প্রমাণ করার জন্য কোনো প্রচেষ্টা করেনি সে। শুধু গ্রেফতার করে গাড়িতে নিয়ে আসার পাথে দৃঢ়ভাবে বলেছে, খুনটা সে করেননি।

লেখক জায়েদ রেহমানের খুনের ঘটনাটি জেফরির কাছে এখন পানির মতোই পরিস্কার বলে মনে হচ্ছে। এ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামানোর দরকার নেই। পুরো ঘটনাটিই ঐ একটা গ্রেফতারের মধ্য দিয়েই উন্মোচিত হয়ে গেছে। আসামীদের স্বীকারোক্তি খুবই দরকারি একটি জিনিস। আর সেটাই এখন আদায় করতে হবে।

"মিসেস রেহমান," বেগ বলতে শুরু করল, "আপনি কাল রাতে কখন বাড়ি ফিরেছিলেন?"

মহিলা মুখ তুলে তাকাল। "সাতটা-আটটা হবে।"

“কোথায় গিয়েছিলেন?”

“একটু কেনাকাটা করতে।” ডান হাতের একটা আঙুলের নখ বাম হাতে খুটতে খুটতে জবাব দিল মহিলা।

“কি কিনতে গিয়েছিলেন?”

মহিলা একটু সময় নিলো। “মেয়েলী জিনিস...”

জেফরি স্থির চোখে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। “আপনার তো গাড়ি আছে। নিজেই চালান?”

“মাঝেমধ্যে নিজেই চালাই। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে।”

“কাল কি আপনি নিজেই গাড়ি চালিয়েছিলেন?”

“হ্যাঁ।” ছোট্ট করে বলল সে। এবার বেগের চোখের দিকে তাকাল।

বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করে বেগ একদৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, “বাড়িতে কি একাই ফিরেছিলেন?”

মহিলা চমকালো না বলে বেগ একটু অবাকই হলো।

“হ্যাঁ।”

“তারপর কি করলেন?”

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল মিসেস রেহমান। “বুঝলাম না?”

“বলতে চাচ্ছি, এরপর কি করলেন? কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরলেন... বেশ। তারপর যা করলেন সব বলুন।”

“ও!” প্রশ্নটা বুঝতে পেরে মহিলা বলল, “বাচ্চাকে খাওয়া-দাওয়া করিয়ে নিজে ডিনার করলাম। তারপর বোধহয় একটু টিভি দেখেছিলাম...ওর ঘরে গিয়ে ওকে দেখে এসে নিজের ঘরে চলে আসি। এরপর ঘুমাতে চলে যাই।”

দারুণ! বেগ ভাবলো। “আপনার অ্যাপার্টমেন্টে বেশ কয়েক বার পুলিশ গিয়েছিল। আপনি কি সেটা টের পেয়েছিলেন?”

“ভোর রাতে ইন্টারকমে পুলিশ কল করলে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তারপর তো...”

“হ্যাঁ। কিন্তু তার আগেও আরেক বার পুলিশ গিয়েছিল।”

“আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম।”

“অবশ্যই। অতো রাতে তো ঘুমিয়ে থাকারই কথা,” কথাটা বলেই বেগ তার সহকর্মী জামানের দিকে তাকাল। জামান এতোক্ষণ ধরে কিছু না বললেও নিজের অভিব্যক্তি লুকাতে পারছে না। তোমাকে আরো অনেক শিখতে হবে, বেগ ভাবলো। তারপর মহিলার দিকে ফিরে বলল, “আপনি নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসার পর কেউ কি আপনার ফ্ল্যাটে এসেছিল?”

মহিলা নির্বিকারভাবে বলল, “না।”

“আপনি নিশ্চিত?”

“হ্যাঁ।”

আবারো মহিলার দৃঢ়তায় মুগ্ধ হলো বেগ। “তার মানে দাঁড়াল মি. জায়েদকে যে-ই খুন করে থাকুক সে তার ফ্ল্যাটেই ছিল সারা রাত।”

এই প্রথম মহিলা একটু ভড়কে গেল বলে মনে হলো বেগের কাছে। তবে কথাটার কোনো প্রতিবাদ করল না ভদ্রমহিলা।

“আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন, মিসেস রেহমান?”

বেগের এই প্রশ্নে মহিলা বিস্মিত হলো। সেটা লুকাতেও পারল না। “আমি নিজেই যেখানে

সন্দেহের মধ্যে আছি সেখানে অন্য কাউকে সন্দেহ করি কিভাবে!" একটা কাষ্ঠ হাসি দেখা গেল মহিলার ঠোঁটে। যেন তার সাথে নির্মম রসিকতা করা হচ্ছে।

"কেন, আপনার বাড়িতে যারা থাকে তাদের মধ্যে কি কেউ এ কাজ করতে পারে না? আমরা তো সবাইকেই সন্দেহ করছি।"

"সেটা আপনারা করতেই পারেন। তবে আমি কাউকে সন্দেহ করতে পারছি না। কোনোভাবেই হিসেব মেলাতে পারছি না, ওকে কেন খুন করা হবে!"

"মিসেস রেহমান," বেগ গম্ভীর কণ্ঠে বলল। "আপনার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে বলে আমরা সন্দেহ করছি। কেন করছি সেটা আপনিও ভালো করেই জানেন। সব কিছু বিবেচনা করে আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনাকে আরেকটু সহযোগীতা করতে হবে আমাদেরকে।"

"কি ধরণের সহযোগীতা করবো আমি? খুনটা আমি করেছি বললেই বোধহয় সেটা করা হবে। কিন্তু সেটা তো আমি করিনি! ওকে খুন করে আমার লাভ কি...একটা কথাই শুধু বলতে পারি, ও যদি খুন হয়ে থাকে সেটা আমার কাছেও দুর্বোধ্য। আমি এসবের কিছুই জানি না।"

"মিসেস রেহমান," বেগের ঠোঁটে মুচকি হাসি। "আমি বুঝতে পারছি, খুনটা যদি আপনি না-ই করে থাকেন তাহলে এতোক্ষণ ধরে আমাদের কাছে মিথ্যে বলে যাচ্ছেন কেন?"

মহিলা নিজের চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। তার চোখেমুখে প্রচণ্ড ক্রোধ। এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বেগের দিকে। বেগও মহিলার দিকে নিষ্পলক চেয়ে রইল।

কয়েক সেকেন্ড ধরে পালাক্রমে তাদের দুজনের দিকে তাকাল জামান। বিশাল একটি নাটকীয় মুহূর্তের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে সে।

বেগ পরিস্থিতি শান্ত করার উদ্যোগ নিলো। দুহাত তুলে মহিলাকে প্রশমিত করার ইশারা করে বলল, "আপনি উত্তেজিত হবেন না। আপনাকে এখনও আমরা খুনি হিসেবে সন্দেহ করছি না।"

"তাহলে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন কেন?" কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে মিসেস রেহমান বলল।

"আমার কথা শেষ করতে দিন।" একটু সময় নিয়ে আবারো বলতে শুরু করল জেফরি বেগ। "আপনি হয়তো জানেন না এরইমধ্যে আমরা একজন সম্ভাব্য খুনিকে ধরে ফেলেছি..."

মহিলা শুধু বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে অনেকটা অনিচ্ছায় প্রশ্ন করল : "কে সে?"

"আপনি তাকে চেনেন।"

মহিলার মধ্যে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

"আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস খুনটা সে-ই করেছে। তবে এখনও তদন্তের প্রাথমিক অবস্থায় আছি আমরা। আরেকটু খতিয়ে দেখতে হবে।"

"আপনার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন কি জন্যে? আমার স্বামী খুন হয়েছে। তার লাশ পড়ে আছে পোস্টমর্টেম টেবিলে। আমার মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারছেন?"

"সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি না আপনি কেন আমাদের কাছে মিথ্যে বলছেন?"

মহিলা আর নিজের রাগ সামলাতে পারল না। চিৎকার করে বলল, "আমি কোনো মিথ্যে কথা বলিনি। আপনি আমার কাজের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।"

"মিসেস রেহমান, আমি আপনাকে সত্যি বলার জন্য চাপচাপি করবো না। কিন্তু মনে রাখবেন, মিথ্যে বললে আপনি ফেঁসে যাবেন।"

"আমি আবারো বলছি, আমি আপনাকে যা বলেছি তার মধ্যে কোনো মিথ্যে নেই।"

"আপনি যদি মিথ্যে না বলে থাকেন তাহলে আমরা যাকে অ্যারেস্ট করেছি সে মিথ্যে বলেছে।"

"কার কথা বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না?" মহিলাকে এখন অসহায়ের মতো লাগছে। তার মধ্যে আগের সেই দৃঢ় ভাবটা আর নেই।

"যার সাথে কাল রাতটা কাটিয়েছেন আপনি!" কথাটা বলেই জেফরি বেগ উঠে দাঁড়াল।

.

"স্যার, বিশ্বাস করুন আমি খুন করিনি। আমি কিছুই জানি না।"

ধরা পড়ার পর সব অপরাধী যেমনটি বলে লেখক জায়েদ রেহমানের অ্যাপার্টমেন্টের ফায়ারএস্কেপ সিঁড়ি থেকে গ্রেফতার হওয়া আলম শফিকও বার বার সে কথা বলে গেছে।

সবার আগে তাকেই নিয়ে আসা হয়েছিল হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের হেডকোয়ার্টারে অবস্থিত অত্যাধুনিক ইন্টেরোগেশন সেলে। লেখকের তরুণী স্ত্রী বর্ষাকে গ্রেফতার করা হলেও তাকে অন্য একটি রুমে রাখা হয়। জেফরি বেগ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাকে পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। মহিলা অবশ্য জানতো না আলম শফিক গ্রেফতার হয়েছে।

ভিটা মুভার ফায়ারএস্কেপ সিঁড়ি থেকে আলম শফিককে গ্রেফতার করা হয়েছে একেবারেই নিঝটভাবে। কোনো রকম হৈহল্লা হয়নি। অ্যাপার্টমেন্টের কেউ বুঝতেই পারেনি তাদের বিল্ডিং থেকে একজন সম্ভাব্য খুনিকে ধরা হয়েছে। জেফরি বেগ সম্পূর্ণ খালি হাতে আলম শফিককে গ্রেফতার করতে পেরেছে তার কারণ এই যুবক নিজে থেকেই অনেকটা আত্মসমর্পনের ভঙ্গিতে ধরা দিয়েছে। দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেনি সে। বেগ জানে এটা অস্বাভাবিক নয়। অনেক সময়ই খুনি খুন করার পর নাভাস ব্রেকডাউনে ভুগে থাকে। কোনো রকম প্রতিরোধ ছাড়াই আত্মসমর্পন করে।

সনাতন-পদ্ধতিতে সন্দেহভাজন অপরাধীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, জেফরি বেগ অবশ্য সেসব করে না। এফবিআই'র আদলে গড়ে ওঠা এই ডিপার্টমেন্টে অত্যাধুনিক পলিগ্রাফ মেশিন রয়েছে, যা দিয়ে সন্দেহভাজনের কথা সত্য না কি মিথ্যে সেটা জানা যায়। অবশ্য এই পলিগ্রাফের ফলাফল আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তবে তদন্তকাজে এটা বেশ সাহায্য করে। জেফরি বেগ এই যন্ত্রটি খুব ভালোবাসে। অমানুষিক নির্যাতন করার বদলে এটা অনেক সভ্য আর মানবিক। তার মানে এই নয় যে, হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে কোনো রকম নির্যাতন করা হয় না। এখনও আগের মতো, অনেকক্ষেত্রে তারচেয়েও বেশি নির্মম পদ্ধতি প্রয়োগ করে জিজ্ঞাসাবাদ করার ব্যবস্থা আছে এখানে। অনেক সময় জেনেভা কনভেনশনে নিষিদ্ধ ঘোষিত ড্রাগ প্রয়োগেও সন্দেহভাজনের কাছ থেকে তথ্য আদায় করা হয়। ব্যাপারটা নির্ভর করে ঘটনার গুরুত্ব আর সন্দেহভাজনের সামাজিক অবস্থানের উপর। লেখক জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সে রকম কিছু ব্যবহার করার দরকার পড়বে না বলেই মনে করে জেফরি বেগ। আলম শফিক নামের যুবকটিকে কিছুক্ষণ জেরা করলেই পুরো ঘটনা বেরিয়ে আসবে।

আলম শফিককে ঠিক সেই চেয়ারে বসানো হয়েছিল। তার শরীরে যথারীতি লাগানো হয়েছিল ক্যাবলগুলো। তার সামনে জেফরি বেগ আর তার পাশের চেয়ারে বসেছিল জামান। ঘরে আর কেউ ছিল না।

জেফরি বেগ ধীরস্থিরভাবে জেরা করতে শুরু করে।

“আপনাকে আমরা কেবল হত্যাকারী হিসেবে সন্দেহ করছি। এর বেশি কিছু না,” জেফরি বেগের কণ্ঠ বেশ বন্ধুভাবাপন্ন।

আলম শফিক নামের যুবকটি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। কথাটা শুনে কিছুটা বিস্মিত হয় সে।

“এখন আপনার দায়িত্ব এই সন্দেহ থেকে নিজেকে বের করে আনা,” বেগ বলেছিল তাকে।

“স্যার, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি খুন করিনি,” বার বার এই একটি কথাই বলে গেছে সে।

“খুনের কথা বাদ দিন। আমাকে বলুন, আপনার সাথে মিসেস জায়েদ রেহমানের সম্পর্কটা কি?”

“স্যার, আমি সব বলবো, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি খুন করিনি।” আবারো নাছোরবান্দার মতো একই কথা বলল সে।

“মি. আলম শফিক,” কথাটা বলে বেগ জামানের দিকে তাকাতেই জামান ডান হাতের তিন আঙুল উঁচিয়ে হাই ফাইভ করে। “পরিস্থিতি জটিল করলে আপনার কোনো লাভ হবে না। সব বলুন। আস্তে আস্তে বলুন।”

মাথা নিচু করে রাখে আলম শফিক। বেগ তাকে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য কিছুটা সময় দেয়। তার মধ্যে তাড়াহুড়ার কোনো লক্ষণ নেই। “সব খুলে না বললে সবাই আপনাকেই হত্যার জন্য অভিযুক্ত করবে। আর এজন্যে কাউকে দোষ দিতে পারবেন না আপনি।”

ঘরের একমাত্র দরজাটা খুলে গেলে হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে এক লোক ঢোকে। কোনো কথা না বলে সে তিন কাপ চা আর এক প্যাকেট সিগারেট রেখে যায় টেবিলের উপর। আলম শফিক চা আর সিগারেটের প্যাকেটের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বেগের দিকে তাকায়।

“চা নিন। একটা সিগারেটও ধরান। এ ঘরে ধূমপান করা যায়।”

বেগের কথা শুনে আলম শফিক আরো বিস্মিত হয়।

বেগ একটা কাপ তুলে নিয়ে চায়ে চুমুক দেয়। আজ সকালে এটাই তার প্রথম কোনো খাবার মুখে দেয়া, অবশ্য চা'কে যদি খাবার হিসেবে গন্য করা হয় তো। জামান চায়ের তেষ্টায় ছটফট করছিল। হাতে কাপটা নিয়েই অস্থিরভাবে কয়েক চুমুক চা খেয়ে নেয় সে।

জেফরি বেগ ভুরু উঁচিয়ে আলম শফিককে চায়ের কাপ নিতে ইশারা করে আবার।

চায়ের কাপে আস্তে আস্তে চুমুক দেয় শফিক।

“সিগারেট ধরাতে পারেন,” বেগ বললে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে আলম শফিক। “আপনি যে ব্র্যান্ডের খান সেটাই আনা হয়েছে।”

চা আর সিগারেট খাওয়া শেষ করে সুবোধ বালকের মতো আলম শফিক গীত গাইতে শুরু করে। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে সন্দেহভাজনের মুখ দিয়ে কথা বের হলে তারা সেটাকে ‘গীত’ বলেই সম্বোধন করে।

প্রথমেই সে স্বীকার করে তার সাথে মিসেস রেহমানের প্রণয়ের কথা। কতো দিন ধরে চলছে, কিভাবে শুরু, সব। তারপর জানাল ইদানিং তারা মাঝেমধ্যেই ভিটা নুভা অ্যাপার্টমেন্টে অভিসারে লিপ্ত হয়। গতকাল রাতেও সেরকম এক অভিসারে গিয়েছিল।

রাত আটটার দিকে মিসেস রেহমান নিজে গাড়ি চালিয়ে বাইরে গিয়ে আলম শফিককে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে ভিটা নুভায় ফিরে আসে। অবশ্য তার এই আগমন প্রধান গেটের কাছে থাকা দারোয়ানের কাছে অজ্ঞাত ছিল। কেননা মহিলা গাড়ির পেছনের সিটে লুকিয়ে

রেখে শফিককে নিয়ে ভিটা নুভায় ফিরে এলেও তাকে সঙ্গে নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করেনি। মিসেস রেহমান চলে যাবার অনেকক্ষণ পর শফিক গাড়ি থেকে বের হয়ে সবার অগোচরে পাকিং এরিয়া থেকে লিফটে করে উপরে চলে আসে। অ্যাপার্টমেন্টের একটা অব্যবহৃত দরজা ভেতর থেকে খুলে রেখেছিল মিসেস রেহমান। ঐ দরজাটা শফিকের প্রেমিকা বর্ষার শোবার ঘর। ফলে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর থাকা হাউজনার্স আর গৃহপরিচারিকাদের কেউই ব্যাপারটা টের পায়নি।

নিজেদের উদ্দাম রাতের কথা সংক্ষেপে বললেও জেফরি বেগ এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করেনি। কনডমের ছেঁড়া প্যাকেটই সব বলে দেয় ওখানে কি ঘটেছিল।

শফিক বার বার জোর দিয়ে বলেছে লেখক জায়েদ রেহমানের ঘরে সে ঢোকেনি। ওখানে কি হয়েছে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। তবে শেষ রাতের দিকে ভিটা নুভার সামনে পুলিশের আনাগোনা আর তাদের বেলকনিতে টর্চের আলো ফেলা ঘটনায় তারা দু'জন বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। এরপর ভোর রাতের দিকে ইন্টারকমে পুলিশের আগমনের কথা শুনে তারা রীতিমতো ভড়কে যায়। লেখকের তরুণী স্ত্রী বর্ষা ইন্টারকমের জবাব দেবার সময়ই হাউজনার্স প্রতিদিনকার মতো ভোরে ঘুম থেকে উঠে লেখকের মলমূত্রের প্যানটা পরিস্কার করার জন্যে ঘরে ঢুকেই দেখতে পায় লেখকের মুখে বালিশ চাপা দেয়া। দৃশ্যটা দেখে মহিলা ভড়কে গিয়ে চিৎকার করে উঠলে মিসেস রেহমানের ইন্টারকমের অপর প্রান্তে থাকা পুলিশ ইন্সপেক্টর সেটা শুনে ছুটে আসে তাদের ফ্ল্যাটে।

চিৎকার শুনে বর্ষা ছুটে যায় লেখকের ঘরে। পুরো ঘটনা দেখে একদম ভড়কে যায় সে। তবে পরক্ষণেই বুঝতে পারে তাদের ফ্ল্যাটে পুলিশ আসছে। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত বুদ্ধি খাঁটিয়ে নিজের প্রেমিককে ফায়ারএস্কেপ সিঁড়িতে লুকিয়ে থাকতে বলে মহিলা। শফিক দরজা খুলে ফায়ারএস্কেপ সিঁড়িতে ঢুকতেই হুরমুর করে লিফট থেকে বের হয়ে আসে ইন্সপেক্টর এলাহী নেওয়াজ। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য শফিক পুলিশের হাত থেকে বেঁচে যায় কিন্তু মেইন গেটে পুলিশ থাকার কারণে ফায়ারএস্কেপ সিঁড়ি থেকে আর বের হতে পারেনি। অনেকটা ফাঁদে আটকা পড়ে যায়, অবশেষে ওখানে দীর্ঘক্ষণ লুকিয়ে থাকার পর জেফরি বেগের হাতে ধরা পড়ে শফিক।

"বিশ্বাস করুন, আমি খুন করিনি," কাতর কণ্ঠে আবারো নিজের নির্দোষিতা ঘোষনা করে আলম শফিক।

জেফরি বেগ একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শফিকের দিকে। অনেকক্ষণ পর সে মুখ খোলে। "দেখুন আমরা অনেকটা নিশ্চিত, লেখক জায়েদ রেহমানকে খুন করা হয়েছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেলে সেটা অবশ্য কনফার্ম জানা যাবে। আপনার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে তাকে হত্যা করল কে?" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবারো বলে সে, "শয্যাশায়ী এক লোক এমন এক দিনে খুন হলেন যেদিন তার স্ত্রী নিজের প্রেমিককে নিয়ে পাশের ঘরে গোপন অভিসারে লিপ্ত। এক শ'জন লোককে এ ঘটনার কথা বললে তারা বলবে আপনি এবং আপনার প্রেমিকা মিলে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন।"

"কিন্তু—"

হাত তুলে বাধা দেয় জেফরি বেগ। বার বার ঐ এক কথা বলার কোনো দরকার নেই, মি. শফিক। আপনি যদি আমাদের কাছে সব স্বীকার না করেন তাহলে বেশ সমস্যায় পড়ে যাবেন। আপনাকে একটু সময় দেবো, এই সময়টাতে সিদ্ধান্ত নিন সব কিছু স্বীকার করবেন কি না। মিসেস রেহমানকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আবার আপনার সাথে কথা বলবো।"

শফিক ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে কেবল। বর্ষাকে যে গ্রেফতার করা হবে তাতে

অবাক হয়নি সে। তারপরও কথাটা শুনে সে বিমূঢ় হয়ে যায়। নিজের নির্দোষিতার কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় তার মুখে আর কোনো রা নেই। বুঝে যায় মারাত্মক এক বিপদে পড়ে গেছে। ভয়ঙ্কর বিপদ।

অধ্যায় ১১

খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যেস নেই আবেদ আলীর তারপরও আজ অনেক সকালেই উঠে পড়েছে। প্রথম কারণ ঘুম ভেঙে গেছে; তবে ইচ্ছে করলে আবার ঘুম দিতে পারতো, সেটা আর করেনি। ইচ্ছে করেই করেনি।

পঞ্চান্ন বছর বয়সে নতুন এক নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে। এতো তীব্র নেশা এই জীবনে কখনই আসক্ত হয়নি।

পঁচিশ বছর ধরে প্রকাশনা ব্যবসা নিয়ে আছে, বেশ নামও করেছে। দেশের অন্যতম বড় প্রকাশনী সংস্থা অবয়ব-এর সত্ত্বাধিকারী। তিন বছর ধরে বিপত্নীক। এক ছেলে, আজ তিন বছর ধরেই অস্ট্রেলিয়ায় সেটেল্ড। মায়ের মৃত্যুর পর পরই সে চলে যায় সেখানে। প্রথম বার দেশে এসে ঈদ করে গেছে, তারপর থেকে আর আসেনি। ওখানেই এক বাঙালী মহিলাকে বিয়ে করেছে।

লেখক-সাহিত্যিকদের সঙ্গে ওঠাবসা করেই আবেদ আলীর সময় কেটে যায় এখন। ব্যবসায় আর আগের মতো সময় দেয় না। পুরনো ব্যবসা, কর্মচারীরাই সব করে থাকে। তাছাড়া ইদানীং তার ব্যবসা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। দিনে দুয়েক ঘণ্টার জন্য গেলেও চলে, না গেলেও ক্ষতি নেই। ফোনে কাজ সেরে নেয়। অখণ্ড অবসর। সেই অবসর ঘোচাতেই এক জুনিয়র লেখক-বন্ধুর প্ররোচনায় ফেসবুক নামের আজব জিনিসের গাড্ডায় পড়েছে সে। সেই সুবাদে ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি। এখন সেটা রীতিমতো আসক্তির পর্যায়ে চলে গেছে। সারাটা দিন এখন কেটে যায় কম্পিউটারের সামনে বসে থেকে।

আজ থেকে আট মাসে আগে ফেসবুকে মিলি নামের আমেরিকা প্রবাসী এক মাঝবয়সি মহিলার সাথে তার পরিচয়। সেই পরিচয় এখন অনেক গভীরে চলে গেছে। অবশ্য ব্যাপারটা কেউ জানে না, জানার মতো খুব বেশি লোক তার কাছে থাকেও না। কাজের লোক ছাড়া এখন একেবারেই একা বসবাস করে সে।

ইদানিং সকালে ঘুম থেকে উঠেই ফেসবুকে যাওয়াটা তার অভ্যেস হয়ে গেছে। মিলি থাকে আমেরিকার সিয়াটল শহরে। স্বামী আছে কিন্তু সম্পর্ক তেমন একটা ভালো না। এক মেয়ে ছিল, বিয়ে হয়ে গেছে। থাকে কানাডায়। ভালো একটা চাকরি করে মিলি। খুবই স্বাধীনচেতা। নিয়মিত বই পড়ে। সেই সুবাদে লেখকদের সাথে তার অনেক জানাশোনা। আবেদ আলীর সেই লেখক-বন্ধুর সুবাদেই মিলি প্রথম তাকে ফেসবুক থেকে ইনভাইটেশন পাঠায়। সেই থেকে তাদের পরিচয়।

মিলির কাছ থেকে গরম কিছু পাবার আশায় বিছানা ছেড়ে সোজা পিসির সামনে গিয়ে বসল আবেদ আলী। কম্পিউটারটা চালু অবস্থায়ই ছিল, গতকাল রাত দুটো পর্যন্ত চ্যাট করেছে তারা। মিলি বলেছিল আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই গরম একটা চিঠি পাবে সে। সেই চিঠি পাবার উত্তেজনায় বাকি রাতটা ঠিকমতো ঘুমও হয়নি আবেদ আলীর।

ফেসবুকে চ্যাট করা ছাড়াও মিলি তার জন্য প্রতিদিন ইয়াহু মেইলে বাঙলা চিঠি লেখে। ইন্টারনেটে কিভাবে বাঙলা চিঠি লিখতে হয় সেটা মিলির কাছ থেকে সে নিজেও শিখে নিয়েছে। প্রতিদিন একটা করে গরম চিঠি লেখে মিলি তার জন্য। সেই চিঠির ভাষা এমনই যে কাউকে সেটা বলা যায় না। তার যে বয়স তাতে করে এসব শুনলে লোকজন ভাববে সবই বিকৃত মানসিকতার লক্ষণ।

এ রকম একটি গরম চিঠির আশায় ইয়াহু মেইলটা ওপেন করে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারে সোজা হয়ে বসল সে। যথারীতি মিলি তাকে গরম একটি মেইল পাঠিয়েছে কিন্তু সেটা দেখে নয়, তার বিস্ময় অন্য একটা মেইল দেখে।

মিলির মেইলটার ঠিক নিচে আরেকটা মেইল দেখে রীতিমতো ভিমড়ি খেলো সে। চোখ দুটো কচলে নিয়ে ভালো করে দেখল আবার। না, ঠিকই আছে। শুধু মেইলই নেই, সাথে বিশাল সাইজের একটি অ্যাটাচমেন্ট ফাইলও রয়েছে। দারুণ অবাক হলো আবেদ আলী। এমন এক লোকের কাছ থেকে মেইলটা এসেছে যা সে কখনও চিন্তাও করেনি। মেইলটা পাঠানো হয়েছে গতকাল রাতে। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে রাত আড়াইটার পর পরই। এটাও একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। ভুতের কাছ থেকে মেইল পেলেও এতোটা অবাক হোতো না সে।

মিলির মেইলের কথা ভুলে গতরাতে পাঠানো সেই মেইলটা খুলল প্রকাশক সাহেব। এক ধরণের উত্তেজনা টের পাচ্ছে ভেতরে। মেইলটা যে লোক পাঠিয়েছে তার নাম দেখে যতোটা অবাক আর বিস্মিত হয়েছিল তারচেয়ে অনেক বেশি বিস্মিত হলো মেইলটা পড়ে।

প্রতিটি শব্দ তার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। না। স্বপ্ন নয়, বানোয়াট। কেউ কি তার সাথে রসিকতা করছে? এ রকম একটা আশঙ্কাও তার মনে উঁকি দিল কয়েক মুহূর্তের জন্য তবে সেটা বাতিল করে দিল সেন্ডারের মেইল অ্যাকাউন্টটা দেখে।

বেঈমানটা কোন মতলবে এটা করেছে কে জানে!

এক ধরণের কাঁপুনি টের পেল নিজের ভেতরে। মেইলের কথাগুলো তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

আর হয়তো তোমার সাথে দেখা হবে না!

মানে কি? কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট ফাইলটা যখন ডাউনলোড করে ওপেন করল চেয়ার থেকে উঠে দু'হাত ঘষতে লাগল আনমনে। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

এসব কি হচ্ছে!

আপনি যদি সকালে উঠে দেখেন কেউ আপনার ঘরে কোটি টাকা রেখে গেছে তাহলে বিস্মিত না হলে তো আপনাকে ডাক্তারই দেখাতে হবে। বুঝতে হবে আপনি স্বাভাবিক নন।

কিন্তু আবেদ আলী বেশ স্বাভাবিক একজন লোক। আর সেজন্যেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সে, সেই সাথে লটারি পাওয়া কোনো ব্যক্তির

মতো আনন্দে অস্থির আর চঞ্চল।

অধ্যায় ১২

হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের ইন্টেরোগেশন সেলে জমজমাট নাটক চলছে। ডিপার্টমেন্টের প্রায় সবাই নিজের কাজ ফেলে সেই নাটক দেখার জন্য উসখুশ করলেও পাঁচ জন ব্যক্তি ছাড়া কারো পক্ষে সেই নাটক স্বচক্ষে দেখা সম্ভব হচ্ছে না।

মেইন ইন্টেরোগেশন রুমে আছে ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ আর ইন্সপেক্টর জামান, তবে একমুখী আয়নার ওপাশে ছোট্ট কক্ষে আরো তিনজন ব্যক্তি রয়েছে : পলিগ্রাফ টেস্ট অপারেটর মুরাদ, অবজাভার হিসেবে সিনিয়র ইনভেস্টিগেটর রমিজ লস্কর আর ডিপার্টমেন্ট প্রধান ফারুক আহমেদ।

ফারুক সাহেব অবশ্য কৌতূহলবশত এসেছে। লেখক জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ড নিয়ে সে খুব আগ্রহী। ট্যাবলয়েড পত্রিকায় ছাপা হতে যাওয়া রসালো খবরটা আগেভাগে দেখে নেয়ার দুর্লভ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাচ্ছে না। তার এই উপস্থিতির কারণেই ডিপার্টমেন্টের বাকিরা নিজেদেরকে সংযত রাখতে বাধ্য হয়েছে, নইলে এই ছোট্ট কক্ষে সবাই হুমরি খেয়ে পড়তো।

এইমাত্র দিয়ে যাওয়া গরম গরম চায়ে চুমুক দিল ফারুক সাহেব। তবে তার চোখ সামনের বিশাল আকারের আয়নাটার দিকেই নিবদ্ধ। যেন সিনেমা হলে বসে কোনো ছবির টান টান উত্তেজনার দৃশ্য দেখছে।

.

জেফরি বেগ ঘড়ির দিকে তাকাল। দশটা বাজে। সকালের নাস্তা যে খাওয়া হয়নি সেটা ভুলেই গেছিল। এখন পর্যন্ত দু'গ্লাস পানি আর এক কাপ চা তার পেটে পড়েছে।

তার সামনে বসে আছে মিসেস রেহমান আর তার প্রেমিক আলম শফিক। দু'জনেই মাথা নিচু করে রেখেছে। তবে দু'হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে ভদ্রমহিলা।

জেফরির পাশে বসে আছে জামান। নিজের বসের উপস্থিতিতে খুব একটা কথা বলে না সে।

মাত্র বিশ মিনিট আগে মিসেস রেহমানের সামনে আলম শফিককে হাজির করা হয়েছে। তারা দুজনেই নিজেদের আসন্ন ভবিষ্যতের কথা ভেবে একেবারে মুষড়ে পড়েছে এখন। কেউ কাউকে না চেনার ভান করেনি, সব কিছু মেনে নিয়েছে, শুধু একটা বিষয় বাদে : জায়েদ রেহমানকে তারা কেউ খুন করেনি।

জেফরির কাছে অবশ্য এটা নতুন কিছু নয়। খুনিরা এতো সহজে খুনের কথা স্বীকার করে না। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয় তবে এটাই হলো সাধারণ চিত্র।

মিসেস রেহমানকে প্রশ্ন করার আগে ঘরের বিশাল আয়নাটার দিকে আড়চোখে তাকাল বেগ। সে জানে ওপাশে বসে আছে তার বস ফারুক সাহেব।

"তাহলে আপনাদের এই সম্পর্কটা অনেক দিন থেকেই চলছে?" ভিটা নুভায় লুকিয়ে লুকিয়ে অভিসারের কথা ইঙ্গিত করল জেফরি।

তারা দুজনে কিছু বলল না।

"আপনাদের পরিচয় কতো দিনের?"

শফিকই জবাব দিল। "দু'বছর।"

"জায়েদ সাহেব কতো দিন ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন?"

আলম শফিক তার পাশে বসা বর্ষার দিকে তাকালেও মহিলা মাথা নিচু করেই জবাব দিলেন, "আট মাস ধরে।"

"আপনাদের এই সম্পর্কের কথা আর কে জানে? মানে, আপনাদের দু'জনের ঘনিষ্ঠ

লোকজনের কথা বলছি।”

মহিলা মাথা নাড়ল।

“কেউ না!” জেফরি অবাক হয়ে বলল। শফিকের দিকে তাকাল সে।

সেও মাথা নেড়ে একই জবাব দিল।

“ভালো। মিসেস রেহমান, আপনার কি মনে হয়, যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তখন শফিক সাহেব জায়দে রেহমানের ঘরে গিয়ে থাকতে পারে? তার ঘরটা তো আপনার ঘরের ঠিক পাশেই। এমনও তো হতে পারে আপনি যখন ঘুমিয়ে পড়লেন তখন...?”

আলম শফিকের চোখেমুখে ঘাবড়ে যাবার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মিসেস রেহমান এমনভাবে মুখ তুলে তাকালেন যেন কথাটা তার মাথায় না এলেও এখন এটাকে একটা সম্ভাবনা হিসেবে দেখছে।

“গুড!” আয়নার ওপাশে বসে থাকা ফারুক সাহেব তার পাশে বসে থাকা দু’জন অধস্তন কর্মচারীর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বলল। “ডিভাইড অ্যান্ড...” কোটেশনটা ভুলে গেল, আর বলতে পারল না। বুঝতে পারল অন্য একটা বিখ্যাত কোটেশনের সাথে গুলিয়ে ফেলেছে।

“মিসেস রেহমান?” তাড়া দিল জেফরি বেগ।

মহিলা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল আলম শফিকের দিকে। এরই মধ্যে ছেলেটার কপালে ঘাম জমতে শুরু করেছে। আমি বলতে পারবো না।”

“ভালো করে মনে করে দেখুন। আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন..শফিক সাহেব। সেই সুযোগে ঘর থেকে বের হয়ে কাজটা করে এল। এটা কি হতে পারে না?”

মিসেস রেহমান যে সন্দেহের ঘূর্ণিতে পড়ে গেছে, এটা বুঝতে পারছে বেগ।

আলম শফিক অস্থির হয়ে উঠল। “স্যার, বিশ্বাস-”

এবার জামান হাত তুলে মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিল।

“অস্থির হবেন না। আমাদের হাতে চারটা সম্ভাবনা রয়েছে : এক, আপনি খুনটা করেছেন। দুই, মিসেস রেহমান সেটা করেছেন। তিন, আপনারা দুজনে মিলে কাজটা করেছেন পরিকল্পনা করে। আর চার নাম্বারটা খুব দুর্বল বলে মনে হচ্ছে এখন : গৃহপরিচারিকা কিংবা হাউজ-নার্সও কাজটা করে থাকতে পারে।”

সম্ভাবনার কথাগুলো শুনে মিসেস রেহমান আর তার প্রেমিকের গলা শুকিয়ে এল।

“অপশন দেয়া হচ্ছে,” ফারুক সাহেব ফিসফিস করে পাশের জনকে কথাটা বলল যদিও তার কোনো দরকার নেই। কারণ এই ঘরের কোনো কথা ইন্টেরোগেশন রুমে শোনা যাবে না। দেখা যাক টোপটা প্রথমে কে গেলে!”

মিসেস রেহমানই টোপটা আগে গিলল। নিজের প্রেমিকের দিকে তাকিয়ে বলল : “তুমি তো মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে...সিগারেট খাওয়ার জন্য বেলকনিতে গিয়েছিলে...তাই না!”

“হ্যাঁ, হা,” অসহায়ের মতো বলল আলম শফিক। “শুধু বেলকনিতে গেছি, ঘরের বাইরে যাইনি। বিশ্বাস করো!”

ঠিক এ সময় জেফরি বেগ ঢুকে পড়ল তাদের মধ্যে। “এই ঘটনাটা কখন ঘটেছিল, মিসেস রেহমান?”

একটু ভেবে মহিলা বলল, “সেটা তো বলতে পারবো না। তবে দ্বিতীয়বার যখন পুলিশ এল তখন।”

“আপনি কিন্তু বলেছিলেন শেষবার পুলিশের আগমন ছাড়া বাকি দু’বারের ঘটনা আপনি টের পাননি। ঘুমিয়ে ছিলেন, জেফরি স্থির চোখে বলল কথাটা।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল মহিলা।

“আপনি অনেক মিথ্যে কথা বলছেন, মিসেস রেহমান। এই ইন্টেরোগেশন রুমে মিথ্যে বললে আপনার কোনো লাভ তো হবেই না বরং

অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। এটা আপনি ঠিক করছেন না।”

আয়নার ওপাশে বসে থাকা পলিগ্রাফ টেস্ট অপারেটর মুরাদ জানে জেফরি বেগ কথাটা ঠিক বলেনি। তার সামনে থাকা ফলাফল একেবারেই অন্য রকম। মি. জেফবিআই, এই কেসটা আপনাকে ভোগাবে, মনে মনে বলল মুরাদ।

“আপনি ঘুম থেকে উঠে বেলকনিতে গিয়েছিলেন কেন?” জেফরি প্রশ্ন করল আলম শফিককে।

“সিগারেট খেতে।”

“অতো রাতে ঘুম থেকে উঠে সিগারেট খাওয়ার জন্য বেলকনিতে গেলেন!”

“না, মানে ঘরের মধ্যে সিগারেট খাওয়াটা বর্ষা পছন্দ করে না,” শফিক কথাটা বলেই বর্ষার দিকে তাকাল। “তাই না, বর্ষা?”

মহিলা মাথা নিচু করে রাখল, কোনো জবাব দিল না।

পালাক্রমে তাদের দু’জনের দিকে তাকিয়ে জেফরি বেগ বলল, “আপনার সাথে আর কে কে ছিল?”

হকচকিয়ে গেল শফিক। “আমার সাথে...মানে...কি বলছেন, স্যার!”

“আপনি যখন সিগারেট খাওয়ার জন্য বেলকনিতে গেলেন ঠিক তখন নিচের রাস্তার ফুটপাতে আরেকজন যুবক ছিল। ছেলেটা গভীর মনোযোগ দিয়ে এই অ্যাপার্টমেন্টের দিকেই তাকিয়ে ছিল বলে আমাদের কাছে খবর আছে।”

মিসেস রেহমান অবিশ্বাসে তাকাল তার প্রেমিকের দিকে।

“বিশ্বাস করেন, স্যার, আমার সাথে কেউ ছিল না। বিশ্বাস করেন...” কাঁদো কাঁদো গলায় বলল আলম শফিক।

“সেই ছেলেটা কে?” মিসেস রেহমান জানতে চাইল বেগের কাছে। তার চোখেমুখে তীব্র অবিশ্বাস।

“সেটা আলম শফিক সাহেবই ভালো বলতে পারবেন। তবে মনে হচ্ছে। উনি খুব সহজে বলবেন না। কী আর করা...আমদের কাছে সব স্বীকার না করলে আপনাদেরকে পুলিশ রিমান্ডে দেয়া হবে। আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, তারা আপনাদের সাথে এ রকম ভদ্র ব্যবহার করবে না।”

অধ্যায় ১৩

আবেদ আলী টয়লেট থেকে বের হয়ে এল ফুরফুরে মেজাজে। আজ আর ঘরে তৈরি নাস্তা খাবে না। তার পছন্দের রেস্তোরাঁয় গিয়ে কলিজার ভুনা আর পরোটা খাবে। ভাবতেই মুখে পানি এসে গেল। খাদ্যরসিক হিসেবে তার খ্যাতি আছে।

নাস্তা করার আগে এক কাপ চা খেয়ে নেবে। এটা তার প্রতি দিনকার অভ্যাস। খালি পেটে চা না খেলে ভালো লাগে না। নাস্তার পরও অবশ্য আরেক দফা চা হবে। সকালের পত্রিকাটা ড্রইং রুমের টেবিলে রাখা আছে। এক হাতে সেটা তুলে নিয়ে অন্য হাতে রিমোটটা দিয়ে টিভি ছেড়ে আরাম করে বসে পড়ল সোফায়। শিষ বাজিয়ে বিটোফেনের ঔড টু জয় তোলার চেষ্টা করল ভুলভালভাবে।

কাজের ছেলেটা চা দিয়ে গেলে আবেদ আলী শিষ বাজাতে বাজাতে কাপটা তুলে নিয়ে টিভির চ্যানেলটা বদলে একটা দেশি চ্যানেলে সুইচ করল। পত্রিকায় কোনো খবর নেই। গুলি খেয়ে কেউ মরেনি। লঞ্চ ডুবির ঘটনাও ঘটেনি। আর রাজনীতিবিদেরাও কোনো বাকবিতণ্ডায় জড়ায়নি। গতকাল সাংবাদিকদের জন্য একটা বাজে দিন গেছে।

তারপরও তার চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে পত্রিকায়। চায়ের কাপে মাত্র চুমুক দেবে ঠিক তখনই টিভির একটা খবর শুনে পত্রিকা থেকে চোখ তুলে সেদিকে তাকাল আবেদ আলী।

ব্রেকিং নিউজ!

পত্রিকাটা একপাশে রেখে হা করে টিভির দিকে তাকিয়ে রইল সে। খবরটা শোনার পর ঔড টু জয় বাজানোটা নির্মম পরিহাস বলেই মনে হচ্ছে তার কাছে।

অল্পবয়সি সংবাদ পাঠিকা যে সংবাদটি পড়ে শোনাচ্ছে সেটা তার কাছে এতোটাই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে যে, হাতের চায়ের কাপটা আরেকটু হলে হাত থেকে পড়েই যেতো।

হায়! হায়!

আবেদ আলীর বুকটা ধরফর করে উঠল। সকালের যে অবিশ্বাস্য একটা মেইল পেয়ে এতোক্ষণ ধরে ফুরফুরে মেজাজে ছিল সেটা নিমেষে তিরোহিত হয়ে গেছে।

আধ ঘন্টার মধ্যে একটা লটারি পেয়ে সেটা নস্যাৎ হতে দেখলে যে কারোরই হৃদপিণ্ড বন্ধ হবার কথা। আবেদ আলীরও মনে হলো তার বুকের বাম পাশটায় চিন চিন করে ব্যথা করছে।

বেঈমানটা...!

অধ্যায় ১৪

সারা দেশে একটা সংবাদ সুনামির মতো ছড়িয়ে পড়েছে : জনপ্রিয় লেখক জায়েদ রেহমান খুন হয়েছেন!

এই সংবাদটি প্রথম দিতে পেরেছে চ্যানেল সিক্সটিন নামের নতুন একটি টিভি স্টেশন। তবে কিভাবে তারা এ রকম একটি এক্সক্লুসিভ নিউজ সবার আগে জানতে পারল সেটা একটা রহস্যই বটে।

তারা সরাসরি লেখক জায়েদ রেহমানের বাড়ির সামনে থেকে লাইভ রিপোর্টিং দেখিয়ে যাচ্ছে এখন। অবশ্য দেশের বাকি টিভি চ্যানেল, সংবাদপত্র এমনকি বেশ কয়েকটি এফএম রেডিও প্রচার করে যাচ্ছে খবরটা। একযোগে মাঠে নেমে পড়েছে সবাই।

একটা ইঁদুর দৌড় শুরু হয়ে গেছে বলা যায়।

নিহত লেখকের বাড়ির ভেতরে সাংবাদিকদের কেউ প্রবেশ করতে না পারলেও তারা বাইরে থেকে যে যার মতো করে সংবাদ পরিবেশন করে যাচ্ছে। প্রত্যেকের কাছেই একটা করে নতুন খবর আছে। আছে অন্য রকম তথ্য।

ভিটা নুভার সামনে জড়ো হওয়া সাংবাদিকদের মধ্যে যারা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার তারা অবজ্ঞার চোখে না দেখলেও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকেরা টেকনিক্যাল কারণেই একটু আপসেট হয়ে আছে।

ওরা লাইভ দেখাচ্ছে।

কিন্তু আমাদেরটা আগামীকালের আগে মুখ দেখবে না।

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার নাক উঁচু সাংবাদিকেরা বেশ ভালো মতোই উপভোগ করছে এই ব্যাপারটা। এক ধরণের করুণার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে তাদের আচরণে।

শতশত সাংবাদিক আর হাজার হাজার মানুষ। সেই সাথে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনের ভিড়ের কারণে ভিটা নুভার সামনে দিয়ে সব ধরণের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ভিড় সামাল দিতে আরো পুলিশের দরকার বলে হেডকোয়াটারে খবর দেয়া হয়েছে একটু আগে। পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে। লেখক জায়েদ রেহমানের অল্পবয়সি পাঠকেরা এখনও ভিড় করতে শুরু করেনি। তারা এলে কী হবে কে জানে।

একটা স্কুপ আর এক্সকুসিভ পাবার জন্য সাংবাদিকের দল এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। যাকে তাকে ধরে ইন্টারভিউ নিচ্ছে তারা। এই সুযোগে কিছু জানে না এমন লোকও দিব্যি টিভি ক্যামেরার সামনে অনেক কথা বলে চলেছে। তাদের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে লেখক জায়েদ রেহমানকে তাদের। সামনেই হত্যা করা হয়েছে কিংবা এ রকম একটা ঘটনা যে ঘটবে সেটা তারা আগেই টের পেয়েছিল।

"এই ভবনের ছয় তলার...ঐ কর্নার ফ্ল্যাটে লেখক জায়েদ রেহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে," চ্যানেল সিক্সটিন-এর অন্যতম প্রতিপক্ষ একটি টিভি চ্যানেলের উঠতি বয়সি সাংবাদিক ভিটা নুভার দিকে লুক দিয়ে ক্যামেরার সামনে বলল। তার চারপাশে হাজার হাজার মানুষের ভিড়টাকে কোনো রকম আমলেই নিচ্ছে না সে। "আমরা জানতে পেরেছি নিহত লেখকের স্ত্রী আর তার প্রেমিককে সিটি হোমিসাইড গ্রেফতার করেছে। অবশ্য কর্তৃপক্ষ এখনও এ ব্যাপারে মুখ খুলছে না। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে..." এক উজবুক টাইপের কৌতূহলী দর্শক রিপোর্টারকে আলতো করে ধাক্কা মেরে উদাস ভঙ্গিতে চলে গেলে রিপোটার নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলতে লাগল..."লেখকের স্ত্রীর সেই প্রেমিক প্রবরটি হলেন তরুণ নাট্য নির্মাতা আলম শফিক।"

আশেপাশের লোকজন বুঝে গেছে এই রিপোটার লাইভ রিপোর্ট করছে, ব্যস!

সাংবাদিকের চারপাশে শত শত লোক নিজেদের চেহারা দেখানোর জন্য হুমরি খেয়ে পড়লে বেচারা সাংবাদিকের অবস্থা নাকাল হয়ে গেল। কিন্তু সেই অবস্থায়ই রিপোর্ট করে গেল ছেলেটা।

পাভেল আহমেদ নামের দৈনিক দেশবিদেশ পত্রিকার সাংবাদিক ভিটা নুভার সামনে এসে দাঁড়াল। তার মধ্যে রিপোর্ট করবার কোনো তাড়া নেই। অনেকটা অলসভঙ্গিতে তাকাল ভিটা নুভার দিকে।

তার পিঠে আলতো করে কে যেন চাপড় মারলে পেছন ফিরে দেখতে পেল তার পরিচিত এক টিভি চ্যানেলের রিপোর্টার দাঁত বের করে হাসছে। "এতো দেরি করলে?"

পাভেল আহমেদ মুচকি হাসল। "আমি তো আর এখন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় কাজ করি না। দেরি করে এলে সমস্যা কি?"

"তা ঠিক। তুমিই ভালো আছে। আর আমাকে দ্যাখো, নাস্তাও করতে পারিনি। ছুটে এসেছি এখানে।"

"আমি তো আসতে চাইনি। এডিটর বললেন ঘটনাস্থলে যেতেই হবে।"

"তা আসতে চাইবে কেন! আমাদের রিপোর্টগুলো এদিক ওদিক করে ছাপিয়ে দিলেই তো হয়ে যায়। আছো তো সুখে," ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক পকেট থেকে দুটো সিগারেট বের করে একটা বাড়িয়ে দিল পাভেল আহমেদের দিকে।

সিগারেটটা হাতে নিয়ে পাভেল আহমেদ ভিটা নুভার দিকে তাকিয়ে বলল, "এক্সকুসিভ কিছু পেলে?"

"মিসেস রেহমান আর তার প্রেমিক আলম শফিক গ্রেফতার হয়েছে। আপাতত এটাই আমাদের এক্সক্লুসিভ।"

পাভেল আহমেদ ভুরু কুঁচকে তাকাল সাংবাদিকটির দিকে। "এটা তো আমি বাসায় বসে টিভিতেই শুনে এলাম। এরচেয়ে বেশি কিছু জানতে পারোনি?"

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক মাথা নেড়ে জবাব দিল। "নিউজ প্রডিউসার বার বার ফোন করে তাড়া দিচ্ছে নতুন কিছু দেবার জন্য। চ্যানেল সিক্সটিন তো আজকে ছক্কা মেরে দিয়েছে। এখন আমাদেরকে একটা কিছু করতেই হবে। কিন্তু চাইলেই কি এক্সকুসিভ কিছু পাওয়া যায়?"

পাভেল আহমেদের মাথায় চট করে একটা আইডিয়া চলে এল। একটু চুপ করে থেকে বলল, "চেষ্টা করে দ্যাখো কিছু পাও কি না।"

"আরে আমি চাইলেই কি পাবো! এক্সকুসিভ ঘটনা তো ঘটতে হবে, না কি?"

মাথা নেড়ে সায় দিল পাভেল। "আমি যাই। সিগারেটের জন্য ধন্যবাদ।"

"চলে যাবে?" বিস্মিত হলো সাংবাদিক।

"এখানে আমার কোনো কাজ নেই। খামোখাই এসেছি। এডিটরের কথা। রাখলাম আর কি।"

"রিপোর্ট করবে না?"

পাভেল আহমেদ মুচকি হেসে বলল, "রিপোর্টের কিছু বাকি রেখেছো তোমরা! সবই তো দেখিয়ে দিয়েছে।"

"নতুন কোনো ডেভেলপমেন্টও তো হতে পারে।"

"মনে হয় না। মাত্র তো গ্রেফতার করা হয়েছে। তাছাড়া আসামীরা কোনো জবানবন্দি দিলেও আমরা সেটা দু'এক দিনের আগে জানতে পারবো না।"

"তা ঠিক..."

অনেকটা হুট করেই পাভেল আহমেদ তাকে বলল, "তোমার জন্য একটা এক্সকুসিভ আইটেম আছে, অবশ্য তুমি যদি সেটা চাও তো..."

"মানে? কিসের এক্সক্লুসিভ?"

মুচকি হাসল পাভেল। একটু কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে ফিস ফিস করে সংক্ষেপে জানাল সেটা কি। কথাটা শুনেই সাংবাদিকের চোখ দুটো চক চক করে উঠল।

"নিয়ে আসো। এক্ষুণি নিয়ে আসো।"

"তার আগে তুমি আমাকে কনফার্ম করো তোমরা নেবে কি না," বলল পাভেল আহমেদ।

"আমি ফোন করে নিউজ প্রডিউসারকে জানাচ্ছি, তুমি ওটা নিয়ে আসো।"

"ঠিক আছে আমি বাসায় যাচ্ছি। তুমি এখনই ফোন করে জেনে নাও।"

কথাটা বলেই পাভেল আহমেদ ভিড় ঠেলে চলে গেল।

অধ্যায় ১৫

জেফরি বেগের টোপটা ঠিকঠাকমতোই গিলেছে মিসেস রেহমান। মহিলা সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে তার প্রেমিককে। জেফরিকে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে সে : প্রথমবার মিলনের পর তারা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়লে মাঝরাতে মিসেস রেহমানের ঘুম ভেঙে যায়, সে দেখতে পায় বিছানায় আলম শফিক নেই। পরে বেলকনি থেকে বেরিয়ে আসে শফিক। মহিলা নিশ্চিত করে বলতে পারেনি ঠিক কখন শফিক বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়েছিল।

ওদিকে আলম শফিক বিরক্তিকরভাবেই নিজের নির্দোষিতার কথা বলে গেছে। ব্যাপারটা বেগের কাছে অসহ্য লেগেছে এক পর্যায়ে।

সিগারেটের তেষ্টা পেলে সে না কি বেলকনিতে গিয়ে সিগারেট ধরিয়েছিল আর তখনই অ্যাপার্টমেন্টের সামনে পুলিশের গাড়ি থামতে দেখে ভয়ে ঘরের ভেতরে চলে যায়।

দেড় ঘণ্টার জেরায় অনেক তথ্য দিলেও হত্যার কথা তাদের কেউই স্বীকার করেনি। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই যে, এ দুজন ছাড়া এই হত্যাকাণ্ডটি যে অন্য কেউ ঘটায়নি সেটা মোটামোটি নিশ্চিত।

প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে জেফরি দেড় ঘণ্টা জেরা করে কোনো রকম স্বীকারোক্তি ছাড়াই ইন্টেরোগেশন পর্ব শেষ করেছে। এর অবশ্য কারণও রয়েছে। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট তদন্তের স্বার্থে যে কাউকে রিমান্ডে নিতেও পারে নাও নিতে পারে, এটা তাদের ইচ্ছের উপর নির্ভর করে কিন্তু পুলিশ রিমান্ড থেকে কারোর রেহাই নেই। তাছাড়া বেগের কাছে মনে হয়েছে আপাতত এরচেয়ে বেশি মিসেস রেহমান আর তার প্রেমিক বলবেও না।

জেফরির ইচ্ছে ছিল ইন্টেরোগেশন রুম থেকে বের হয়ে বাইরে গিয়ে একটু খেয়েদেয়ে আসবে কিন্তু সেটা আর হয়নি। রুম থেকে বের হতেই তার ডাক পড়ে মহাপরিচালকের রুমে।

এখন সে বসে আছে মহাপরিচালক ফারুক আহমেদের ডেস্কের বিপরীতে।

"ওরা স্বীকার করুক আর নাই করুক তাতে কিছু যায় আসে না," ফারুক সাহেব বলল। তাকে খুব খুশি দেখাচ্ছে। কেন দেখাচ্ছে জেফরি সেটা আন্দাজ করতে পারল। "এটা নিশ্চিত, ওই মহিলা আর তার প্রেমিক পরিকল্পনা করেই খুনটা করেছে। পুরো ঘটনাটা একেবারে পানির মতোই পরিস্কার।"

জেফরি কিছু বলল না। তার খিদেটা এখন অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে। ডেস্কে রাখা এক গ্লাস পানি আছে, সেটা তুলে নিলো।

"অসাধারণ কাজ করেছে। আমি খুবই খুশি। একেবারে ঘটনাস্থল থেকে একজন সাসপেক্টকে অ্যারেস্ট করা...মাইগড! তোমার উপর আমার বরাবরই আস্থা আছে। তুমিও সেটা জানো।"

পানিটুকু এক ঢোকে খেয়ে গ্লাসটা রেখে বলল জেফরি, "ধন্যবাদ স্যার।"

"প্রেস তো জ্বালিয়ে খাচ্ছে," ফারুক সাহেব জেফরির উপর থেকে চোখ সরালো না। "একটা ইন্টারভিউ দিয়ে দাও।"

"ইন্টারভিউ?" বেগ আৎকে উঠল।

"হ্যাঁ।আরে সবাই তো এ রকম সুযোগের জন্য মুখিয়ে থাকে। তাছাড়া এতোবড় একটা ঘটনা, সবাই জানে তোমার কারণেই এতো দ্রুত খুনিকে ধরা গেছে। তোমাকেই চাইছে সবাই।"

"স্যার, আপনি তো জানেন আমি প্রেসকে ফেস করতে পারি না। ইচ্ছেও করে না।

আপনি দেন। ডিপার্টমেন্টের হেড হিসেবে আপনারই দেয়া উচিত।”

ফারুক সাহেব একটু সামনে ঝুঁকে এল। “আমি তো দেবোই। বলছিলাম কি, তুমিও একটা দাও।”

“না, স্যার। এ ব্যাপারে আমাকে মাফ করবেন।” একটু থেমে বেগ প্রসঙ্গ পাল্টাল। “স্যার, পলিগ্রাফ টেস্টের খবরটা জানা দরকার।”

“ওহ, হ্যাঁ।ভুলেই গেছিলাম।” ফারুক সাহেব ইন্টারকমটা তুলে তার পিএ'কে বলল রমিজ লস্করকে এক্ষুণি তার অফিসে চলে আসার জন্য।

“হোমমিনিস্টার তো খুব খুশি,” ইন্টারকমটা রেখে নিজের চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল ফারুক সাহেব।

“তাই না কি,” ছোট্ট করে বলল বেগ।

“নিজে আমাকে ফোন করে বলেছেন। বুঝলে না, ঐ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় কমিটির চাপে ছিলেন। আমাদের চেয়ে উনার খুশিটাও কম নয়।”

“স্যার, আসবো?”

দরজার কাছ থেকে একটা কণ্ঠ বলে উঠলে ফারুক সাহেব আর জেফরি বেগ দু'জনেই সেদিকে তাকাল। রমিজ লস্কর।

“আসো, একটা চেয়ারের দিকে ইশারা করে তাকে বসতে বলল ফারুক সাহেব।

“পলিগ্রাফ টেস্টের রিপোর্টটা কি?” রমিজকে বলল বেগ।

গাল চুলকে তাদের দুজনের দিকে একবার চেয়ে নিলো রমিজ। “রিপোর্ট ভালো না, স্যার।”

“মানে?” ফারুক আহমেদ বিস্মিত হলো।

“সাসপেক্টরা খুব কমই মিথ্যে বলেছে। মহিলা প্রথম দিকে মিথ্যে বললেও শফিক সাহেবের মুখোমুখি করার পর তেমন কোনো মিথ্যে কথা বলেনি। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় হলো শফিক সাহেব কোনো মিথ্যেই বলেনি।”

“কি!” ফারুক সাহেব আবারো অবাক হলো। তবে বেগ কিছু বলল না।

“আমিও খুব অবাক হয়েছি,” রমিজ লস্কর বলল।

“মেশিনটা ঠিকমতো কাজ করেছো তো?” সন্দেহ করল মহাপরিচালক।

“জি স্যার। একদম ঠিক আছে।”

“মিথ্যে বলেনি!?” এই প্রথম বেগ জানতে চাইল। তাকে একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল রমিজ লস্কর, “ভাইটাল প্রশ্নগুলোতে মিথ্যে বলেনি।”

“পলিগ্রাফ টেস্ট অবশ্য আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এটা কেবলই আমাদের ইন্টেরোগেশন টুলগুলোর একটি। এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। পুলিশ রিমান্ডে ওরা সব স্বীকার করবে,” ফারুক সাহেব আশ্বস্ত করে বলল।

“তা ঠিক,” সমর্থন করল রমিজ লস্কর।

“স্যার, আদালতে গ্রহণযোগ্য না হলেও পলিগ্রাফ টেস্ট কিন্তু খুব নির্ভরযোগ্য। অন্তত আমরা তাই দেখে আসছি। এখন পর্যন্ত এটা ভুল প্রমাণিত হয়নি,” বেগ বলল।

“ব্যতিক্রম তো হতেই পারে। পারে না? ভুলে যাবে না, পলিগ্রাফ টেস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফুলফ নয়। আর এজন্যেই এখনও পৃথিবীর কোথাও আদালতের কাছে এটা স্বীকৃত হয়নি।”

বেগের চেহারা দেখে মনে হলো না সে এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারছে। তবে এটাও ঠিক, কথাটা মিথ্যে নয়। খুব বিরল প্রকৃতির মানুষ পলিগ্রাফ টেস্টকে ধোঁকা দিতে পারে। যারা এটা নির্মাণ করেছে তারাই এ রকম কথা স্বীকার করে। কিন্তু জেফরি বেগ

কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না ঐ মিসেস রেহমান আর তার প্রেমিক সেই রকম বিরল কোনো ব্যক্তি।

একই দিনে দুদুজন বিরল ব্যক্তি?

অসম্ভব!

অধ্যায় ১৬

হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের কেন্টিনটা ছয় তলা ভবনের একেবারে উপরে অবস্থিত। বিশাল ভবনের ছাদের এক তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে এই কেন্টিনটি জেফরি বেগের একটি প্রিয় জায়গা।

সব সময় এক কোণের একটি টেবিলে বসে চা-নাস্তা খেলেও আজকে আর সম্ভব হলো না। কেন্টিনে ঢোকার পর পরই ডিপার্টমেন্টের সবাই তাকে জেঁকে ধরল। আজকের সাফল্যে কগ্রাচুলেন্স জানাল তাকে। এমন কি যেসব সহকর্মী তাকে ঈর্ষা করে, আড়ালের আবডালে উল্টাপাল্টা কথা বলে তারাও মুখে কৃত্রিম হাসি এটে জেফরিকে সাধুবাদ জানাতে বাধ্য হলো।

সবার কৌতূহল যতোটা সম্ভব মিটিয়ে অবশেষে কেন্টিনের এক কোণে তার পছন্দের টেবিলে বসতে পারল জেফরি। পেটে ক্ষিধে থাকলেও মাথায় তার অন্য চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, তাই বেয়ারাকে খাবারের অর্ডার দিতে ভুলে গেল।

ইন্টেরোগেশন রুম থেকে বের হয়ে ফারুক সাহেবের রুমে যাবার আগে সহকর্মী জামানকে ভিটা নুভায় পাঠিয়েছে সে। লেখক জায়েদ রেহমানের ঘরের অনেক কিছু জব্দ করতে হবে : লেখকের ব্যক্তিগত ডায়রি-যদি থেকে থাকে, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র।

সবাই খুশি হলেও জেফরি বেগের মনে একটা খটকা লেগে আছে। সে এখনও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেনি। পুরো ব্যাপারটা ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে। সত্যি বলতে কি এই কেসটা নিয়ে খুব বেশি মাথা না ঘামালেও দ্রুত সাফল্য পেয়ে গেছে। তবে এখন তার কাছে মনে হচ্ছে কেসটা নিয়ে আরো বেশি সিরিয়াস হওয়া দরকার ছিল। জগিং থেকে ক্রাইম সিনে চলে আসাতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। যতোটা সহজ বলে মনে করেছিল কেসটা বোধহয় ততোটা সহজ নয়। আবার এটাও ঠিক, পলিগ্রাফ টেস্টের ফলাফল থেকে এখনই কোনো সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার জন্য তার হাতে যথেষ্ট সময় আছে। হঠাৎ তার ভাবনায় ছেদ পড়ল এডলিন ডি কস্তার আগমনে।

আলম শফিককে গ্রেফতার করার একটু আগে থেকেই এডলিনের সাথে আর কথা হয়নি তার।

এই মেয়ে যখনই কেন্টিনে আসে তখনই ডিপার্টমেন্টের পুরুষ সহকর্মীদের ঘাড় বেঁকে যায়। এজন্যে অবশ্য কাউকে দোষ দেয় না বেগ। মেয়েটা দেখতে খুবই আকর্ষণীয়।

জেফরি একটু নড়েচড়ে বসল, কারণ এডলিন তার কাছেই আসছে।

“কংগ্রাচুলেন্স, স্যার, মিষ্টি করে হেসে বলল সে।

“থ্যাংকস।” জেফরি এরপর কি বলবে বুঝতে পারল না। মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ করেই তার মনে হলো তাকে বসতে বলা উচিত। “বসুন।”

“থ্যাংকস।” একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল এডলিন।

অস্বস্তিতে পড়ে গেল বেগ। দু'জন অবিবাহিত নারী-পুরুষ একসাথে বসবে আর ডিপার্টমেন্টে এ নিয়ে কোনো মুখরোচক গল্প হবে না তাতো হতে পারে না। ইতিমধ্যেই আশেপাশের টেবিলে ফিসফাস শুরু হয়ে গেছে।

“ভিটা নুভা থেকে কখন ফিরলেন?” বেগ জানতে চাইল।

“ঘণ্টাখানেক আগেই। এলিমেনেশন প্রসেস এখনও করিনি। সেটার কি দরকার আছে?” বলল এডলিন।

একটু ভেবে নিলো বেগ। “না। আমরা যাকে গ্রেফতার করেছি সে স্বীকার করেছে রাতে

অ্যাপার্টমেন্টেই ছিল।”

“আমি সেজন্যে প্রসেস করিনি।” এডলিন একটু থামল। “স্যার কি কিছু খাবেন? চা?”

“চা? না। আমি তো এখনও নাস্তাই করিনি। প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে।”

“এখনও নাস্তা করেননি?” এডলিন কৃত্রিম বিস্ময়ে বললে ব্যাপারটা বেগও টের পেল। “আরেকটু পরে তো লাঞ্চের সময় হয়ে যাবে।”

“হ্যাঁ,” অন্যমনস্কভাবে বলল জেফরি।

“স্যার!” একটা জোড়াল কণ্ঠের কারণে জেফরির অন্যমঙ্কভাবটা কেটে গেল। সাবের কামাল তার টেবিলের দিকে আসছে হাসিমুখে। কাছে এসে জেফরির হাতটা ধরে সে বলল, “আপনি তো দারুণ কাজ করেছেন। তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। নিচে দেখে এলাম চার-পাঁচজন টিভি রিপোর্টার ঘুরঘুর করছে। আমার কাছে আপনার কথা জানতে চাইল। ওদের কাছে আপনি এখন হটকেক।” এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে এডলিনের দিকে তাকাল সাবের কামাল।

বেগ তাকে বসার জন্য ইশারা করার আগেই সে চেয়ারে টেনে বসে পড়ল। “আরে এডলিন, আপনি বাসায় গেছিলেন না কি?”

“বাসায়! না। কেন?” এডলিন অনেকটা বিরক্ত হয়েই বলল।

“না মানে, এই জামাটা পরেই কি আজ অফিসে এসেছিলেন?”

“হ্যাঁ,” এডলিনর কাটাকাটাভাবে বলল কথাটা।

“আমি ভেবেছি বাড়িতে গিয়ে বোধহয় জামা পাল্টে এসেছেন।”

এডলিন বেগের দিকে ফিরল। “স্যার, আমি উঠি।” সাবের কামালকে কিছু না বলেই কেন্টিন থেকে চলে গেল মেয়েটা।

সাবের কামাল নারী সহকর্মীদের কাছে একটি বিরক্তিকর চিজ। সবাই তাকে এড়িয়ে চলে। জেফরি নিজেও তার আচরণে সন্তুষ্ট নয়। তবে খুব বেশি দূর যায় না সে। একটু খোঁচা মারবে তো একটু সুযোগ বুঝে বেমক্কা কথা বলে বিব্রত করে দেবে-এর বেশি নয়।

“কী খবর?” বলল জেফরি।

“খবর ভালো, স্যার,” চেয়ারটা সামনে টেনে আনলো কামাল যেন জরুরি একটা কথা বলবে। “সিগারেটের ফিল্টার থেকে সালিভা পাওয়া গেছে। এখন মি. শফিকের নমুনা কালেক্ট করে ম্যাচিং করে দেখতে হবে। তবে আমি নিশ্চিত পজিটিভ হবে।”

মাথা নেড়ে সায় দিল বেগ। সে-ও জানে এটা পজিটিভ হবে। আলম শফিক স্বীকার করেছে মিসেস রেহমানের ঘরে সিগারেট খাওয়ার কথা। তারপরেও সন্দেহভাজনরা যখন হত্যার কথা স্বীকার করছে না সেক্ষেত্রে আদালতে শক্ত প্রমাণ হিসেবে তাদেরকে কিছু কাজ করতে হবে। ডিএনএ টেস্ট এই কেসে বেশ বড় ভূমিকা রাখবে বলেই আশা করছে জেফরি।

“জায়েদ রেহমানের ঘরে কিছু পেয়েছো?” জানতে চাইল বেগ।

“না, স্যার। একদম ক্লিন। ফিঙ্গারপ্রিন্ট টিমও ওখানে কিছু পায়নি।”

বেগ কিছু বলতে যাবে তার আগেই জামান এসে হাজির। তার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটেছে। হন্তদন্ত হয়ে জেফরির টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল সে।

“স্যার!”

“কী হয়েছে?” বলল জেফরি।

“জায়েদ রেহমানের ল্যাপটপটা চেক করে একটা জিনিস পেয়েছি। আমার মনে হয় এক্ষুণি আপনার সেটা দেখা দরকার।”

জেফরি বেগ খবরটা শুনে উফুল হতে পারল না। খিদের চোটে তার হাত-পা রীতিমতো

কাঁপছে। টেবিলে রাখা এক গ্লাস পানি দ্রুত খেয়ে উঠে দাঁড়াল সে। “ল্যাপটপটা কোথায়?”

“আপনার অফিসে।”

“চলো।”

সাবের কামালকে রেখে জেফরি আর জামান তাড়াহুড়ো করে কেন্টিন। থেকে বের হয়ে গেল।

অধ্যায় ১৭

আবেদ আলী আর বাইরে গিয়ে নাস্তা করেনি। ইয়াহু মেইলে গিয়ে মিলির গরম মেইলটাও খুলে দেখেনি এখন পর্যন্ত। অনলাইনে মিলি তাকে না পেয়ে তার মোবাইলে পাঁচ-ছয়টা এসএমএস করেছে, সেগুলোর জবাব দেয়া তো দূরের কথা একটাও পড়ে দেখেনি। জায়েদ রেহমানের হত্যার খবর শুনে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে ড্রইংরুমে বসে আছে। বাড়ির কাজের লোক নাস্তা দিয়ে গেলেও পুরোটা খেতে পারেনি। অর্ধেক নাস্তা এখনও টেবিলে পড়ে রয়েছে। তিন বছর ধরে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু টেনশন দূর করার জন্য কাজের ছেলেটাকে দিয়ে কিছুক্ষণ আগে এক প্যাকেট সিগারেট আনিয়েছে সে। এটাও তো ঠিক, বিগত তিন বছরে তার জীবনে এ রকম একটা দিন আসেনি।

এরইমধ্যে তিনটা সিগারেট শেষ করে ফেলেছে, চার নাম্বারটায় আগুন ধরাল। সিগারেট যে কেন খাচ্ছে সেটাও জানে না। এক ধরণের ঘোরের মধ্যে পড়ে গেছে। তার মাথায় অসংখ্য চিন্তা ঘুরপাক খেলেও কোনো কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। কারো সাথে পরামর্শ করা দরকার, কথাটা ভেবেই আধ ঘন্টা আগে তার এক লেখক বন্ধুর সাথে ফোনে এ নিয়ে কথা বলেছে। তারপর থেকে তার দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে কয়েক গুন। সেই লেখক বন্ধু সব শুনে যা বলেছে তা রীতিমতো গা শিউড়ে ওঠার মতো। অবশ্য তার কথায় যুক্তি আছে। আবেদ আলী নিজেও সেটা বুঝতে পারছে এখন।

***

নিজের অফিসে বসে আছে জেফরি বেগ। তার সামনে বসে আছে জামান। লেখক জায়েদ রেহমানের ল্যাপটপ চেক করে অসাধারণ একটি তথ্য পাওয়া গেছে।

মৃত্যুর আগে জায়েদ রেহমান একজনের কাছে মেইল করে গেছেন। শুধু মেইল না, সাথে একটা বিশাল আকারের ডকুমেন্ট ফাইলও অ্যাটাচ করেছেন তিনি।

অদ্ভুত।

মেইল আর অ্যাটাচমেন্ট ফাইলটা ওপেন করে দেখেছে জেফরি। এটা আরেকটা বোমার মতো। সে ভাবতেও পারেনি এভাবে এতো দ্রুত সব আলামত আর ক্লু পেয়ে যাবে।

যার কাছে লেখক মেইলটা পাঠিয়েছিলেন সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। আর সেটা করতে হবে খুব দ্রুত। ভদ্রলোকের ফোন নাম্বার যোগার করাটা তেমন কঠিন কাজ ছিল না। ইয়েলো পেজ থেকে ভদ্রলোকের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ফোন করে তার ব্যক্তিগত মোবাইল নাম্বারটা নিয়ে নিয়েছে জামান।

ভদ্রলোক থাকে বেইলি রোডে, হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের খুব কাছে। জেফরি ঠিক করল এক্ষুণি ভদ্রলোকের সাথে কথা বলবে। তবে তার আগে ফোন করে জেনে নিতে হবে এখন সে কোথায় আছে। আবারো জামানকেই ফোনটা করার জন্য বলল সে।

আজকের সকালটা কতো দ্রুতই না বদলে যাচ্ছে! পেন্ডুলামের মতো দুলছে আবেদ আলীর ভাগ্য। তার মনে আশঙ্কা বেঈমানটা মরে যাবার আগে তাকে একটা গ্যাড়াকলে ফেলে দিয়ে গেছে। কিন্তু কেন? আবেদ আলী এর কোনো সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছে না।

আরে, আমি তোর কী ক্ষতি করেছিলাম!

তাকে চমকে দিয়ে মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল।

নাম্বারটা অপরিচিত। প্রথমে ভেবেছিল ধরবে না, তারপর সাত-পাঁচ ভেবে কলটা রিসিভ করল সে।

"হ্যালো, আবেদ আলী সাহেব বলছেন?"

“জি...” ভয়ার্তভাবে বলল সে।

“সিটি হোমিসাইড থেকে বলছি। ইন্সপেক্টর জামান।”

“সিটি হোমি...” আবেদ আলী আর কিছু বলতে পারল না। যে আশঙ্কা করেছিল সেটাই বুঝি সত্যি হতে চলেছে। টের পেল তার নিশ্বাস দ্রুত হয়ে গেছে।

অধ্যায় ১৮

পাভেল আহমেদ ভিটা নুভা থেকে একটু দূরে এসে পকেটে হাত দিল। সেখানে ছোট্ট একটা জিনিস আছে।

নিজের দূরদর্শিতার কথা ভেবে খুব ভালো লাগছে তার। পাঁচ মাস আগেও যে জিনিসটার কোনো মূল্য ছিল না আজ সেটাই হয়ে উঠেছে লোভনীয় একটি বস্তু। তার সাবেক বস চ্যানেল সিক্সটিনের নিউজ এডিটর মামুনুর রশীদ যখন এই জিনিসটা দেখতে পাবে তখন তার অবস্থা কী রকম হবে ভাবতেই পাভেলের হাসি পেল।

কতো কষ্ট করেই না জিনিসটা জোগাড় করেছিল সে অথচ এডিটর সেটার মূল্যই বুঝতে পারল না! প্রিন্ট মিডিয়া থেকে অনেক শখ করে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় গেছিল সে, মাত্র দেড় মাসের মাথায় সে পাট চুকিয়ে ফিরে এসেছে পুরনো কর্মক্ষেত্রে।

পকেট থেকে সাদা কাগজে মোড়ানো জিনিসটা বের করল, তাতে ছোট্ট করে ইংরেজিতে লেখা আছে : Z.R-I

একটু সময় পার করে তাকে আবার ফিরে যেতে হবে ভিটা মুভার সামনে জটলার দিকে। সময় কাটানোর জন্য আশেপাশে একটা চায়ের দোকান খুঁজে সেখানে চলে গেল সে। আধ ঘণ্টার মতো সময় কাটাতে হবে তাকে।

***

ভিটা নুভার সামনে লোকজনের জটলা এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। একদল অল্পবয়সি পাঠক রীতিমতো মিছিল করতে শুরু করে দিয়েছে। লেখকের স্ত্রী আর প্রেমিকের ফাঁসির দাবি তোলা হচ্ছে সেই মিছিল থেকে। প্রথমে মনে করা হয়েছিল নিতান্তই ছেলেমানুষি ব্যাপার। পাগলামি। কিন্তু এখন আর সেটা মনে হচ্ছে না। এই হুজুগে যোগ দিয়েছে ভাসমান আর কৌতূহলী আরো কয়েকশ' মানুষ।

সবগুলো টিভি চ্যানেল এই দৃশ্য লাইভ দেখাচ্ছে। সাংবাদিকেরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মিছিলের নেতাগোছের কারো সাক্ষাৎকার নেবার জন্য।

স্বদেশ টিভির রিপোর্টার হামিদ আলম তার ক্যামেরাম্যান ছেলেটাকে মিছিল কভার করার জন্য পাঠিয়ে সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল। প্যাকেটে আর কোনো সিগারেট নেই। একটু আগে পাভেল আহমেদকে সিগারেট দেয়াটা ঠিক হয়নি। তার স্টক শেষ হয়ে গেছে।

চারপাশে প্রচণ্ড হৈহট্টগোল থাকার কারণে প্রথমে সে বুঝতে পারেনি, পরে খেয়াল করল পকেটে থাকা মোবাইল ফোনে রিং হচ্ছে। বিরক্ত হয়ে গেল সে। শালার নিউজ প্রডিউসার এসি রুমে বসে বসে খালি অর্ডার দিয়ে যাচ্ছে : একটা স্কুপ চাই! একটা স্কুপ চাই! পাঁচ মিনিট পর পরই তাকে ফোন করছে। তার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে সে বুঝি এখানে বসে বসে বাল ফেলছে।

কিন্তু ডিসপ্লের নাম্বারটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে কলটা রিসিভ করল হামিদ আলম।

"হ্যাঁ, বলো?" খুব জোরে বলতে হলো চারপাশের নয়েজের কারণে।

"তুমি কি এখনও ভিটা নুভার সামনে আছো?" পাভেল আহমেদ জানতে চাইল।

"আর কোথায় যাবো! সারাটা দিন মনে হয় এখানেই থাকতে হবে।"

"নিউজ প্রডিউসারের সাথে কথা বলেছো?"

"হ্যাঁ, বলেছি। তুমি ওটা নিয়ে চলে আসো। ভালো দাম পাবে।"

"নগদ দিতে হবে কিন্তু।"

"নগদ মানে...আমি তো স্পটে আছি। এখানে টাকা দেবো কিভাবে?"

“এখন দিতে হবে সেটা বলছি না। আজকেই দিতে হবে।”

হামিদ আলম তাড়া দিয়ে বলল, “তুমি জলদি নিয়ে আসো। আজকেই পাবে। এ নিয়ে চিন্তা কোরো না।”

“ঠিক আছে, আমি আসছি।”

কলটা শেষ হতেই হামিদ আলম ভাবলো পাভেল তাকে যা বলেছে সেটা যদি ঠিক হয় তাহলে আজকের সন্ধ্যের মধ্যে তারা একটি ফাটাফাটি নিউজ করতে পারবে।

চ্যানেল সিক্সটিনের রিপোর্টার একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। বিজয়ীর ঔদ্ধত্য দেখা যাচ্ছে তার চোখেমুখে। হামিদ আলম তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

অধ্যায় ১৯

দিনে এই প্রথম পুলিশস্টেশনে এসেছে আবেদ আলী। অবশ্য হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টকে পুলিশস্টেশন বলা যায় কি না সেটা ভাববার বিষয়। তবে এটাও ঠিক, এরা পুলিশেরই লোক।

এর আগে স্বচক্ষে কোনো গোয়েন্দাকেও দেখেনি সে, ফলে ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগকে দেখে বুঝে উঠতে পারছে না এ দেশের সব গোয়েন্দা এই লোকের মতো হয় কি না।

মানানসই উচ্চতা আর হালকা পাতলা শরীরের একজন আপাদমস্তক ভদ্রলোক। চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত এবং গভীর। পোশাক-আশাক বেশ পরিপাটি। হাঁটাচলার মধ্যে প্রবল ব্যক্তিত্বের বহিপ্রকাশ স্পষ্ট চোখে পড়ে। দেখে মনে হয় নরম মনের একজন মানুষ। খুবই বন্ধুবৎসল। এখানে আসার পর আবেদ আলীর সাথে যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করছে সে। তার ব্যবহারের কল্যাণে আবেদ আলীর সমস্ত ভয় আর উদ্বিগ্নতা কিছুটা কমে এসেছে।

এই তরুণ ইনভেস্টিগেটর সন্দেহভাজনদেরকে আসামী হিসেবে দেখে না, এ ব্যাপারে আবেদ আলী নিশ্চিত। যেমনটা সব পুলিশ করে থাকে। পুলিশ যেমন সবাইকে চোর-ডাকাত ভাবে এই লোক সে রকম নয়।

তবে লোকটার নাম একটু অদ্ভুত। প্রথমে শুনে আবেদ আলী বুঝে উঠতে পারেনি। জেফরি বেগ! এটা আবার কেমন নাম? খৃস্টান হবে হয়তো।

তারা বসে আছে জেফরি বেগের অফিসে। আবেদ আলী এখানে এসেছে দশ মিনিট হলো। কিছুক্ষণ আগে জেফরি তাকে রেখে একটু বাইরে গেছে। এখন তার সামনে বসে আছে ইন্সপেক্টর জামান-যে লোক তাকে ফোন করেছিল এখানে আসার জন্য।

জামান কিছু বলছে না। চুপচাপ মোবাইলে কাকে যেন এসএমএস করে যাচ্ছে আর ফাঁকে ফাঁকে আবেদ আলীর দিকে তাকাচ্ছে। আবেদ আলীর কাছে মনে হচ্ছে সময় কাটানোর জন্যই সে এটা করছে।

জামানকে এসএমএস করতে দেখে মিলির কথা মনে পড়ে গেল তার। মোবাইলটা বের করে দেখল। যা ভেবেছিল তাই। মিলির বারো-তেরোটা এসএমএস জমে আছে। এখানে আসার আগে মোবাইলটা সাইলেন্স মুডে রেখে দিয়েছে সে তাই বিপগুলো শুনতে পায়নি। একটা এসএমএস ওপেন করল আবেদ আলী। ইংরেজি অক্ষরে বাংলায় লেখা এসএমএস।

কী হয়েছে বেবি? প্লিজ আমাকে বলো। আমি টেনশনে আছি। এনি প্রবলেম? এসএমএস করছো না কেন? অনলাইনেও নেই। প্লিজ আমাকে জানাও।

মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল আবেদ আলীর। মিলির এই বেশি বেশি কেয়ারিং তার কাছে ন্যাকামি বলে মনে হয় মাঝেমধ্যে। সে আছে মহা ঝামেলায় আর এই মেয়েটা...ছেচল্লিশ বছরের একজনকে মেয়ে বলা যায় কি না ভেবে হেসে ফেলল আবেদ আলী। আর কোনো মেসেজ ওপেন না করে মোবাইলটা পকেটে রেখে জামানকে বলল, "আমাকে এখানে কতোক্ষণ থাকতে হবে?"

মোবাইল থেকে মুখ সরিয়ে জামান তার দিকে তাকাল। "বেশিক্ষণ লাগবে না। স্যার আপনার সাথে বলবে, তারপরই আপনি চলে যেতে পারবেন। ভয় পাবার কিছু নেই।"

"না, না। ভয় পাবো কেন," বলল আবেদ আলী।

জামান তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে আবারো মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

প্রকাশক সাহেব হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে আসার পরপরই মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ জেফরিকে ডেকে পাঠিয়েছে। কারণটা জামান জানে : লেখক জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এক টিভি চ্যানেলে ইন্টারভিউ দেবে মহাপরিচালক, সেজন্যে জেফরির কাছ থেকে পুরো ঘটনাটা সংক্ষেপে জেনে নিচ্ছে।

খুব তাড়াহুড়ো করে জেফরি নিজের অফিসে ঢুকলে জামান তার মোবাইলটা সঙ্গে সঙ্গে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

"সরি," ছোট্ট করে বলে ডেস্কের অপর পাশে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল সে।

"না, না ঠিক আছে, আবেদ আলী কথাটা বললে জেফরি তার দিকে তাকিয়ে নীরব একটা হাসি দিল।

"আপনার সময় নষ্ট করবো না। কয়েকটা জরুরি প্রশ্ন করেই ছেড়ে দেবো।"

"বলুন। আমার যতোটুকু সাহায্য করার করবো," বলল আবেদ আলী।

"উমমম..." কি বলবে সেটা একটু গুছিয়ে নিলো জেফরি। "আপনি কখন জানতে পারলেন লেখক জায়েদ রেহমান খুন হয়েছেন?"

"সকাল দশটার দিকে হবে। টিভি নিউজে দেখেছি।"

"আমরা জানতে পেরেছি উনি মারা যাবার আগে, রাত ২টার কিছু পরে আপনাকে একটা মেইল করেছেন। সাথে আস্ত একটা বইয়ের পাণ্ডুলিপিসহ?"

"হ্যা। আজ সকালে সেটা পেয়েছি। খুবই অবাক হয়েছি আমি।"

"অবাক হয়েছেন! কেন?"

"কারণ দীর্ঘ দিন ধরে তার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। বলতে পারেন আমাদের সম্পর্কটা ভালো ছিল না।"

"তাই না কি," জেফরি একটু অবাক হলো। "আমি যতোদূর জেনেছি উনার অনেকগুলো বই আপনর প্রকাশনী থেকে বের হয়েছে।"

"হ্যাঁ। আগে আমার এখান থেকেই তার বই বের হোতো...দু'বছর ধরে আর বের হয় না।"

"কেন?"

"মৃতলোক সম্পর্কে খারাপ কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না। হাজার হোক এক সময় সে আমার খুব কাছের লোক ছিল।" একটু থেমে আবার বলতে লাগল সে, "জায়েদকে আমিই প্রথম সুযোগ করে দিয়েছিলাম। আমার এখান থেকেই তার প্রথম পঞ্চাশটি বই বের হয়েছে। এজন্যে আমার প্রতি কৃতজ্ঞও ছিল। দু'বছর আগে হঠাৎ করেই অন্য এক নতুন প্রকাশককে বই দিতে শুরু করে। ব্যাপারটা আমার জন্য খুব কষ্টের ছিল। শুধু মাত্র বেশি টাকা পাবার জন্যে সে এ কাজ করেছে। আমি অবশ্য তার কাছে কিছু জানতে চাইনি, সে-ও আমাকে কিছু বলেনি। এ ঘটনার পর থেকে তার সাথে আমার যোগাযোগ আস্তে আস্তে কমে আসে। এক পর্যায়ে আমাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়।" আবেদ আলী থেমে আশেপাশে তাকালে জেফরি ভুরু তুলে জানতে চাইলে সে বলল, "একটু পানি হবে?"

"শিওর, জেফরিকে কিছু বলতে হলো না, জামান উঠে গিয়ে ঘরের এককোণে রাখা পট থেকে এক গ্লাস পানি ঢেলে আবেদ আলীকে দিল।

"আপনি বলতে চাচ্ছেন বিগত দু'বছরে আপনাদের মধ্যে একদম যোগাযোগ ছিল না, আবেদ আলীর পানি খাওয়া শেষ হলে জেফরি জানতে চাইল।

"হ্যাঁ।"

"তাহলে কাল রাতে উনি কি মনে করে আপনার কাছে একটা জরুরি মেইল করলেন? সেই সাথে একটা নতুন বইয়ের পাণ্ডুলিপিসহ?"

"আমিও এটার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না। বিশ্বাস করুন, আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।"

"জায়েদ রেহমান কাল রাতে নিজের ঘরে খুন হয়েছেন। খুন হবার আগে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক আপনার কাছে একটা মেইল করলেন, সাথে আনকোড়া একটা বইয়ের

সফটকপি অ্যাটাচ করে। বিগত দু'বছর ধরে যে প্রকাশনা থেকে উনার বই বের হচ্ছে সেখানে না পাঠিয়ে আপনার কাছে পাঠালো...পুরো ব্যাপারটাই ঘোলাটে মনে হচ্ছে না আপনার কাছে?" জেফরি স্থির চোখে চেয়ে রইল আবেদ আলীর দিকে।

মাথা নেড়ে সায় দিল আবেদ আলী। "তা তো মনে হচ্ছেই।"

"ঝগড়া হবার আগে আপনাদের মধ্যে কেমন সম্পর্ক ছিল?"

"ঝগড়া? আমাদের মধ্যে তো সে রকম কিছু হয়নি," আবেদ আলী অনেকটা প্রতিবাদ করে বলল।

"আই মিন, কথাবার্তা বন্ধ হবার কথা বলছি," শুধরে দিয়ে বলল জেফরি।

"ভালো। খুব ভালো সম্পর্ক ছিল আমাদের মধ্যে। বয়সে আমরা প্রায় সমবয়সি ছিলাম। তার প্রথম বইটা আমার কারণেই বের হয়েছিল। তখন আমি আমাদের পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দিয়েছি মাত্র। আমার বাবা তার বই বের করতে রাজি ছিলেন না। এইসব ছেলেছোকরাদের বই বের করে কোনো লাভ হবে না বলে তিনি জায়েদকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু আমার খুব খারাপ লেগেছিল। সে চলে যেতে লাগলে আমি তাকে ডেকে নিই। বাবাকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে রাজি করাই। শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রকাশনী থেকেই তার প্রথম উপন্যাস বের হয়...সেই থেকে তার সাথে আমার বন্ধুত্ব।"

"তার মানে আপনাদের সম্পর্কটা অনেক দিনের?"

"হ্যাঁ প্রায় ছাব্বিশ বছরের মতো হবে।"

"এই ছাব্বিশ বছরের সম্পর্কটা শুধুমাত্র একটা বই না দেবার কারণে নষ্ট হয়ে গেল!"

আবেদ আলী কিছু বলল না, চুপ করে থাকল।

"আপনার সাথে মিসেস রেহমানের সম্পর্ক কেমন ছিল?"

"কোনুজনের কথা বলছেন?" জানতে চাইল আবেদ আলী।

"কোনজন মানে?" বুঝতে না পেরে বলল জেফরি।

"স্যার, জায়েদ রেহমান আগে আরেকবার বিয়ে করেছিলেন," আবেদ আলী কিছু বলার আগেই জামান ধরিয়ে দিল ব্যাপারটা।

ব্যাপারটা জেফরির মাথায়ই ছিল না। মনে মনে জিভ কাটল সে। তেমন কোনো প্রচেষ্টা ছাড়া অভাবিত সাফল্য পেয়ে গেলেও এই কেসটা নিয়ে যে খুব বেশি মনোযোগ দিচ্ছে না এটা তারই প্রমাণ। এটা ঠিক হচ্ছে না, মনে মনে ভাবলো জেফরি বেগ। বর্তমান স্ত্রীর কথা বলছি," বলল সে।

"তার সাথে আমার তেমন একটা সম্পর্ক ছিল না।"

আবেদ আলী দায়সারা গোছের জবাব দিলেও জেফরি সেটা ধরতে পারল। "তার মানে খারাপ ছিল?"

"ঠিক খারাপ বলবো না, বলতে পারেন তার সাথে আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না।"

"উনার দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ছিল?"

"নিজের মেয়ের বান্ধবীকে বিয়ে করবে কথাটা শুনে স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে আমি আপত্তি জয়েছিলাম। কিন্তু সে আমাদের কারো আপত্তি কানে দেয়নি। আমরাও এ নিয়ে তাকে আর কিছু বলিনি।"

"আর প্রথম স্ত্রীর সাথে?" বেগ বলল।

"সম্পর্কের কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ।"

"ভালো। জায়েদের সাথে আমার সম্পর্কটা যতো দিনের গ্যাটের সাথেও প্রায়

ততোদিনের সম্পর্ক।"

"..গ্যাট?" জেফরি ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল।

"সরি। গোলনূর আফরোজ তরফদার। সংক্ষেপে আমরা তাকে GAT বলে ডাকি।"

"আচ্ছা...মি. আলী, লেখক জায়েদ রেহমান আপনাকে মেইলে এমন কিছু কথা লিখেছেন যেগুলো আপনার কাছে লেখার কথা নয়। বিশেষ করে দু'বছর ধরে সম্পর্ক নেই এমন লোকের কাছে তিনি কেন এ রকম কথা লিখতে যাবেন?"

"এটা আমি নিজেও সারাটা সকাল ভেবেছি কিন্তু কোনো সদুত্তর পাইনি," আবেদ আলী গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল।

সে আসলে অনেক প্রশ্নের উত্তরই খুঁজে পাচ্ছে না। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের ফোন পাবার পর থেকেই এইসব প্রশ্ন তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে : কি করে এরা জায়েদ রেহমানের পাঠানো মেইলটার কথা জানতে পারল? সেই মেইলটাই বা কি করে পড়তে পারল কে জানে। এমন কি অ্যাটাচমেন্ট ফাইলটা সম্পর্কেও এরা জানে! কিন্তু কিভাবে?

খুব বেশি দিন হয়নি ইন্টারনেট আর ই-মেইলের জগতে প্রবেশ করেছে আবেদ আলী। এখনও অনেক কিছু সে জানে না। কেবল দরকারি কিছু বিষয় ছাড়া বলতে গেলে সে এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ একজন মানুষ।

প্রথম প্রথম বেশিরভাগ মেইল ব্যবহারকারীই জানে না সাইন-আউট না করে মেইল অ্যাকাউন্ট থেকে বের হলে যে কেউ সেটাতে ঢুকতে পারে। এরজন্য কোনো পাসওয়ার্ড লাগবে না, সরাসরি অ্যাকাউন্টটা ওপেন হয়ে যাবে। আর অ্যাকাউন্টের সেন্টবক্সে গেলেই দেখা যাবে পাঠানো মেইল আর অ্যাটাচমেন্টগুলো। ওখান থেকে মেইল ওপেন করা যাবে, অ্যাটাচমেন্ট ফাইলও নামিয়ে নেয়া যাবে অনায়াসে। পানির মতো সহজ কাজ। আর এই সহজ কাজটা করতে জেফরি বেগের লেগেছিল মাত্র পাঁচ মিনিট। সেন্টবক্সে লিস্ট থেকে কোনো কিছু ডিলিট না করলে সব কিছুরই রেকর্ড থেকে যায়। বেশিরভাগ ব্যবহারকারীর মতো লেখক জায়েদ রেহমানও সেন্টবক্সের আইটেম ডিলিট করতেন না।

"কি ভাবছেন?"

জেফরির প্রশ্নে সম্বিত ফিরে পেল আবেদ আলী। "না, তেমন কিছু না। ভাবছি জায়েদ তো একদমই নড়তে চড়তে পারতো না, তার উপর সে ছিল হার্টের রোগি। রাত দুটোর দিকে আমাকে মেইল করল? অতো রাতেও জেগেছিল সে, কম্পিউটার নিয়ে কাজ করছিল!"

যে প্রশ্ন একজন গোয়েন্দার মনে উদয় হওয়ার কথা সেটা কি না উদয় হলো একজন প্রকাশকের মনে! আবেদ আলীর কথাটা জেফরিকে মুহূর্তেই আলোড়িত করল।

তাই তো। লেখক জায়েদ রেহমান অতো রাতেও ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করছিলেন...!

জেফরি স্থির চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল আবেদ আলীর দিকে। তারপরই নিজের সহকারী জামানের দিকে ফিরল সে। "জামান!"

"জি, স্যার?"

"জায়েদ রেহমানের ঘরে তার ল্যাপটপটা ছিল কফি টেবিলের উপরে!"

বোকার মতো তাদের দু'জনের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকাল আবেদ আলী। সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

"জি, স্যার," বলল জামান।

"হ্যাঁ, কফি টেবিলেই ছিল। আমি ঘরে অনেকগুলো ছবি তুলেছিলাম।" যেন আপন মনে বলল কথাগুলো।

"জি, স্যার।"

জট পাকিয়ে থাকা মাথাটা যেন চট করেই খুলে গেল। আবারো নিজেকে ভর্ৎসনা করল কেসটা নিয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেনি বলে। এরজন্য নিজের বক্তিগত জীবনের একটি ঘটনাও যে দায়ি সেটা বুঝতে পারছে জেফরি। মানসিকভাবে সে পুরোপুরি স্থির নেই। ব্যাপারটা কেউ জানে না, কিন্তু জেফরির মানসিক অবস্থা আসলেই ভালো নেই। কোনোভাবেই তার ধীরস্থির আর বুদ্ধিদীপ্ত মাথাটা কাজ করছে না।

পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে ইমেজ ফোল্ডার থেকে আজ সকালে তোলা জায়েদ রেহমানের ঘরের ছবিগুলো দেখতে শুরু করল জেফরি বেগ।

ছবিগুলো ঘরের বিভিন্ন অংশের। মোট আটটা ছবি। পাঁচ নাম্বার ছবিটাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লেখকের বেডের পাশে কফি টেবিলের উপর ল্যাপটপটা খোলা অবস্থায় রয়েছে। এটা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তবে মারাত্মক একটি অসঙ্গতি আছে ছবিটাতে।

অসঙ্গতিটা অবশ্য সহজে চোখে পড়ার মতোও নয়, কিন্তু এখন এটা স্পষ্ট বলে দিচ্ছে ঘটনা অনেক বেশি জটিল।

মাই গড!

অধ্যায় ২০

দরজা জানালা বন্ধ একটা ঘরে টিভি চলছে। ঘরে আর কোনো বাতি জ্বলছে না। টিভির আলোতে ঘরের অন্ধকার কিছুটা হয়েছে, সেই আলো বদলে যাচ্ছে খুব দ্রুত। কখনও বেড়ে যাচ্ছে তো পরক্ষণেই হয়ে যাচ্ছে ম্রিয়মান। আসলে টিভি সেটটার চ্যানেল বদল করা হচ্ছে খুব দ্রুত। সবগুলো দেশি চ্যানেল একের পর এক যেন চক্রাকারে ফিরে আসছে। কোনো চ্যানেলই দশ সেকেন্ড বেশি স্থায়ী হচ্ছে না। কখনও কখনও সেটা দুই তিন সেকেন্ডও নেমে আসছে। এর ফলে আলো আর শব্দের এক ধরণের ছন্দময় দ্যোতনা সৃষ্টি হয়েছে ঘরের ভেতর।

...স্ত্রী আর তার প্রেমিককে গ্রেফতার করা হয়েছে... দেশের জনপ্রিয় লেখক জায়েদ রেহমান নিজ ঘরে খুন হয়েছেন...গতকাল রাতে স্বনামধন্য লেখক জায়েদ রেহমান... লেখকের বাড়ির সামনে হাজার হাজার ভক্ত...লেখকের তরুণী স্ত্রী আর তার প্রেমিককে... আমরা গভীর বেদনার সাথে জানাচ্ছি প্রখ্যাত লেখক...

সব চ্যানেলে একই খবর।

...হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট এখনও কোনো কিছু না জানালেও কিছুক্ষণ আগে নির্ভরযোগ্য এক সূত্রে জানা গেছে...

এই চ্যানেলটা আর বদলে গেল না।

...দুজন আসামী জিজ্ঞাসাবাদে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। তারা সরাসরি হত্যাকাণ্ডের সাথে নিজেদের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ আমাদের রিপোর্টারের কাছে এক সাক্ষাঙ্কারে জানিয়েছেন...

একটা হিংস্র চিতাবাঘ ছুটতে ছুটতে ঝাঁপিয়ে পড়ল পলায়ণরত হরিণ শাবকের উপর... নির্মমভাবে ঘাড় মটকে দিল সেটার...

টিভির পর্দায় অ্যানিমেল প্লানেট চ্যানেলটায় স্থিরে হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর ঘন অন্ধকার।

টিভিটা বন্ধ করে দেয়া হলে ঘরটা অন্ধকারে ঢেকে গেল মুহূর্তে। সেই সাথে গাঢ় নিস্তব্ধতা। কেবল একজন মানুষের নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এখন।

এই ঘরের একমাত্র ব্যক্তিটির ঠোঁটের কোণে যে তীর্যক হাসি ভেসে উঠল সেটা অন্ধকারের কারণে দেখা গেল না, শুধু বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ার কারণে মৃদু একটা শব্দ হলো।

অধ্যায় ২১

পাভেল আহমেদ বেশ ফুরফুরে মেজাজে আছে। অন্যান্য দিনের মতো পত্রিকা অফিসের বিরক্তিকর কেন্টিন কিংবা সস্তা হোটেলে লাঞ্চ না করে ধানমণ্ডির পিজ্জা হাটে চলে এসেছে সে। চিকেন গার্লিক পিজ্জা খাচ্ছে এখন।

ডান পকেটে হাত দিয়ে একটা জিনিস স্পর্শ করতেই মুচকি হাসল। তার পকেটে এখন পঁচিশ হাজার টাকা। মাত্র পঁচিশটা নোট!

কিছুক্ষণ আগে স্বদেশ টিভির হামিদ আলমের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে ছোট্ট একটা জিনিস বেঁচে দিয়েছে সে। অবশ্য পুরো টাকার অর্ধেক হাতে পেয়েছে, কালকের মধ্যে বাকিটা পেয়ে যাবে। তার আনন্দের আরেকটি কারণ হলো হামিদ আলমের কাছ থেকে সমস্ত তথ্য রেডিমেড নিয়ে নিয়েছে। তাকে আর কষ্ট করে সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে না।

একটা সুড়সুড়ি টের পেল পাভেল আহমেদ। মোবাইল ফোনটায় ভাইব্রেশনে দেয়া ছিল, বুক পকেট থেকে সেটা বের করে দেখল।

নিউজ এডিটর।

কি বলবে সব আগে থেকেই ঠিক করে রাখা আছে।

"এইমাত্র ওখান থেকে অফিসের দিকে রওনা দিয়েছি, ভাই," বলল পাভেল আহমেদ। "...হ্যাঁ, দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসতে পারবো...তেমন কোনো খবর নেই...না, পুলিশের কারোর সাথে কথা হয়নি...মুখ খুলছে না...জি, ভাই...আমি বরং লাঞ্চ করেই আসি... আচ্ছা...স্লামালাইকুম।"

ফোনটা পকেটে রেখে কোকের গ্লাসটা তুলে নিলো সে।

হামিদ আলমের কাছ থেকে মোটামোটি সব তথ্যই পেয়ে গেছে, এখন শুধু অফিসে গিয়ে আরাম করে টিভিতে ভারত-পাকিস্তানের ওয়ান ডে ম্যাচ দেখবে আর নিউজটা দাঁড় করাবে। আজ একটু আগেভাগে বের হয়ে যাবে অফিস থেকে। সাতটার দিকে হামিদ আলম তাকে গুলশানের লা ডিপ্লোম্যাট-এ আসতে বলেছে। অনেক দিন ধরে স্কটল্যান্ডের পানি খাওয়া হয় না। আজ আকণ্ঠ পান করবে কারণ বিলের চিন্তা তাকে করতে হবে না।

আবেদ আলী নিজের বাসায় ফিরে এসেছে। ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ জিজ্ঞাসাবাদের মাঝখানে হুট করে ক্ষান্ত দিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছে। শুধু বলেছে পরবর্তীতে তার সাথে আরো কথা বলবে, আর লেখক জায়েদ রেহমান যে তাকে মেইল করেছে সেটা যেন কাউকে না বলে।

ড্রইংরুমে বসে থাকলেও আবেদ আলী টিভি দেখছে না। টিভিতে ঐ এক খবরই চলছে সকাল থেকে। আবেদ আলী জানে এটা আরো দু'তিন দিন ধরে চলবে-কিংবা কে জানে আরো বেশিও হতে পারে।

ফেসবুকে যেতে ইচ্ছে করছে না তার। মিলিকে যে একটা এসএমএস করে আশ্বস্ত করবে, তার উদ্বিগ্নতা কমাবে সেটাও করতে ইচ্ছে করছে না। সে জানে মিলি এতো বেশি জানতে চাইবে যে অতিষ্ঠ করে তুলবে তাকে। মিলির এই একটি দিক তার ভালো লাগে না। সব জানতে চাইবে। না বললে অভিমান করে বলবে তুমি আমাকে ভালোবাসো না, আমাকে আপন মনে করো না, আমার কি জানার অধিকার নেই?' এ রকম কতো ন্যাকামি মার্কা কথা!

কিন্তু এখন কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না। আবেদ আলী জানে মিলি আরো অনেকগুলো এসএমএস করেছে এই সময়ে। আমি ভালো আছি। চিন্তা কোরো না। এক বন্ধু মারা গেছে। ব্যস্ত আছি। পরে জানাবো, এ রকম কিছু লিখে একটা এসএমএস করার জন্য অনিচ্ছায়

ফোনটা হাতে তুলে নিলো সে।

কিন্তু মোবাইলের ডিসপ্লেতে তাকিয়ে দেখল পাঁচটা মিস কল জমে আছে। হোমিসাইডে ঢোকার আগে সাইলেন্স মুডে রেখেছিল তাই কল হলেও বুঝতে পারেনি। কে কল করেছে সেটা দেখতেই আবেদ আলী সঙ্গে সঙ্গে কলব্যাক করল।

গ্যাট!

"হ্যাঁ, ভাবি?"

"আপনাকে অনেক বার ফোন দিয়েছি ধরেননি..." নারী কণ্ঠটা বলল।

"সরি, ভাবি। মোবাইলটা সাইলেন্স মুডে ছিল। খবরটা নিশ্চয় জানেন?"

"হ্যাঁ," মহিলা বেশ ধীরস্থিরভাবে বলল। তার মধ্যে শোকের লেশমাত্র নেই। "আমি জানতাম এ রকম কিছু একটা হবে।"

আবেদ আলী কোনো কথা বলল না। "ওইটার প্রেমিক তো অ্যাপার্টমেন্ট থেকে অ্যারেস্ট হয়েছে।"

"জি, ভাবি।"

"আপনাকে কেন হোমিসাইড ডেকে নিয়ে গিয়েছিল?"

আবেদ আলী ভিমড়ি খেলো। তার এই খবরটা গ্যাট জানল কী করে? আজব! "আপনি জানলেন কিভাবে?"

"হোমিসাইডে আমার এক খালাতো বোনের ছেলে কাজ করে। ওকে ফোন করলে কথা প্রসঙ্গে জানাল আপনাকে না কি ডেকে পাঠিয়েছে ওরা।"

"আর বলবেন না, কী যে সমস্যায় পড়েছি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"এতো মানুষ থাকতে আপনাকে কেন ডাকবে?" মহিলার কণ্ঠে সান্ত্বনার আভাস।

আবেদ আলী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোলনূর আফরোজ তরফদারকে মেইল আর অ্যাটাচমেন্ট ফাইলের কথাটা বলল, যদিও জেফরি বেগ তাকে বারণ করে দিয়েছিল।

"কী বলছেন?" গ্যাটের কণ্ঠে স্পষ্ট বিস্ময়।

আবেদ আলী নিশ্চুপ।

"খুন হবার আগে আপনাকে মেইল করেছে! মাই গড। মেইলে কি বলেছে? আপনার সাথে না তার কথাবার্তা পর্যন্ত হোতো না? তার একটা বইও দিয়েছে!" এক নাগাড়ে বলে গেল গ্যাট।

"আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না, ভাবি। পুলিশ তো আমাকেও সন্দেহ করছে এখন," আবেদ আলী বলল।

"সন্দেহ করলেই হলো? কাজটা করেছে ঐ হারামি। নিজের প্রেমিককে নিয়ে পরিকল্পনা করে খুন করেছে। সারা দেশের মানুষ জেনে গেছে। মামলা তো খুবই সোজা। খুনিদেরকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। এখন আবার আপনাকে নিয়ে টানাটানি করার কী আছে?"

"ঐ যে মেইলটা, ওটাই আমাকে বিপদে ফেলে দিয়েছে।"

"আচ্ছা, বললেন না তো ও আপনাকে মেইলে কি লিখেছে?"

একটু দ্বিধায় পড়ে গেল আবেদ আলী। জেফরি বেগের নিষেধের কথাটা স্মরণ করল সে।

"আমাকে বলতে সমস্যা আছে?" ওপাশ থেকে তাড়া দিয়ে বলল গ্যাট।

"না, ভাবি। আসলে হয়েছে কি, হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর মেইলের কথা কারো কাছে না বলার জন্য বলে দিয়েছে। আপনাকে যে বলছি সেটা কাউকে বলবেন না।"

"আরে আমি আবার কাকে বলতে যাবো! আপনি নিশ্চিন্তে বলতে পারেন।" মহিলা অভয়

দিল।

"আসলে বেশি কিছু লেখেনি। তোমাকে এই বইটা দিলাম। প্রকাশ কোরো। যতো বাধাই আসুক এটা প্রকাশ করবে। এখানে আমার সব কথা লেখা আছে। আর হয়তো তোমার সাথে দেখা হবে না। পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিও।"

জায়েদ রেহমানের মেইলটা আবেদ আলীর প্রায় মুখস্ত হয়ে গেছে। সেই সকাল থেকে মেইলটা পাবার পর কম করে হলেও দশ-বারো বার পড়েছে।

"ও তাহলে বুঝতে পারছিল কিছু একটা হবে?" প্রশ্ন করলেও গ্যাটের কথাটা প্রশ্নের মতো শোনালো না।

আবেদ আলী চুপ করে থাকল।

"আচ্ছা, বইটাতে কি বলেছে?"

"আমি তো সেটা এখনও পড়ে দেখিনি।"

"কী বলেন! এখনও পড়েই দেখেননি?" গ্যাট অবাক হয়ে বলল।

"কখন পড়বো, বলুন? মেইলটা পাবার পরই টিভি সংবাদে দেখলাম জায়েদ খুন হয়েছে...তার উপর হোমিসাইডে গিয়ে দেখা করতে বলল। এই তো কিছুক্ষণ আগে ফিরেছি ওখান থেকে।"

"ও আচ্ছা," বলল গ্যাট। "তাহলে এক কাজ করুন, পড়তে শুরু করে দিন। আমার মনে হয় বইয়ে অনেক কিছু আছে। আর শুনুন, দেরি না করে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বইটা বের করে ফেলুন। লক্ষ-লক্ষ কপি বিক্রি হবে।"

এতোটা সময় ধরে আবেদ আলী ভুলেই গেছিল মেইলটা শুধু তার জন্য বিড়ম্বনাই বয়ে আনেনি, সেই সাথে নিয়ে এসেছে বিশাল পরিমাণের লাভের সম্ভাবনা।

নড়েচড়ে বসল আবেদ আলী। "এই মুহূর্তে বইটা বের করলে আমার আবার কোনো সমস্যা হবে না তো?"

"আপনার কি সমস্যা হবে? কী যে বলেন না। সাহস রাখুন। আপনি তো আর এমনি এমনি বের করছেন না। ও খুন হবার আগে এটা আপনার কাছে মেইল করে গেছে, এর নিশ্চয় কারণ আছে। যতো যাই হোক না কেন, শেষে বুঝতে পেরেছে আপনিই হলেন একমাত্র সত্যিকারের বন্ধু। বাকিরা তো সব চামচার দল। ওকে বানিয়ে খেয়েছে। আপনাকে বইটা বের করার জন্য ওই তো বলেছে। বন্ধুর শেষ ইচ্ছেটা রাখবেন না?"

আবেদ আলী উদ্যম ফিরে পেল যেন। গ্যাট তো ঠিকই বলছে!

"আবেদ ভাই, বইটা কাকে উৎসর্গ করেছে, জানেন?" গোলনূর আফরোজ তরফদার জানতে চাইল।

"আমি তো এখনও পড়ে দেখিনি। অনেক বড় বই। পাঁচশ' পৃষ্ঠার বেশি হবে।"

"কী বলেন! আপনার তো কপাল খুলে গেল। কোটি টাকার ব্যবসা করবেন। জলদি দেখুন তো, কাকে উৎসর্গ করেছে? আমি লাইনেই আছি।"

আবেদ আলী বুঝতে পারছে না বইটার উৎসর্গ নিয়ে গ্যাট এতো আগ্রহ দেখাচ্ছে কেন।

কম্পিউটারটা চালু অবস্থাতেই ছিল, মোবাইলটা কানে চেপে চেয়ারে বসে সকালে ডাউনলোড করা ফাইলটা ওপেন করল আবেদ আলী। সে নিশ্চিত মেইলে কাকে উৎসর্গ করা হবে সে ব্যাপারে জায়েদ কিছু লেখেনি। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় করে লেখা : কথা।

দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম পৃষ্ঠা...

আবেদ আলী নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

উৎসর্গ–

গোলনূর আফরোজ তরফদার
যার প্রতি আমি সবচাইতে বেশি অবিচার করেছি।
...আমাকে ক্ষমা করে দিও

তার নিচে এক লাইনের আরেকটা কথা লেখা আছে। সেই লেখাটা পড়েও আবেদ আলী অবাক হলো।

"তবে আমি অবাক হচ্ছি না," আবেদ আলী জায়েদ রেহমানের উৎসর্গের কথাটা জানালে গোলনূর আফরোজ তরফদার ধীরস্থিরভাবে বলল কথাটা। "আমার প্রতি তো আর কম অবিচার করেনি! শেষের দিকে হয়তো বুঝতে পেরেছিল।"

"ভাবি..." আবেদ আলী ইতস্তত করে বলল।

"কি?"

"এই বইটার স্বত্ত্ব দিয়ে গেছে আপনাকে," আস্তে করে বলল অবয়ব প্রকাশনীর স্বত্ত্বাধিকারী।

মহিলা কিছু বলল না। একটু পর কণ্ঠটা নিচে নামিয়ে এনে শুধু বলল, "বিশ্বাস করেন আমি একটুও অবাক হইনি।"

অধ্যায় ২২

দীর্ঘ ত্রিশ বছরের কর্মজীবনে অনেকবারই পুলিশের মুখোমুখি হতে হয়েছে। আলাতুন্নেছাকে, তবে কোনো হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এই প্রথম। তারপরও মহিলা নিজেকে স্বাভাবিক রেখেছে। অন্তত বাইরে থেকে সে রকমই দেখাচ্ছে তাকে।

জেফরি বেগ আর ইন্সপেক্টর জামান ভিটা নুভায় এসে পৌঁছেছে দশ মিনিট হলো। বাড়ির সামনে লোকজনের যে ভিড় তারা দেখেছে সেটা অভাবনীয়। সেই ভিড় ঠেলেঠুলে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের একটি আনমার্ক করা গাড়িতে করে জেফরি আর জামান ভেতরে প্রবেশ করেছে অ্যাপার্টমেন্টে। ইচ্ছে করেই জেফরি আনমার্ক গাড়ি নিয়ে এসেছে। সে জানে সাংবাদিকের দল হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের গাড়ি দেখলে ঘেঁকে ধরবে।

জায়েদ রেহমানের বাড়িতে পুলিশের প্রহরা জোরদার করা হয়েছে মিসেস রেহমান আর তার প্রেমিককে গ্রেফতার করার পর থেকেই। বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দা বলতে হাউজনার্স আর দু'জন কাজের মহিলা। তাদের সবাইকে পুলিশ প্রহরায় রাখা হয়েছে ভিটা নুভায়। এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বিকেলের মধ্যেই।

আলাতুন্নেছা ড্রইংরুমে বসে আছে, তার সামনে আছে জেফরি বেগ আর জামান। এই হাউজনার্সই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে জায়েদ রেহমান খুন হয়েছেন।

"আপনি ঘরে ঢুকে কি দেখলেন সেটা বলুন?"

জেফরির প্রশ্নটা শুনে মহিলা কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। "এ কথা তো এর আগেও বলেছি।"

"হ্যাঁ, বলেছেন। আবার বলুন। একটা বিষয় পরিস্কার হওয়া দরকার, জেফরি যতোদূর সম্ভব নরম করে বলল। এই মহিলার কাছ থেকে সহযোগীতা পাবার দরকার আছে।

"ঘরে ঢুকে দেখি জায়েদ সাহেবের মুখে বালিশ চাপা দেয়া। এটা দেখেই চিৎকার দিয়ে উঠি..."

"হ্যাঁ, বলতে থাকুন, মহিলা থেমে গেলে জেফরি বলল।

"তারপর তো মিসেস রেহমান নিজের ঘর থেকে দৌড়ে এলেন। আমি উনাকে বালিশ সরাতে দেইনি। উনার নিস্তেজ শরীর দেখেই বুঝে গেছিলাম মারাত্মক একটা ঘটনা ঘটে গেছে। নিজেকে ধাতস্থ করে জায়েদ সাহেবের নাড়িস্পন্দন পরীক্ষা করে কনফার্ম হই উনি আর বেঁচে নেই। হাতটা একেবারে শক্ত হয়ে গেছিল। মনে হলো অনেক আগেই মারা গেছেন।"

"পুলিশ আসার আগে জায়েদ রেহমানের ঘরে সব কিছুই কি আগের মতো ছিল? কেউ কি কোনো কিছু সরিয়েছে?"

"কোনো কিছুই সরানো হয়নি। সরানোর কোনো উপায়ও ছিল না। কয়েক সেকেন্ডর মধ্যেই তো পুলিশ চলে এল। এরপর থেকে পুরো অ্যাপার্টমেন্টের দায়িত্ব চলে যায় পুলিশের কাছে।"

"আচ্ছা, উনি তো ল্যাপটপ ব্যবহার করতেন, তাই না? খুন হবার রাতে উনি কি সেটা ব্যবহার করেছিলেন?" এই প্রশ্নটার উত্তর জানা জেফরির জন্য খুবই জরুরি।

"হ্যাঁ।"

"কখন?"

"রাত এগারোটার দিকে উনার ঘরে গিয়ে দেখি ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করছেন। আমি তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়ে ল্যাপটপটা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে বললাম।"

"তারপর?"

"উনি বললেন, আপা ঘুম তো আসে না। আমাকে উনি আপা বলে ডাকতেন। আমি

বললাম, চেষ্টা করেন। আপনি হার্টের রোগি, এতো রাত পর্যন্ত জেগে থাকা ঠিক না। এ কথা বলার পর উনি আর কিছু বলেননি। তারপর আমি ল্যাপটপটা উনার কোল থেকে নিয়ে পাশের ছোট টেবিলে রেখে বিছানাটা সোজা করে বালিশ ঠিকঠাক করে তাকে শুইয়ে দেই।"

"আপনি নিজে ল্যাপটপটা রেখেছিলেন?" জেফরি জানতে চাইল।

"হ্যাঁ।"

"ওটা কি চালু অবস্থায় ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি কি ওটা বন্ধ করেননি?"

"ল্যাপটপ কিভাবে বন্ধ করতে হয় সেটা তো আমি জানি না। আমি ওটা উনার কোল থেকে নিয়ে টেবিলে রেখে দেই।"

"এরপর কি করলেন?"

"উনাকে শুইয়ে দিয়ে ঘরের সব জানালা বন্ধ করতে গেলে উনি বললেন দক্ষিণ দিকের বেলকনির স্লাইডিং ডোরটা যেন খোলা রাখি, পূর্ণিমার আলো যাতে ভেতরে আসতে পারে। তারপর আমি ঘরের বাতি বন্ধ করে দরজাটা ভিজিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে আসি।"

"আপনি চলে আসার পর কি তার ঘরে কেউ গিয়েছিল?"

"মনে হয় না। গেলেও আমি জানতে পারবো না। আমি তো বারোটার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

জামানের দিকে তাকাল জেফরি তারপর মহিলার দিকে ফিরে বলল, "ঠিক আছে, আপনি এখন যেতে পারেন। আমরা কোনো নির্দেশ না দেয়ার আগ পর্যন্ত আপাতত এই বাড়িতেই থাকবেন।"

"আমি আমার বাড়িতে যেতে চাচ্ছিলাম," মহিলা বলল।

"বিকেলের দিকে যেতে পারবেন। এখন এখানেই থাকতে হবে।"

মহিলা আর কিছু না বলে উঠে চলে গেল। "জায়েদ রেহমানের ঘরে চলো," জামানকে বলল জেফরি।

জায়েদ রেহমানের ঘরটা তালা মারা। দায়িত্বরত পুলিশ কনস্টেবলের কাছে থেকে চাবিটা নিয়ে তালা খুলল জামান।

জেফরি বেগ ঠিক যেভাবে দেখে গিয়েছিল সেভাবেই সবকিছু আছে। বিছানার পাশে কফি টেবিলটার দিকে তাকিয়ে আরেকবার নিশ্চিত হলো অসঙ্গতিটা খুবই ভয়াবহ।

জায়েদ রেহমানের হসপিটাল বেড থেকে কফি টেবিলটা কমপক্ষে ছয় ফিট দূরে। একজন পক্ষাঘাগ্রস্ত লোকের পক্ষে বিছানা থেকে কফি টেবিলটার নাগাল পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

তাহলে কি জায়েদ রেহমান নিজেই উঠে গিয়ে...

অসম্ভব!

জেফরি বেগ শুধু বুঝতে পারল একটা গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে সে। এ পর্যন্ত যা জেনেছে তার মধ্যে অনেক অসঙ্গতি রয়েছে।

অধ্যায় ২৩

“তোমার কথা শুনে তো কিছুই বুঝতে পারছি না,” ফারুক আহমেদ বলল বেগকে।

ভিটা নুভা থেকে জেফরি সোজা চলে এসেছে ফারুক আহমেদের অফিসে।

“স্যার, এই কেসে দুটো মারাত্মক অসঙ্গতি আছে,” বলতে শুরু করল বেগ। “পলিগ্রাফ টেস্টের ব্যাপারটা আর-”

“ওটা নিয়ে তুমি খামোখাই চিন্তা করছে, তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল ফারুক আহমেদ।

“ঠিক আছে। পলিগ্রাফ টেস্টের কথা না হয় বাদ দেয়া গেল...ল্যাপটপের ব্যাপারটা কি বলবেন? একজন প্যারালাইজড লোক কি করে নিজের বিছানা থেকে উঠে মাঝরাতে ল্যাপটপ থেকে মেইল করবে?”

ফারুক সাহেব চুপ মেরে রইল। তবে তার মধ্যে চিন্তা করার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, বরং কিছুটা বিরক্তি ফুটে উঠেছে চোখেমুখে।

“সব কিছুর ব্যাখ্যা এখনই পেয়ে যাবে এ রকমটি ভাবছো কেন? সময় এলে সব জানতে পারবে। ল্যাপটপের যে কথাটা বললে, আমার কাছে সেটাকে বড় কোনো অসঙ্গতি বলে মনে হচ্ছে না। সেটারও নিশ্চয় ব্যাখ্যা আছে। সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ব্যাপারটা জানা যাবে। এখনও তো প্রাইমারি অবস্থায় রয়েছে। এ রকম ছোটখাট দুয়েকটি অসঙ্গতির কারণে তো আমরা এক লাফে অন্য কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারি না। ভুলে যাচ্ছো কেন দু'জন খুনি ধরা পড়েছে হাতেনাতে।”

কথাটা মেনে নিলো বেগ। মহাপরিচালক ভুল বলেনি। সময়ে সব জানা যাবে।

“শুনলাম সকাল থেকে কিছু খাওনি। বাসায় চলে যাও। আজ আর অফিস করতে হবে না। রেস্ট নাও,” ফারুক আহমেদ বলল তাকে।

“স্যার, ভিটা নুভায় দু'জন কাজের মহিলা আর হাউজনার্স আছে পুলিশের প্রহরায়, তাদের কি হবে?”

“পুলিশ কাস্টডিতে রাখতে হবে। কিছু করার নেই।”

বেগও জানে এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল সে। “তাহলে আমি যাই, স্যার?”

“ওকে, মাই বয়। গেট রেস্ট,” কথাটা বলেই দাঁত বের করে হাসল ফারুক সাহেব।

বেগ যখন দরজার কাছে তখনই ফারুক সাহেব বলে উঠল, “থ্যাংকস ফর অল দিস।”

পেছনে ফিরে মুচকি হেসে চলে গেল জেফরি বেগ।

.

হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে জেফরি ভাবলো ভালো একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে নেবে। জামান ছেলেটাকেও সঙ্গে নেবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়নি। সারা রাত অনলাইন ডিউটি করে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। জেফরির মতো সেও সকাল থেকে কিছু খাওয়ার সুযোগ পায়নি। ছেলেটা বাড়ি চলে গেছে।

মোবাইলটা বিপ করে উঠলে পকেট থেকে সেটা বের করে দেখল জেফরি।

অজ্ঞাত একটি নাম্বার থেকে মেসেজ এসেছে। ওপেন করল মেসেজটা।

আই এম সরি

তিনটি ছোট্ট শব্দে একটি এসএমএস। নাম্বারটা অজ্ঞাত হলেও জেফরি জানে মেসেজটা কে পাঠিয়েছে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার ভেতর থেকে। গত দু'তিন ধরে তার ব্যক্তিগত জীবনে একটা ওলপালট ঘটে গেছে। কেউ জানে না। কাউকে বলার মতোও নয়।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। কোনো কাজেই মন বসাতে পারছে না। আজকের কেসটায় যতোটুকু সাফল্য এসেছে সেটা নেহায়েতই ঘটনাচক্রে। এখানে জেফরির তেমন ভূমিকা ছিল না। কথাটা আর কেউ না জানুক জেফরি নিজে সেটা ভালো করেই জানে।

আই এম সরি। এই ছোট্ট কথাটা দিয়ে কিভাবে সব কিছু মুছে ফেলা যাবে? প্রচণ্ড কষ্টে হেসে ফেলল সে।

তুমি না, রেবা, আমিই দুঃখিত। জেফরি বেগ হবার জন্য। তোমাকে....

আর কিছু ভাবতে পারল না সে। অনেক ঘটনা, অনেক স্মৃতি হুরমুর করে এসে ভিড় করল তার মধ্যে।

রেবা। তার একমাত্র ভালোবাসা। এখন জীবন থেকে ছিটকে পড়েছে। দু'দিন আগে কাবিন হয়ে গেছে রেবার। কিছু দিন পর হয়তো কানাডায় চলে যাবে প্রবাসী স্বামীর সাথে। তাদের দীর্ঘ দিনের সম্পর্কটা যে এভাবে, এতো দ্রুত শেষ হয়ে যাবে সেটা জেফরি কল্পনাও করতে পারেনি।

প্রায় এক বছর ধরেই একটা টানাপোড়েনের মধ্যে ছিল তাদের সম্পর্কটা কিন্তু জেফরির কেন জানি মনে হোতো শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হয়ে যাবে। কারণ তাদের এই সমস্যাটা নিজেদের তৈরি ছিল না। তাদের কোনো ভুলে সম্পর্কটা হুমকির মুখে পড়েনি। রেবার বাবা, জাঁদরেল আমলা আনজার হোসেন বাধা হয়ে দাঁড়ান। জেফরির এখনও সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে, লোকটার প্রতিটি কথা তাকে প্রতিনিয়ত খোঁচায়। তাকে অপমান করে। সে দিনের কথা এ জীবনে কখনও ভুলবে না। ভোলা সম্ভবও নয়।

ভার্জিনিয়া থেকে এফবিআইএ'র ট্রেনিং শেষে ফিরে এসেছে দেশে। রেবার জোরাজুরিতেই তার বাবার সাথে দেখা করতে রাজি হয় জেফরি। কুশল বিনিময়ের পরই ভদ্রলোক জানতে চাইলেন জেফরির বাবা-মায়ের কথা। এখানেই জেফরি এই পৃথিবীতে সবচেয়ে নীরব। অসহায়।

"আমি ফাদার জেফরি হোবার্টের কাছে মানুষ হয়েছি," বলেছিল জেফরি। "উনি আর এখন বেঁচে নেই।"

"আচ্ছা," চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আনজার হোসেন বললেন, "তো উনি তোমাকে কিভাবে পেলেন? আই মিন উনার সাথে তোমার কানেকশানটা কিভাবে হলো?"

এই পৃথিবীতে যতো অপ্রিয় বিষয় আছে এটা হলো জেফরির কাছে সবচাইতে অপ্রিয়তম। কিন্তু কিছু করার নেই। একান্ত অনিচ্ছায় জেফরিকে বলতে হলো সেটা। উনি আমাকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছিলেন।"

আনজার সাহেব স্থির চোখে চেয়ে রইলেন। জেফরি টের পেল তার নিজের নিশ্বাস বেড়ে যাচ্ছে। একটা সুতীব্র অস্বস্তি জমাট বেঁধে যাচ্ছে বুকের ভেতর।

"রাস্তা থেকে...তখন তোমার বয়স কতো ছিল?"

'সাত-আট মাস।"

"আর তোমার বাবা-মা?"

"উনারা..." গলায় একটা গিট পাকিয়ে এল, তারপরও জোর করে বলল, "...উনারা ৭৪-এ মারা গেছিলেন।"

"৭৪-এ?"

"হ্যাঁ।"

আনজার সাহেব স্থিরচোখে চোখে চেয়ে রইলেন। "আমার মেয়ে অবশ্য আমাকে এসব

কথা বলেছে কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি," কথাটা নিজের মেয়ে রেবার দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। রেবা মাথা নিচু করে রেখেছিল কথাটা শুনে অবিশ্বাসে তাকাল বাবার দিকে।

"আপনার কথাটা বুঝলাম না?" বলল জেফরি বেগ।

আনজার সাহেব নিজের মেয়েকে বাড়ির ভেতরে যেতে বললে রেবা চুপচাপ চলে গেল। এটা জেফরির কাছে খুব বিস্ময়ের মনে হয়েছিল। কারণ রেবা খুবই দৃঢ়চেতা মেয়ে।

"এমনও তো হতে পারে," কথাটা বলে আনজার সাহেব দরজার দিকে তাকালেন, নিশ্চিত হলেন রেবা ঘর থেকে চলে গেছে কি না। "তোমার মা তোমাকে ফেলে চলে গেছেন?"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?" অবিশ্বাসে জেফরি বলল। 'অবৈধ সন্তান ফেলে দেয়াটা তো বিরল কোনো ঘটনা নয়।"

নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না জেফরি বেগ। এ জীবনে অনেক অপ্রিয় কথা সে শুনেছে কিন্তু কেউ কখনও তার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে এমন নোংরা আর কুৎসিত কথা বলেনি। জেফরির বিশ্বাস হচ্ছে না তার সামনে বসে থাকা লোকটি দেশের একজন উচ্চপদস্থ আমলা। সুশিক্ষিতও বটে।

"বড় বড় কথা অনেকেই বলতে পারে আমি সেরকম কিছু বলবো না। সমাজে আমার একটা অবস্থান আছে। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছে ব্যাপারটা।" আনজার সাহেব কাটাকাটাভাবে বললেন।

"বুঝতে পারছি।"

"তোমাকে নিয়ে অনেক সমস্যা। একে তো তোমার কোনো জন্মপরিচয় নেই, তার উপর একজন খৃস্টান ফাদারের কাছে মানুষ হয়েছে। লোকজনকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যাই করতে পারবো না।"

"আপনার মেয়ে কিন্তু আমার সব কিছু জেনেই-"

জেফরির কথার মাঝখানে হাত তুলে বাধা দিলেন আনজার সাহেব। গম্ভীরভাবে বললেন, "সব জানে না। তুমি যা বলেছো কেবল তাই জানে, আর আমার সহজ সরল মেয়ে সেসব কথা বিশ্বাস করে নিয়েছে।"

জেফরি ভুরু কুঁচকে অবিশ্বাসে চেয়ে রইল আনজার সাহেবের দিকে। "আপনি বলতে চাচ্ছেন আমি আপনার মেয়েক মিথ্যে বলেছি?"

"না, না," সঙ্গে সঙ্গে বললেন আনজার হোসেন। "তুমি বলতে যাবে। কেন। তুমি যে কাহিনীটা বললে সেটা নিশ্চয় ফাদার তোমাকে বলেছে?"

বেগ মাথা নেড়ে সায় দিল।

"আমার ধারণা ফাদার তোমার কাছে একটা বানোয়াট গল্প বলেছেন। উনি জানতেন আসল সত্যটা বললে তুমি সহ্য করতে পারবে না।"

অনেকক্ষণ ধরে জেফরি বাকরুদ্ধ হয়ে থাকল। এ জীবনে নিজের মা'র সম্পর্কে এই প্রথম এতো বাজে কথা শুনতে পেল সে। তার কল্পনায় তার মা

এমন একজন অসহায় নারী যে কি না ক্ষুধার যন্ত্রণায় মরে গেছে কিন্তু নিজের সন্তানকে মরতে দেয়নি। তার অল্পবয়সি মা তার কাছে চিরদুঃখি। কিন্তু এখন এসব কী শুনছে! তার কল্পনার মায়ের ছবিটা এই ভদ্রলোক এক হলকায় বিকৃত করে দিয়েছে। জেফরি টের পেল তার হাত-পা রীতিমতো অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

"কোথায় যাচ্ছো?" হঠাৎ করে জেফরি উঠে দরজার দিকে পা বাড়ালে আনজার সাহেব বললেন।

দরজার কাছে গিয়ে থামল সে। "আমার মনে হয় আপনার সাথে আর কথা বলার কোনো

দরকার নেই...”।

“সত্য সব সময়ই—”

জেফরি হাত তুলে কথার মাঝখানেই থামিয়ে দিল। “আপনি আপনার মনগড়া সত্য নিয়ে থাকুন। আর আমাকে আমার সত্য নিয়ে থাকতে দিন।”

এরপর আনজার সাহেব পেছন থেকে কিছু বললেও জেফরির কানে সেসব পৌঁছায়নি। একটা ঘোরের মধ্যে ঘর থেকে বের হয়ে যায় সে। কততক্ষণ পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিল সেটা তার মনে নেই। তবে রাতে বাড়ি ফিরে এক ফোঁটাও ঘুমাতে পারেনি।

পরের দিনই রেবার সাথে জেফরির দেখা হয়।

“তুমি ওভাবে চলে এলে কেন? কি হয়েছিল?” রেবা জানতে চেয়েছিল তার কাছে।

“কেন, তুমি জানো না?” পাল্টা বলল জেফরি।

“না!?”

চুপ করে রইল সে। অনেকক্ষণ পর বলল, “আমার মনে হয় তোমার বাবা আমাদের বিয়েতে রাজি না। উনি আমাকে মেনে নিতে পারছেন না।”

“আমি ভেবেছিলাম তোমাকে দেখার পর, তোমার সাথে কথা বলার পর উনি হয়তো রাজি হয়ে যাবেন,” মুখ ভার করে বলল রেবা। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “এখন আমি কি করবো, জেফ?”

সুতীব্র যন্ত্রণায় অবাক হয়ে বেগ চেয়ে থাকল রেবার দিকে। “আমি জানি না।”

জেফরির হাতে হাত রেখে রেবা তাকে আশ্বস্ত করল। “একটু সময় দাও। আমি সব ঠিক করে ফেলবো। আমার মনে হয় কিছু দিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে।”

রেবা খুব জোর দিয়ে বললেও সেদিনের পর থেকে আর কোনো কিছুই ঠিক হয়নি। নিজের বাব-মা, পরিবার না কি একজন জেফরি বেগ-এই দ্বন্দ্বে পড়ে যায় সে। জেফরি বুঝতে পারে সে হেরে যাচ্ছে। দিনের পর দিন তাদের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। কমে আসতে থাকে যোগাযোগ। আস্তে আস্তে রেবা নামের মেয়েটি, যার সাথে দীর্ঘ পাঁচ বছরের সম্পর্ক, জেফরির কাছ থেকে চিরকালের জন্যেই দূরে চলে যায়। দু'দিন আগে হঠাৎ রেবার কাছ থেকে একটা এসএমএস পায় সে। নিজের মুখে হয়তো বলার মতো সাহস অর্জন করতে পারেনি, তাই এসএমএস'র সাহায্যে জানায় আগামীকাল তার কাবিন। তাকে যেন জেফরি ক্ষমা করে দেয়।

খবরটা পাওয়ার পর থেকে জেফরির ভেতরে ভেতরে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে সেটা কেউ জানে না। নিজের ভেতর লুকিয়ে রেখেছে সে। কিন্তু কাজেকর্মে কোনোভাবেই মন বসাতে পারছে না।

এমন একটা কারণে সে রেবাকে হারিয়েছে যেটার জন্য সে নিজে দায়ি নয়। ইচ্ছে করলেও সে এসব কিছু মুছে ফেলতে পারে না।

খুব কাছে একটা রেস্তোরাঁ থেকে চিকেন গ্রিলের সুস্বাদু ঘ্রাণ তার ভাবনায় ছেদ ঘটালেও কোনো কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না এখন। তিক্ত আর করুণ একটা স্মৃতি এসে ভর করেছে তার মাঝে। যে স্মৃতি প্রথম ধাক্কাতেই ক্ষুধা নামক জিনিসটাকে তাড়িয়ে দেয়।

জেফরি বেগ দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল রেস্তোরাঁটা পাশ কাটিয়ে।

অধ্যায় ২৪

১৯৭৪ সাল এ দেশের জন্যে একটি স্মরণীয় বছর হয়ে থাকবে। স্বাধীনতার পর পরই যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। কতো লক্ষ লোক সেই দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছিল সেই হিসেব কারো কাছে নেই। তবে অনুমাণ করা যায় সংখ্যাটা নেহায়েত কম হবে না।

দলে দলে লোক ছুটে আসতে থাকে ঢাকা শহরে। ছোট্ট এই শহর এতো মানুষের ভার সইতে পারেনি। অনেককে ঠাই দিতে পারলেও অসংখ্য মানুষ ঝরে যায় অকালে। খাদ্যের অভাবে ভিক্ষার জন্য হাত পাততে দ্বিধা করেনি এক সময়কার সচ্ছল পরিবারের লোকজনেরাও। ভাতের অভাবে ভাতের মাড় হয়ে ওঠে অনেকের কাছে বিকল্প খাদ্য।

শহরের পথেঘাটে হাজার হাজার নরনারীর কঙ্কালসার দেহ এখনও বন্দি হয়ে আছে সেই সময় তোলা অসংখ্য স্থিরচিত্রে আর মানুষের স্মৃতিতে। রাস্তায় নামলেই মানুষের হাহাকার টের পাওয়া যেতো।

ফাদার জেফরি হোবার্ট একজন ধর্মপ্রাণ খৃস্টান পাদ্রী। পয়ষট্টি সাল থেকে এই ঢাকা শহরে আছেন। একাত্তরের যুদ্ধ দেখেছেন, আর এখন দেখছেন দুর্ভিক্ষ। এ দেশের অভাগা মানুষের জন্যে তার হৃদয়টা ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। কিন্তু তিনি একা একজন মানুষ কতোটুকুই বা করতে পারেন।

ফাদার জেফরি হোবার্ট যাজকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পুরনো ঢাকার প্রসিদ্ধ সেন্ট গ্রেগরি হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবেও কাজ করেন। প্রথম দিকে শিক্ষকতাকে শখের বিষয় হিসেবে নিলেও এখন এটাই হয়ে উঠেছে তার প্রধান মিশন। শিক্ষা দিয়ে মানুষের সেবা করাকে তিনি মনে করেন শ্রেষ্ঠ কাজ। সুতরাং যাজকের কাজের চেয়ে এটাকে তিনি কোনো অংশেই ছোট করে দেখেন না।

চিরকুমার জেফরি হোবার্ট আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসের বাসিন্দা-কেনেডিদের নেটিভ ল্যান্ড। আমেরিকার একমাত্র ক্যাথলিক সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য এটি। বাবা-মা বেশ সচ্ছল হবার পরও মানুষের সেবা করবেন বলে যাজকের পেশা বেছে নিয়েছিলেন। এখনও তার দেশে যে সম্পদ রয়েছে তা দিয়ে বাকি জীবনটা আরামে কাটিয়ে দিতে পারেন কিন্তু তিনি চান এইসব গরীব মানুষগুলোর জন্য কিছু করতে। দুর্ভিক্ষ তাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। কাজে মন দিতে পারেন না। নাখাভুখা মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকালে তার বুকটা হু হু করে ওঠে! মাত্র কয়েক বছর আগেই তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু করিম বেগ স্বাধীনতা যুদ্ধে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। অসংখ্য শহীদের কাতারে চলে গেছে সে। প্রিয় বন্ধুকে হারানোটা ছিল তার জন্যে চরম বেদনার একটি ঘটনা।

তার এই বন্ধুটি আট বছরের এক ছেলে সন্তান রেখে গেছে। এখন যার বয়স এগারো। তারই স্কুলে পড়াশোনা করে। দুদিন হলো ছেলেটা স্কুলে আসছে না। ফাদার ঠিক করলেন স্কুল ছুটির পর কিছু কাজ সেরে বিকেলের দিকে ছেলেটার বাড়িতে যাবেন।

নিজের প্রিয় বাহন সাইকেলটা নিয়ে হেলেদুলে পুরনো ঢাকার অলিগলি দিয়ে খুব দ্রুত পৌঁছে গেলেন রামকৃষ্ণ মিশন রোডে। তার বন্ধুর বাড়ি কমলাপুর রেলস্টেশনের পরেই।

যাবার সময় দেখতে পেলেন রেললাইনের দু'পাশে অসংখ্য কঙ্কালসার মানুষ শুয়ে-বসে আছে। দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র। কিছুক্ষণ থেমে দৃশ্যটা দেখলেন ফাদার। অসহ্য লাগল তার কাছে।

এক হাড্ডিসার মহিলা, বয়স বড়জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে, রেললাইনের একপাশে চটের উপর পড়ে আছে। কিন্তু ফাদারের দৃষ্টি আটকে রইল মহিলার পাশে ফুটফুটে এক বাচ্চার

দিকে। সাত-আট মাস বয়সি একটা বাচ্চা ছেলে। সদ্য জন্ম নিয়েই এমন এক ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে সে। ছেলেটার পাঁজরের হাঁড় বের হতে শুরু করেছে। দুর্ভিক্ষের ছোবল থেকে সেও যে রেহাই পাবে না ফাদার সেটা ভালো করেই জানেন। বাচ্চাটার মায়ের অবস্থা খুবই নাজুক। জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বের হতে চাচ্ছে। ফাদার জেফরি হোবার্ট আর সহ্য করতে পারলেন না। সাইকেল চালিয়ে চলে গেলেন রেললাইনের ওপারে।

বন্ধুর বাড়ি গিয়ে জানতে পারলেন ঘটনা তেমন গুরুতর নয়, বন্ধুর ছেলে জ্বরের কারণে স্কুল যেতে পারেনি। যাহোক ছেলেটার পাশে কিছুক্ষণ বসে ছেলের মায়ের সাথে গল্পগুজব করে রওনা হলেন নিজের স্কুলের দিকে-ওখানেই তিনি থাকেন।

রেললাইনের কাছে আসতেই হঠাৎ কী যেন মনে করে থামলেন তিনি। একটু আগে এখান দিয়ে যাবার সময় বাচ্চাসহ যে মহিলাকে দেখেছিলেন তার খোঁজ করতেই দেখতে পেলেন মহিলার অসাড় দেহের সামনে এক হ্যাংলা-পাতলা যুবক দাঁড়িয়ে আছে। মুখে চাপ দাড়ি, কাঁধ পর্যন্ত চুল। হালফ্যাশনের বেলবটমের ফুলপ্যান্ট পরা যুবকটি যে কিছু দিন আগে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল সেটা বুঝতে পারলেন তিনি। বেশিরভাগ যুবা মুক্তিযোদ্ধাই যুদ্ধ শেষে মুখে দাড়ি রেখে দিয়েছে। এদেরকে দেখলেই চেনা যায়।

যুবকটির চোখেমুখে প্রচণ্ড ক্রোধ দেখে ফাদার হোবার্ট নিজের সাইকেলটা নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

ফাদারকে দেখে যুবকটি লাল টকটকে চোখে তাকাল। মুখে কিছু না বললেও ফাদার জেফরি হোবার্ট বুঝতে পারলেন বাচ্চাটার মা আর বেঁচে নেই। নীরবনিথর মায়ের দেহের পাশে ফুটফুটে বাচ্চাটা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে আর আপন মনে দু'পা শূন্যে লাথি মেরে যাচ্ছে। অবোধ শিশু জানে না এতিম হয়ে গেছে সে।

"ওর বাবা কোথায়?" ইংরেজি টানে স্পষ্ট বাংলায় বললেন ফাদার। দীর্ঘদিন এদেশে থাকার কারণে বেশ ভালোই রপ্ত করে ফেলেছেন ভাষাটি।

"কেঠায় জানে!" যুবকটি রেগেই বলল। স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় বললেও ফাদারের বুঝতে অসুবিধা হলো না।

"এখন ওর কি হবে?" জেফরি হোবার্ট উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন।

"জানি না! কিছু জানি না," যেন কারোর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ঝারছে এমনভাবে বলল যুবকটি। "হালায় এইসব দ্যাহনের লাইগ্যা দ্যাশ স্বাধীন করছিলাম না কি!"

ফাদার রাগি যুবকটির কাঁধে আলতো করে হাত রাখলে যুবক ঘুরে তাকাল তার দিকে। ক্রোধ ছাপিয়ে এখন দু'চোখ ভরে অশ্রু ছলছল করছে।

অবোধ শিশুটির দিকে তাকিয়ে ফাদার জেফরি হোবার্টের বুকটা হাহাকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কোলে তুলে নিলেন বাচ্চাটাকে।

"আমি একে নিয়ে যাবো?" কম্পিত কণ্ঠে ফাদার বললেন।

যুবক ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ফাদারের দিকে। "নিয়া যান, ফাদার। অন্তত একজন রে বাঁচান। আমার নিজের তো কোনো চালচুলা নাই। আমি তো এরে পালতে পারুম না।" কথাটা বলেই দু'চোখ মুছে যুবকটি হনহন করে চলে গেল।

রাগি সেই যুবক টুকটাক গানবাজনা করতো, এই ঘটনাটি নিয়ে সেদিন রাতেই একটা গান লিখে ফেলল সে আর ফাদার জেফরি হোবার্ট নিজের ঘরে ফিরে এলেন জীবনের আরেকটি মিশন শুরু করার জন্য।

স্কুল কম্পাউন্ডে ফাদারের বাসায় ঠাঁই পেল ছেলেটি। বেচে গেল দুর্ভিক্ষের ছোবল

থেকে। ছেলেটিকে ফাদার জনি বয় নামে ডাকতেন, কিন্তু স্কুলে ভর্তি করার সময় যখন এল তখন একটা নাম রাখার প্রয়োজন দেখা দিল। অনেক ভেবেও ফাদার কোনো নাম ঠিক করতে না পেরে অবশেষে নাম রাখলেন নিজের প্রথম নাম জেফরি। কিন্তু একজন মুসলিম ছেলের নাম শুধু জেফরি হবে সেটা যেন ফাদারের মনোপুত হলো না; অগত্যা নিজের প্রিয় বন্ধুর টাইটেল বেগ মিলিয়ে নাম রাখলেন জেফরি বেগ।

অধ্যায় ২৫

সিদ্দিকী সাহেব নিজের অফিস থেকে আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছেন। সাধারণত অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায় তার। কাজ শেষে প্রতিদিনই ঢাকা ক্লাবে যান। তার সামাজিক জীবন বলতে এখন এই ক্লাব জীবনটাই। কিন্তু আজ তিনি ক্লাবে যেতে পারবেন না। সত্যি বলতে কি, আগামী দুদিন তিনি যেতে পারবেন না ওখানে। তাতে অবশ্য তার মনে কোনো আফসোস নেই, বরং বিরাট একটা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়াতে বেশ নির্ভার লাগছে।

কী যে ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলেন, ভাবাই যায় না।

লেখক জায়েদ রেহমান যখন নিজঘরে খুন হয়েছেন তার ছেলে কি না তখন লেখকের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল? শুধু কি তাই! পুলিশের কাছে ধরা পড়ে থানা-হাজতে পর্যন্ত যেতে হয়েছে তাকে। সিদ্দিকী সাহেব খুব দ্রুত থানা থেকে তাকে ছাড়িয়ে না আনলে কী যে হোতো ভাবতেই গা শিউড়ে ওঠে তার।

কিন্তু থানা থেকে শুধু ছাড়িয়ে আনলেই যে ঝামেলা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না সেটা সিদ্দিকী সাহেব ভালো করেই জানতেন, সেজন্যই স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দিয়ে থানার রেকর্ড থেকে ছেলের গ্রেফতার হওয়ার প্রমাণ যেমন রাখেননি সেই সঙ্গে যে পুলিশ অফিসার তাকে গ্রেফতার করেছিল তার মুখও বন্ধ করার ব্যবস্থা নিয়েছেন। অবশ্য কাজটা করতে তাকে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। তবে আরেকটু দেরি করলেই সব ওলটপালট হয়ে যেতো।

ধানমণ্ডি থানার ইন্সপেক্টর এলাহী নেওয়াজ ভালোমতোই সব সামলেছেন। সিদ্দিকী সাহেব এজন্যে তার উপর খুবই খুশি। লোকটা খুব কাজের। তার কথা তিনি মনে রাখবেন।

অমূল্য বাবু আবারো অসাধ্য সাধন করেছে, নিজের কারিশমা দেখিয়ে লোকটা সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে জাদুর মতো। সিদ্দিকী সাহেবের মতো ক্ষমতাধর ব্যক্তিও অমূল্য বাবুর ক্ষমতায় মুগ্ধ।

শাওয়ার থেকে বের হয়ে এক পেগ হুইস্কি খেয়ে নিলেন তিনি। ব্যাগট্যাক সব গুছিয়ে রাখা হয়েছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তার ফ্লাইট। ঢাকা থেকে বোম্বাই।

ঘড়িতে সময় দেখলেন চৌধুরি ইমরান আহমেদ সিদ্দিকী। চারটা। সাড়ে চারটায় বিমানবন্দরের দিকে রওনা দেবেন তিনি। হাতে এখনও আধঘণ্টা সময় আছে। ড্রইংরুমের সোফায় বসে টিভিটা ছেড়ে দিলেন।

সব চ্যানেলে একটাই খবর : জনপ্রিয় লেখক জায়েদ রেহমান খুন হয়েছেন।

অন্য কোনো চ্যানেলে না গিয়ে স্বদেশ টিভি নামের একটি চ্যানেলে সুইচ করলেন খবর দেখার জন্য। এই চ্যানেলটি তার কাছে বিশেষ প্রিয় হবার কারণ খুবই সহজ সরল : চ্যানেলটির পঞ্চান্ন শতাংশ মালিকানা তার নিজের। তার মানে তিনিই এই চ্যানেলের সর্বেসর্বা।

এ সময় তার মোবাইল ফোনটা বিপ্ করে উঠলে একটু বিরক্তই হলেন তিনি। ডিসপ্লেতে নাম্বারটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে কল রিসিভ করলেন।

"হ্যাঁ, কি হয়েছে?" বললেন সি ই এ সিদ্দিকী।

“স্যার, একটা জরুরি প্রয়োজনে ফোন করলাম। খুবই জরুরি,” ওপাশ থেকে সিদ্দিকী সাহেবের সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজার রাইসুল আনাম শিকদার উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল।

“তুমি জানো না একটু পরই আমার ফ্লাইট,” সিদ্দিকী সাহেবের কণ্ঠে বিরক্তি। “যা বলার সংক্ষেপে বলো।”

“সরি, স্যার। স্বদেশ টিভির মহাপরিচালক ইকরাম সাহেব ফোন দিয়েছিলেন...” ম্যানেজার বলল।

“কি হয়েছে!”

“...উনি আপনার সাথে সরাসরি কথা বলতে চাচ্ছেন। আমি উনাকে বলেছি একটু পরই আপনার ফ্লাইট আছে তারপরও ভদ্রলোক চাপাচাপি করলেন। তবে আপনি যদি বলেন আমি নিজেই কথা বলতে পারি?”

একটু ভাবলেন সিদ্দিকী সাহেব। “আচ্ছা, এক্ষুণি ফোন করতে বলো। আমার হাতে বেশি সময় নেই।”

ম্যানেজারের সাথে কথা শেষ হবার মিনিটখানেক পরই স্বদেশ টিভির মহাপরিচালক ইকরাম সাহেবের কাছ থেকে একটা কল পেলেন সিদ্দিকী সাহেব। ভদ্রলোক খুব বেশি সময় নিলেন না, সংক্ষেপে যা বললেন তাতে করে সিদ্দিকী সাহেবের কপালে বেশ কয়েকটি ভাঁজ পড়ে গেল।

নতুন একটা সমস্যার আর্বিভাব হলেও এ যাত্রায় অনেকটা ভাগ্যের জোরেই সিদ্দিকী সাহেব পার পেয়ে গেছেন। তাকে কিছু করতে হয়নি। যা করার স্বদেশ টিভির মহাপরিচালকই করেছেন। লোকটার কাণ্ডজ্ঞানের প্রশংসা করলেন মনে মনে। এই কাজের পুরস্কার তাকে দেয়া হবে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন সাড়ে চারটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। উঠে দাঁড়ালেন। সময় হয়েছে রওনা দেবার।

অধ্যায় ২৬

লেখক জায়েদ রেহমানের হত্যাকান্ত্রে দিনটি যদি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার হয়ে থাকে তাহলে পরের দিনটি নিঃসন্দেহে প্রিন্ট মিডিয়ার।

সবগুলো জাতীয় দৈনিকে ব্যানার হেডলাইনে ঠাঁই পেল এই প্রখ্যাত লেখকের হত্যাকাণ্ডের খবর। একেকজন একেকভাবে তুলে ধরল জায়েদ রেহমানের ঘটনাটি। সবার মধ্যেই একটা প্রবণতা ছিল-গতকাল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় যেসব খবর বের হয়েছে তারচেয়ে ভিন্ন কিছু দিতে হবে। এরফলে লেখকের হত্যাকাণ্ডের চেয়ে বেশি জায়গা বরাদ্দ পেয়েছে তার তরুণী স্ত্রীর পরকীয়া প্রেম আর লেখকের বিতর্কিত জীবনের ঘটনাগুলো।

তবে এদের মধ্যে আসমান-জমিন পত্রিকাটি লেখকের প্রেম ও যৌন জীবন নিয়েই বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। তারা কতোগুলো ফিচার রিপোর্ট ছেপেছে যার অনেকগুলোই সত্য।

জেফরি বেগ সকালে ঘুম থেকে উঠে যথারীতি জগিং করে নিজের ঘরে ফিরে এসে দুটো দৈনিক পত্রিকা পড়ে ফেলেছে। একটা পত্রিকার ছোট্ট একটা বক্স আইটেমের দিকে তার দৃষ্টি গেল।

তার একটা পুরনো ছবি দিয়ে এক কলামের একটা রিপোর্ট ছেপেছে তারা। শিনেরানাম দিয়েছে : একজন জেফরি বেগ...

মুচকি হাসল সে। কারণ রিপোর্টার এমনভাবে তার কথা লিখেছে যে পাঠক পড়ে মনে করবে গতকাল সে রিপোর্টারের কাছে একটা ইন্টারভিউ দিয়েছে।

জেফরি বেগ কিভাবে অতি দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে মিসেস রেহমানের প্রেমিককে গ্রেফতার করল সেটার মনগড়া একটা কাহিনী বিবৃত করেছে রিপোর্টার। নিউজটা খুব বেশি বড় নয়।

ভেতরের পৃষ্ঠায় লেখক জায়েদ রেহমানের জীবনবৃত্তান্ত দেয়া আছে। মোটামোটি তার জীবনে ঘটে যাওয়া সব ঘটনাই উল্লেখ করা আছে তাতে। জেফরি মনোযোগ দিয়ে পড়ল সেটা। এই লেখাটাসহ আরো যেসব লেখায় জায়েদ রেহমানের জীবনবৃত্তান্ত কিংবা তার জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনার উল্লেখ আছে সেসবই সংগ্রহ করতে হবে। লেখক জায়েদ রেহমানের সম্পর্কে জেফরির তেমন কোনো ধারণাই নেই। এই বিখ্যাত লেখককের কোনো বই পড়েছে বলেও মনে করতে পারল না সে। সিদ্ধান্ত নিলো লেখকের কিছু বইও পড়বে। তবে মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে মেইল করে যে বইটা তিনি একজন প্রকাশককে পাঠিয়েছেন সেটা পড়তে হবে সবার আগে। প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার। একটি বই। অনেক সময় লাগবে।

গতকাল রাতে তার সহকারী জামান বাড়িতে এসে পলিগ্রাফ টেস্টের প্রিন্ট কপি দিয়ে গেছে। সেই সাথে আরো জানিয়ে গেছে, লেখক জায়েদ রেহমানের পোস্টমর্টেম করা হয়েছে। অভিনব কিছু নেই। এটি যে হত্যাকাণ্ড সে ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া গেছে তবে রিপোর্ট তৈরি করতে আরো দু'একদিন লেগে যাবে।

জায়েদ রেহমান যে খুন হয়েছেন সেটা ফরেনসিক রিপোর্ট পাওয়ার আগেই মোটামোটি নিশ্চিত হওয়া গেছে তারপরেও জেফরির মনে হচ্ছে কোথাও যেন একটা সমস্যা আছে। এই কেসটার পেছনে যতোটুকু মনোযোগ দেবার দরকার ছিল সেটা সে দিতে পারেনি অথচ পরিহাসের বিষয় হলো এটাই এখন পর্যন্ত তার ক্যারিয়ারে সবচাইতে দ্রুত সমাধান করা কেস-অন্তত সবাই সেরকমই মনে করছে।

নাটকীয়ভাবে দ্রুততার সাথে সবকিছু ঘটে যাওয়াতে এই হত্যাকাণ্ডের অনেক কিছুই জেফরির চোখ এড়িয়ে গেছে। পুরো বিষয়টা ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে। কেসটা নিয়ে ধীরস্থিরভাবে ভাবতে শুরু করার আগে ভালো করে এক কাপ গরম চা বানিয়ে নিলো

সে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নিজেকে যতোটা সম্ভব ধীরস্থির করে পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখল। এ পর্যন্ত সে যা জানে তার মধ্যে অসঙ্গতিগুলো কি এবং সেটা কতোটা শক্তিশালী।

প্রথম অসঙ্গতি, পলিগ্রাফ টেস্টের ফলাফল। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে এখন পর্যন্ত পলিগ্রাফ টেস্টের ফলাফল নেগেটিভ হয়নি। কিন্তু এই ঘটনায় আশ্চর্য রকমেই সেটা নেগেটিভ। অবশ্য তার বস্ ফারুক সাহেব এটাকে তেমন আমলে নিতে চাচ্ছে না।

দ্বিতীয় অসঙ্গতিটা ল্যাপটপ নিয়ে। হাউজনার্সের কথা যদি ঠিক হয় তাহলে একজন চলৎশক্তিহীন মানুষ কিভাবে তার নাগালের বাইরে থাকা কফি টেবিলের উপর রাখা ল্যাপটপ থেকে মেইল করল?

অনেক দিন আগে জেফরি একটা হলিউডি ছবি দেখেছিল, নামটা অবশ্য এ মুহূর্তে মনে করতে পারল না; সারা ছবিতে প্রধান চরিত্রটি অন্ধ হলেও শেষে দেখা যায় সে আসলে অন্ধ নয়, অন্ধ হবার ভান করেছিল কেবল, আর সেই সুযোগে একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে যায় সন্দেহের উর্ধ্বে থেকে।

মুচকি হেসে ফেলল জেফরি। লেখক জায়েদ রেহমানের বেলায় এমন কিছু হয়েছে বলে বিশ্বাস করতে পারল না।

সম্ভাব্য খুনি হিসেবে আটক থাকা মিসেস রেহমান আর তার প্রেমিক আলম শফিক যে এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে সে ব্যাপারে এখন সবাই নিশ্চিত। কিন্তু জেফরির মনে একটা খটকা লেগেই আছে-এটা হলো তার কাছে তৃতীয় অসঙ্গতি।

আলম শফিক আর মিসেস রেহমান-যদি তারা খুনটা করেই থাকে তাহলে সেই রাতে দু'দুবার শারীরিকভাবে মিলিত হলো কিভাবে?

পাশের ঘরে খুন করে এসে এ রকম একটি কাজ করা কি স্বাভাবিক কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব? এরজন্য যে পরিমাণ শক্ত নার্ভের দরকার সেটা এই দুজনের কারো মধ্যেই নেই, বিশেষ করে আলম শফিকের তো মুরগি কাটার মতো নার্ভ আছে কি না তাতেও জেফরির সন্দেহ রয়েছে।

অনেক খুনি দেখেছে জেফরি। তাদের অনেকেই পেশাদার। কিন্তু খুন করার আগে-পরে তারাও নিজেদের নার্ভ ঠিক রাখার জন্য মদ পান করে থাকে। অনেকে আবার শক্তিশালী ড্রাগও নেয়।

প্রথমে এই ব্যাপারটা জেফরির কাছে ধরা পড়েনি কিন্তু এখন যখন পুরো কেসটা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে বসেছে এক এক করে সব তার কাছে ধরা পড়ছে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ভিটা নুভায় যেতে হবে।

.

নাস্তা করার আগেই জামান ফোন পেল জেফরি বেগের কাছ থেকে। তড়িঘড়ি নাস্তা করেই রওনা দিল সে। বেগ তাকে সরাসরি ভিটা নুভায় চলে যেতে বলেছে।

লেখক জায়েদ রেহমানের অ্যাপার্টমেন্টের দরজাটা খোলা দেখে সে। বুঝতে পারল জেফরি বেগ তার অনেক আগেই এসে পৌঁছেছে।

পুরো অ্যাপার্টমেন্টটি পুলিশ সিজ করে রেখেছে। হাউজনার্স আর দু'জন কাজের মহিলাকে আপাতত পুলিশ কাস্টডিতে রাখা হয়েছে। পুরো অ্যাপার্টমেন্টে কেউ নেই। লেখকের এক বছরের একটি ছেলে সন্তান আছে, তাকে তার নানা-নানী নিয়ে গেছে। দুজন পুলিশের সার্বক্ষণিক পাহারা বসানো হয়েছে সেখানে। তাদের কোনো কাজ নেই। শুধুমাত্র লেখক জায়েদ রেহমানের অ্যাপার্টমেন্টের দরজার সামনে বসে থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত

করা।

ঘরে লেখকের অনেক ব্যবহার্য জিনিসপত্র সিজার লিস্টে ঠাঁই পেয়েছে তবে আসবাবপত্র আর বাকি সব জিনিস আগের মতোই আছে। জামান লেখকের ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেল জেফরি বেগ এক মনে লেখকের ফাঁকা বিছানার দিকে চেয়ে আছে। তার উপস্থিতি টের পেলে ঘুরে তাকাল কেবল।

"কখন এসেছেন, স্যার?"

"দশ-পনেরো মিনিট হবে," বলল বেগ।

জামান তার কাছে এগিয়ে গেল। "স্যার, পোস্টমর্টেমের রেজাল্ট তৈরি হচ্ছে। তবে আমার কাছে খবর আছে, জায়েদ রেহমানের মৃত্যু শ্বাসরোধ করে করা হয়নি।"

"তাহলে কজ অব ডেথ কি?" জানতে চাইল জেফরি।

"হার্ট অ্যাটাক।"

"উমমম।" একটু ভেবে তারপর বলল সে, "ফরেনসিক টিম কি। একেবারে নিশ্চিত?"

মাথা নেড়ে সায় দিল জামান।

"বুকের বাম পাশে যে একটা লালচে দাগ ছিল সেটার ব্যাপারে কিছু জানা গেছে?"

"ওখানে আঘাত করার আলামত পেয়েছে তারা। পাঁজরের ঐ জায়গার হাঁড়ে না কি ফ্র্যাকচার আছে।"

জেফরি এটা আগেই আন্দাজ করেছিল।

"স্যার, আমি তো ভেবেছিলাম উনাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। মুখে একটা বালিশ চাপা দেয়া ছিল।"

"মুখ দিয়ে যাতে শব্দ না বের হয় সেজন্যে দেয়া হয়েছিল," বলল জেফরি বেগ।

"সেটা তো হাত দিয়েও করা যেতো?"

"বালিশ দিয়ে করলে কাজটা অনেক সহজ হয়।"

যুক্তিটা যুতসই বলেই মনে হলো জামানের কাছে। কিন্তু মিসেস রেহমান আর তার প্রেমিক এতো বড় একটা ভুল করল কেন? তারা তো কাজ শেষে বালিশটা মুখ থেকে সরিয়ে রাখতে পারতো? এমনভাবে রাখতে পারতো যাতে মনে হোতো জায়েদ সাহেব ঘুমের মধ্যে মারা গেছেন। ন্যাচারাল ডেথ।"

"আমরা সবাই ভুল করি, জামান। যেভাবে পরিকল্পনা করা হয় সেভাবে সব ঠিকঠাক মতো করা যাবে এটা ভাবছো কেন। হয়তো নার্ভাস হয়ে তারাও কিছু ভুল করেছে। আবার এমনও হতে পারে, তারা সব কিছু ঠিকঠাক করার আগেই অপ্রত্যাশিতভাবে পুলিশ এসে পড়াতে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। আমার অবশ্য সে রকমই মনে হচ্ছে " জেফরি বলল।

"তাহলে ল্যাপটপের ব্যাপারটা?"

"সেটাই তো সবচাইতে বড় খটকা।" কথাটা বলে জেফরি একটু চুপ থেকে আবার বলল, "এই কেসে তিনটি খটকা আছে যার ব্যাখ্যা এখন পর্যন্ত আমরা জানি না।"

"তিনটি?" অবাক হলো জামান। "আমি তো ভেবেছিলাম ল্যাপটপের ব্যাপারটাই শুধু... বাকি দুটো কি, স্যার?"

"পলিগ্রাফ টেস্টের রেজাল্ট। ওদের ভাইটাল কোয়েশ্চেনের জবাবগুলো একদম সঠিক।"

"কিন্তু ফারুক স্যার যে বললেন এটা তেমন কোনো-"।

জামানের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে জেফরি বলল, "টেকনিক্যালি উনার কথাই ঠিক। পলিগ্রাফ টেস্ট একেবারেই আমাদের নিজেদের সুবিধার্থে করা হয়ে থাকে। এটা

আমাদেরকে ইন্টেরোগেশনে সাহায্য করে। এ ছাড়া আর কিছু না।"

"তাহলে...?"

"এই প্রথম পলিগ্রাফ টেস্টের ফলাফল এ রকম হলো। এটাই আমাকে ভাবাচ্ছে। তবে এটা তেমন বড় কোনো কারণ নয়।"

"এরচেয়েও বড় কারণ আছে, স্যার?"

"তিন নাম্বার কারণটা একটু জটিল। তবে ল্যাপটপের চেয়ে এটাই এখন আমার কাছে বেশি বড় বলে মনে হচ্ছে।"

জামান কথাটা শুনে আরো বেশি আগ্রহী হয়ে উঠল। "সেটা কি?"

"জায়েদ রেহমান খুন হবার আগে এবং পরে মিসেস রেহমান আর তার প্রেমিক আলম শফিক শারীরিকভাবে মিলিত হয়েছেন...এটা আমরা তাদের জবানবন্দি থেকেও জেনেছি... আর আমাদের কাছে তো এর সপক্ষে প্রমাণও আছে..."

জামান একটু লজ্জা পেল। কোনো প্রশ্ন করল না সে।

"...দুজন নারী-পুরুষ খুন করার আগে এবং পরে এ রকম কিছু করবে, ...ভাবাই যায় না।"

"আপনি এখন কি করতে চাচ্ছেন, স্যার?" জানতে চাইল জামান।

"জামান, গতকাল আমাদের ভাগ্য খুবই ভালো ছিল। কোনোরকম প্রচেষ্টা ছাড়াই আমরা অভাবনীয় সাফল্য পেয়ে গেছি। সত্যি বলতে কি, এই কেসে আমাকে তেমন কিছুই করতে হয়নি, অথচ দ্যাখো, কতো দ্রুত সাফল্য পেয়েছি আমরা।"

জামান চুপ করে থাকল।

"পুরো কেসটা একেবারে প্রথম থেকে তদন্ত করতে চাই আমি।"

জামান মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না। "আপনি কি মনে করছেন এই হত্যাকাণ্ডটি মিসেস রেহমান আর আলম শফিক করেননি?"

বেগ মাথা নাড়ল। "ব্যাপারটা সেরকম নয়, জামান। আমি কিছুই মনে করছি না। শুধু অসঙ্গতিগুলো বুঝতে চাইছি।"

"মিসেস রেহমান আর আলম শফিক ছাড়া কে এই কাজ করতে যাবে?"

"সম্ভবত কাজটা তারাই করেছে, কিন্তু এখানে আরো কিছু ঘটনা রয়ে গেছে।"

"ফারুক স্যার কি ব্যাপারটা জানেন?"

মুচকি হাসল বেগ। "বলেছিলাম তবে সিরিয়াসলি বলিনি।"

জামান চুপ করে রইল।

"আমাদের কাজ কিন্তু খুনি ধরা নয়, জামান," বলল জেফরি। "আমাদের কাজ সত্যিকার ঘটনাটি তদন্ত করে বের করা।"

মাথা নেড়ে জামান সায় দিল।

"গতকাল হয়তো আমরা খুনি ধরতে পেরেছি কিন্তু ঘটনাটি আসলে কি সেটা এখনও জানতে পারিনি।"

"আপনি কি মিসেস রেহমান আর আলম শফিককে আবারো জিজ্ঞাসাবাদ করবেন?" জামান বলল।

"তাদেরকে নয়," কথাটা বলেই দরজার দিকে পা বাড়াল জেফরি বেগ। "আমি এই অ্যাপার্টমেন্টের দারোয়ান আর অন্যান্য অ্যালোটিদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই।"

.

"এইটা তো আমি কইবার পারুম না, স্যার," ভিটা নুভার নাইটগার্ড আসলাম জেফরির

প্রশ্নের উত্তরে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বলল।

গতকাল থেকে সে প্রচণ্ড ভয়ে আছে। ভেবেছিল নাইটগার্ডের চাকরিটার চেয়ে নির্ঞ্ঝাট চাকরি এ দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই, কালকের পর থেকে অবশ্য সেটা আর তার কাছে মনে হচ্ছে না। কী জানি কোন্ বিপদে পড়ে যায় এই ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে সে।

"কাল রাতে তো তুমিই ডিউটিতে ছিলে?" বলল জেফরি।

"আমি তো সন্ধ্যা সাতটার পর থেইকা ডিউটি দেই," আসলাম সতর্ক হয়ে বলল।

"তাহলে তুমি ডিউটিতে যোগ দেবার পর কারা কারা এখানে ঢুকেছে আর বের হয়ে গেছে সেটা বলো?"

"এতো মানুষ থাকে এহানে আমি কেমনে কমু? আমার তো কিছু মনে নাই।"

"এই ফ্ল্যাটের লোকজনের কথা বলছি না, বাইরের লোকদের কথা বলছি," জেফরি বলল।

"না, স্যার। বাইরে থেইকা কেউ আসে নাই," আসলাম নিশ্চিত হয়ে বলল ইনভেস্টিগেটরকে।

জেফরি জানে ছেলেটা ঠিকই বলছে কারণ মিসেস রেহমান তার গাড়িতে করে আসলাম শফিককে যে ভিটা নুভায় নিয়ে এসেছিলেন সেটা তার জানা কথা নয়।

তারা বসে আছে নিচের পার্কিংলটের শেষমাথায় দারোয়ানদের ছোট ছোট দুটো ঘরের সামনে। "কোনো অপরিচিত লোকজনকে তুমি দ্যাখোনি?" জেফরি আবারো জানতে চাইল।

"সন্ধ্যার পর থেইকা দেহি নাই, তয়..."

"তাহলে কী...বলো?" ছেলেটাকে তাড়া দিয়ে জামান বলল পাশ থেকে।

"ভোর বেলা ফজরের আজান দিবার পর এই ফ্ল্যাটের দোতলার হানিফ স্যার নামাজ পড়তে বাইর হইছিলেন, উনার সাথে বোধহয় উনার এক গেস্টও ছিল। আমি উনারে চিনি না, স্যার।"

"তুমি চেনো না মানে আগে কখনও দ্যাখোনি?"

"না, দেহি নাই।"

"ঐ গেস্ট এখন কোথায়?"

"তাতো কইবার পারুম না। উনারে আর দেখতাছি না।"

"হানিফ সাহেব কি নিজের ফ্ল্যাটেই আছেন?" জেফরি জানতে চাইল।

"মনে হয় আছেন।"

জামানের দিকে ফিরল জেফরি। "হানিফ সাহেবের সাথে দেখা করতে হবে। চলো।"

.

হানিফ সাহেব যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "আমার গেস্ট? ঐ ইডিওটটা কি আপনাদেরকে এ কথা বলেছে?"

পুলিশের লোক পরিচয় দেবার পর এই লোক প্রথমে একটু ভড়কে গেছিলেন, দরজা ফাঁক করেই পুরো আলাপ সেরে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। তার ধারণা ছিল লেখক জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের সমস্ত রহস্য উন্মোচিত হয়ে গেছে, সুতরাং খামোখা কেন অ্যালোটিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এখন? জেফরি যখন বলল তার ঘরে বসে তার সাথে কিছু জরুরি কথা বলতে হবে তখন অনেকটা অনিচ্ছায় জামান আর জেফরিকে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছেন ভদ্রলোক। বিশাল ড্রইংরুমের রাজকীয় দুই সেট সোফার একটাতে বসেছে তারা। জেফরি খেয়াল করেছে ভেতরের ঘর থেকে দুজন মহিলা উঁকি মেরে তাদের কথা শোনার চেষ্টা করছে।

“আপনি বলছেন আপনার কোনো গেস্ট ছিল না?” জেফরি বলল।

“গতকাল তো দূরের কথা বিগত এক মাসে আমার কোনো গেস্ট আসেনি।” ভদ্রলোক পুলিশের জেরার ভয়ে কৃত্রিম রাগ দেখানোর চেষ্টা করছেন।

“আমি বিগত এক মাসের কথা জানতে চাইনি, গতকালকের কথা জানতে চাইছি।”

মুখ টিপে হাসছে জামান। ভদ্রলোককে খুব মজার মানুষ মনে হচ্ছে তার কাছে।

“না। আমার কোনো গেস্ট ছিল না,” কাটাকাটাভাবে বললেন হানিফ সাহেব।

“দারোয়ান ছেলেটা যে বলল আপনার সাথে আরেকজন ছিল। আপনারা ফজরের আজান দেবার পর পরই বের হয়েছিলেন?”

“ঐ ইডিওটটা কেন এ কথা বলছে আমি জানি না। আমার স্পষ্ট কথা শুনে রাখুন, আমি একাই বের হয়েছি। সব সময় একাই বের হই। এই অ্যাপার্টমেন্টে ফজরের নামাজ পড়ার লোক আছে না কি?” হানিফ সাহেব দৃঢ়তার সাথে বললেন।

“জামান, দারোয়ান ছেলেটাকে নিয়ে আসো এখানে,” জেফরি জামানকে বললে সে উঠে চলে গেল।

“আপনি কি নিয়মিতই নামাজ পড়েন?” হানিফ সাহেবকে প্রশ্ন করল বেগ।

“ফজরের নামাজ যে পড়তে পারে ধরে নিতে হবে সে নিয়মিতই নামাজ পড়ে।”

“এই অ্যাপার্টমেন্টে তাহলে আর কেউ নামাজ পড়ে না?”

দ্রলোকের মুখে তিক্ত হাসি দেখা দিল। “নামাজ পড়বে এরা! হা। একেকটা বদমাশ। আকাম কুকাম করেই সময় পায় না নামাজ পড়বে কখন?”

“তাহলে পুরো ফ্ল্যাটে আপনি একাই নামাজ পড়েন?”

“সেটা আমি বলতে পারবো না। তবে আমি কাউকে ফজরের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যেতে দেখিনি। জুম্মার নামাজ অবশ্য অনেকেই পড়ে। এই অ্যাপার্টমেন্টে ফ্ল্যাট কিনে কী যে ভুল করেছি! একেকটা পিশাচ থাকে এখানে। আর এখন তো সারা দেশ জেনে গেল এখানে কী সব ঘটনা ঘটে!”

“কিন্তু দারোয়ান ছেলেটা বলছে আপনার সাথে আরেকজন ছিল। নিশ্চয় কোথাও কোনো ভুল হয়েছে। ভালো করে ভেবে দেখুন,” বলল জেফরি।

“ভাবাভাবির কিছু নেই। অবশ্যই ভুল হয়েছে, তবে সেটা আমার নয়, ঐ ছেলেটার,” বললেন হানিফ সাহেব।

আড়চোখে তাকিয়ে ড্রইংরুমের শেষমাথায় একটা দরজার পদার আড়ালে দু'জন মহিলাকে দেখে নিলো জেফরি।

জামান ফিরে এল দারোয়ান ছেলেটাকে সাথে নিয়ে।

“এই হারামজাদা! আমার সাথে কাকে দেখেছিস...অ্যাঁ?” দারোয়ান ছেলেটাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই রেগেমেগে বললেন হানিফ সাহেব।

“প্লিজ, হানিফ সাহেব। আপনি কিছু বলবেন না। আমাকে বলতে দিন,” জেফরি লোকটাকে নিবৃত্ত করে বন্ধুসুলভ কণ্ঠে দারোয়ান ছেলেটাকে বলল, “তুমি কি নিশ্চিত দেখেছো, হানিফ সাহেবের সাথে আরেকজন ছিল?”।

“জি, স্যার,” নাইটগার্ড আসলাম বলল জবাবে।

“তুমি তো বলেছো লোকটাকে তুমি চেনো না, তাহলে কি করে বুঝলে ঐ লোক হানিফ সাহেবের গেস্ট হতে পারে?”

ছেলেটা মনে হলো ধন্দে পড়ে গেছে। “না, মানে...উনারা দু'জন একসাথে বের হইছিলেন তো...”

"আরে ব্যাটা তুই কি বলছিস! তোর..."

"প্লিজ," জেফরি আবারো নিবৃত্ত করল হানিফ সাহেবকে। "হানিফ সাহেব কি ঐ লোকটার সাথে কথা বলতে বলতে বের হচ্ছিলেন?" আসলামকে প্রশ্ন করল সে।

"না।"

"তাহলে...?"

"আজান দেয়ার কিছুক্ষণ পর হানিফ স্যার নাইমা আসেন...তার পেছন পেছন আরেকজন লোক ছিল...মাথায় টুপির দেয়া...পাঞ্জাবি পরা...উনার ঠিক পেছনেই ছিল... তাই আমি ভাবলাম-"

"অ্যাই ব্যাটা, আমার পেছনে দেখেছিস মানে?" হানিফ সাহেব আবারো ফেটে পড়লেন।

জেফরি লোকটার দিকে স্থির চোখে তাকাল। "হানিফ সাহেব, আমি কিছু না বললে আপনি কোনো কথা বলবেন না। এটা একটা খুনের ঘটনা। ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস।"

এ কথায় কাজ হলো। খুনের ঘটনা শুনেই চুপসে গেলেন তিনি।

"যে লোককে উনার পেছন পেছন তুমি বের হতে দেখেছো তার বয়স কেমন হবে?" আসলামকে বলল জেফরি বেগ।

একটু চিন্তা করে বলল সে, "আপনার মতোই বয়স অইবো।"

"আমার বয়সি?" আসলামের কথাটার প্রতিধ্বনি করল সে।

"জি, স্যার।"

"দেখতে কেমন?"

"আপনার মতোই সুন্দর—"

"হা-হা-হা–" হানিফ সাহেব হেসে ফেললেন। "ভাগ্য ভালো যে বলেনি আপনাকেই দেখেছে...হা হা হা!" হানিফ সাহেব কথাটা বলেই বুঝতে পারলেন কথার মাঝখানে তার মুখ খোলাটা ঠিক হয়নি। চুপ মেরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে।

জেফরি কিছুটা বিরক্ত। এই লোকের মুখ বন্ধ রাখা খুব সহজ কাজ নয়। "লোকটাকে দেখলে তুমি চিনতে পারবে?"

"ঠিক কইরা কইতে পারতাছি না, স্যার। তয় চিনতে পারুম মনে হয়..."

"ঐ লোকটাকে আগে কখনও তুমি দ্যাখোনি, না?"

"না, দেহি নাই।"

"হানিফ সাহেব বোধহয় তার পেছনে থাকা লোকটাকে দেখতে পাননি?"

"উনি ঘুম থেইকা মাত্র উঠছিলেন তো...দুই চোখ তহনও ঘুমে ঢুলুঢুলু। করতাছিল। ঐ লোকের সাথে অবশ্য স্যারকে কোনো কথা কইতে দেহি নাই। উনিও পিছন ফিরা তাকান নাই।"

"তাহলে তুই ব্যাটা বুঝলি কি করে ঐ লোক আমার গেস্ট?" হানিফ সাহেব আবারো নিজেকে সামলাতে পারলেন না।

"না, মানে...আইডিয়া কইরা কইলাম আর কি..."

"ব্যাটা মূর্খ, আইডিয়া করে বলে দিলি আমার গেস্ট হয়!"

বেগ নিরুপায় হয়ে মাথা চুলকালো। হানিফ সাহেব লোকটাকে কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না। "মি. হানিফ..."

"সরি...সরি," ভদ্রলোক হাত তুলে নিজেকে বিরত রাখার ইশারা করলেন।

"আপনি নামাজ পড়ে ফিরলেন কখন?" হানিফ সাহেবকে জিজ্ঞেস করল বেগ।

"ঘড়ি তো দেখিনি...তবে নামাজ পড়া শেষ হতেই নিজের ফ্ল্যাটে চলে আসি আমি।

ঢুকতেই দেখি গেটের সামনে পুলিশ।”

ভিটা নুভার নাইটগার্ড আসলামকে এবার বলল বেগ, “উনি যখন ফিরে এলেন তুমি সেটা দ্যাখোনি?”

“না, স্যার। তহন তো গেটে পুলিশ ছিল। তারা আমারে ভিতরে বসাইয়া রাখছিল তাই উনি কখন ঢুকছেন আমি কইবার পারুম না।”

এক অজ্ঞাত যুবক ফজরের আজান দেবার পর পরই হানিফ সাহেবের পেছন পেছন নামাজ পড়তে বের হয়ে গেছে যাকে এই অ্যাপার্টমেন্টের দারোয়ান চেনে না। আগে কখনও দেখেওনি। তারপর হানিফ সাহেব নামাজ পড়ে ফিরে এলেও সেই রহস্যময় লোকটি ফিরে আসেনি।

বেগ বুঝতে পারছে হানিফ সাহেব মিথ্যে বলেননি, আর এই দারোয়ান ছেলেটাও সত্যি কথাই বলছে। এই কেসটা তার কাছে আরো জটিল বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে একটা বিশাল গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছে সে, যার অনেকগুলো পথ কিন্তু নির্মম ব্যাপার হলো তার বেশিরভাগই কানাগলি।

এই ফ্ল্যাটের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। যেভাবেই হোক বের করতে হবে কে এই যুবক। জেফরির জন্য তার পরিচয়টা জানা খুবই দরকারি হয়ে পড়েছে এখন।

অধ্যায় ২৭

পাভেল আহমেদ ভেবে পাচ্ছে না কি কারণে গতকাল রাতে অনুষ্ঠানটি প্রচার হলো না। রাতে বার থেকে দ্রুত বাড়ি ফিরে এসেছিল কেবল অনুষ্ঠানটি দেখার আশায়। হামিদ আলম তাকে জানিয়েছিল রাত সাড়ে নটার দিকে প্রোগ্রামটা দেখাবে। এ রকম একটা জিনিস তো পাবলিক খুব ভালো মতোই খেতো। হয়তো শিডিউলে কোনো সমস্যা হয়েছে। মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে হামিদ আলমকে ফোন করল সে।

"প্রোগ্রামটা গেল না কেন?" পাভেল আহমেদ জানতে চাইল হামিদ আলমের কাছে।

"বুঝতে পারছি না। নিউজ প্রডিউসারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম উনি যা বললেন তাতে তো মনে হচ্ছে এই প্রোগ্রামটা আর যাবে না..."

"বুঝলাম না?"

"আমিও তো কিছু বুঝতে পারছি না," হামিদ আলম বলল। "কথাটা কাউকে বোলো না, নিউজ প্রডিউসার আমাকে ডেকে নিয়ে বলেছে, এই ইন্টারভিউয়ের কথা যেন কারো সাথে আলাপ না করি। আর তোমার পাওনা বাকি পঁচিশ হাজার টাকা আজই দিয়ে দেবে তারা। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

পাভেল আহমেদ অবশ্য কিছু একটা বুঝতে পারল। একটা স্কুপের গন্ধ পাচ্ছে সে। "আমার বিক্রি করার দরকার ছিল বিক্রি করে দিয়েছি। এখন তোমরা প্রচার করবে না কি ডাস্টবিনে ফেলে দেবে সেটা তোমাদের ব্যাপার। তাহলে আমার বাকি টাকাটা কখন দিচ্ছো?"

"সন্ধ্যার পর।"

"কালকে যেখানে বসেছিলাম সেখানেই?"

"হ্যাঁ," হামিদ আলম বলল। কাল সন্ধ্যার পর তারা দুজনে বসেছিল লা ডিপ্লোম্যাট বারে।

পাভেল আহমেদ ফোনটা রেখে ভাবতে লাগল। দীর্ঘ দিন ক্রাইম রিপোর্টারের কাজ করে সে অন্তত এটুকু বুঝতে পারছে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করলে কিছু একটা পাওয়া যাবে হয়তো। পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রি করে ভেবেছিল বেশ লাভ হয়েছে কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে ওটার মূল্য আরো বেশি।

.

ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ আর জামান একটা কফিশপের এককোণে বসে আছে। ভিটা নুভা থেকে কাজ সেরে সোজা এখানে চলে এসেছে তারা। ওখানকার অন্যান্য অ্যালোটিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা নিশ্চিত হয়েছে গতকাল তাদের কারোরই কোনো গেস্ট ছিল না। দারোয়ান ছেলেটার বর্ণনা অনুযায়ী কোনো যুবককে তারা গতকাল দেখেওনি।

"স্যার, এমনও তো হতে পারে কোনো অ্যালোটির গেস্ট ঠিকই এসেছিল কিন্তু জায়েদ সাহেবের হত্যাকাণ্ডের কথা শুনে ভয়ে কেটে পড়েছে। এখন ভয়ে আর সেটা স্বীকার করতে চাচ্ছে না কেউ। আমাদের দেশের মানুষ তো পুলিশকে ঠিক আস্থায় নিতে পারে না। ওরা মনে করে থাকতে পারে এতে করে খামোখাই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে।"

বেগ মাথা নেড়ে সায় দিল। "ফজরের আজানের পর হানিফ সাহেব যখন নামাজ পড়ার জন্য বের হলেন তখনও জায়েদ সাহেবের খুন হবার কথা কেউ জানতো না। নামাজ শেষে ফিরে এসে হানিফ সাহেব ভিটা নুভায় ঢুকতে গিয়ে জানতে পারলেন কিছু একটা হয়েছে। তোমার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে ধরে নিতে হবে ঐ অজ্ঞাত যুবক জানতো জায়েদ রেহমান খুন হয়েছেন। সেজন্যেই ভিটা নুভা থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। সেই সাথে এটাও

ধরে নিতে হবে তাকে আশ্রয় দিয়েছে এই অ্যাপার্টমেন্টেরই কোনো লোক। ব্যাপারটা তো আরো জট পাকিয়ে যাচ্ছে।”

“তা ঠিক,” বলল জামান। “স্যার, আপনি কি মনে করছেন মিসেস রেহমান আর শফিক সাহেব ছাড়াও অন্য কেউ এই খুনের সাথে জড়িত থাকতে পারে?”

“এটা আমার আগেও মনে হয়েছে। ধানমণ্ডি থানার ইন্সপেক্টর এলাহী সাহেব এক ছেলেকে ভিটা নুভার সামনে সন্দেহজনকভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। ছেলেটাকে ধরতে পারেনি সে কিন্তু তারও মনে হয়েছিল ছেলেটা কোনো অঘটন ঘটানোর উদ্দেশ্যে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল...” জেফরি একটু অন্যমনস্ক হয়ে থেমে গেল।

“স্যার, আলম শফিক কি আরো কয়েকজনকে নিয়ে এই কাজটা করেছে?”

একটু ভেবে মাথা নেড়ে সায় দিল বেগ। “হতে পারে।”

“স্যার?” জামান বললে জেফরি অন্যমনস্কতা কাটিয়ে উঠে তার দিকে তাকাল। “আপনি মনে হয় নিশ্চিত হতে পারছেন না খুনটা মিসেস রেহমান আর আলম শফিক করেছে?”

বেগ চুপ করে থাকল।

“আগামীকাল আসামী দু'জনকে পুলিশ রিমান্ডে নেয়া হবে। একটু অপেক্ষা করেই দেখুন না পুলিশের কাছে আলম শফিক আর ঐ মহিলা কোনো স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় কি না।”

“তাদেরকে আগামীকালই রিমান্ডে নেয়া হবে? তোমাকে কে বলল?”

“লেখকের ছোট ভাই সাহেদ রেহমান আজ সকালে তার ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডের জন্য থানায় কেস করেছে। পুলিশ এখন সেই কেসে তাদেরকে রিমান্ডে নেবে। অবশ্য জায়েদ রেহমানের ভাই কেস না করলে পুলিশ নিজেই বাদী হয়ে মামলা করতো।”

“তাহলে দেখি পুলিশের কাছে তারা কি বলে,” বেগ কথাটা বলে আবারো অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

“স্যার, একটা কথা বলবো?” জামানের দিকে ফিরে তাকাল বেগ। “বলো।”

“এই কেসের তদন্তে আপনি যা করার করেছেন। দু'জন সন্দেহভাজনকে ধরেছেন। এখন বাকিটা পুলিশের উপর ছেড়ে দিন। ওদের কাছে তো আপনি যথেষ্ট প্রমাণ আর আলামত তুলে দিয়েছেন। এখন ওরা খুব সহজেই কেসটার ফয়সালা করতে পারবে।”

“কিন্তু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে পুলিশ এই কেসটা নিয়ে হিমশিম খাবে। আমরা এখন পর্যন্ত যা জানি তারচেয়ে অনেক জটিল আর কঠিন বলেই মনে হচ্ছে কেসটাকে।”

জামানের কাছে অবশ্য কেসটা জটিল বলে মনে হচ্ছে না তবে মুখে কিছু বলল না।

“অসঙ্গতিগুলো দূর না করে কিভাবে সন্তুষ্ট হই যে কেসটা সভ হয়েছে?” বেগ বলল।

“স্যার, এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যেসব প্রমাণ আর আলামত আছে। তা দিয়ে আদালতে আসামীদের খুব সহজেই কনভিক্টেড করা যাবে,” জেফরিকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল জামান।

“তা যাবে...কিন্তু হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের কাজ হচ্ছে সুষ্ঠু তদন্ত করা। আদালতে কি হবে না হবে সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়।”

জামান আর তর্কে গেল না।

“আমি এই কেসটা নিয়ে এখনও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছি না,” কফির মগে একটা চুমুক দিল জেফরি। “যেকোনো হত্যাকাণ্ডের তদন্তের মূল কাজ আসলে দুটো। কে বা কারা খুন করেছে সেটা বের করার পাশাপাশি কিভাবে খুন করেছে সেটাও বের করতে হয়। আমরা হয়তো খুনিদেরকে চিহ্নিত করতে পেরেছি কিন্তু তারা কিভাবে কাজটা করেছে সেটা

এখনও জানি না।”

“ঠিক আছে, পুলিশ রিমান্ড পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করে দেখি...” বলল জামান।

জেফরির মোবাইলটা বিপ করে উঠলে সে পকেট থেকে বের করে দেখল একটা মেসেজ এসেছে। ওপেন করল সেটা।

ফরগিভ মি

তিক্ত মুখে ফোনটা পকেটে রেখে দিল সে। রেবার এইসব মেসেজ তাকে দুদণ্ড শান্তি তো দিচ্ছেই না বরং দগদগে ঘায়ে নতুন করে আঘাত দিয়ে যাচ্ছে।

“স্যার, কোনো সমস্যা?” জেফরির মুড অফ হতে দেখে জামান বলল।

“না।” ছোট্ট করে বলল সে।

গত পরশু রেবার কাবিন হয়ে গেছে। এখনও তাকে যখন তখন মেসেজ করে যাচ্ছে, ব্যাপারটা জেফরির কাছে মোটেই ভালো লাগছে না। এ পর্যন্ত অনেকগুলো মেসেজ পাঠালেও জেফরি একটারও জবাব দেয়নি। দেয়ার আছে কি! কী বলবে সে?

“স্যার?”

জামানের কথায় অন্যমনস্কতা কাটিয়ে উঠল জেফরি। “কি?”

“আপনি কি জায়েদ রেহমানের মেইল করা বইটা পড়েছেন?”

“প্রথম দিকের কয়েক পৃষ্ঠা পড়েছি।”

“আমি অনেকটুকু পড়েছি...ভেতরের দিকে, মানে উনার দ্বিতীয় স্ত্রীর ব্যাপারে উনি এমন কিছু কথা লিখেছেন যা পড়লে বুঝতে পারবেন উনি নিজেও মহিলাকে সন্দেহ করতেন।”

জেফরি একটু কৌতূহলী হয়ে উঠল। “কী রকম?”

“জায়েদ রেহমান আশঙ্কা করছিলেন তার দ্বিতীয় স্ত্রী বর্ষা তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে...”

“তাই না কি!?”

“জি, স্যার। তার এই বইটা কিন্তু অনেকটা কনফেশনের মতো। অনেক কিছুই তিনি স্বীকার করে গেছেন। বইটা প্রকাশ হলে বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হবে।”

জামান ছেলেটা যে বেশ বই-টই পড়ে সেটা জেফরি জানে। কিন্তু বাড়িতে বসে বই পড়ার মতো মনের অবস্থা নেই তার। “তুমি বইটার যেসব জায়গায় এ রকম তথ্য আছে সেগুলো হাইলাইটস করে আমাকে দিতে পারবে?”

“অবশ্যই পারবো, স্যার।”

“থ্যাঙ্কস।”

“স্যার, বইটাও প্রমাণ করে মিসেস রেহমান আর তার প্রেমিকই খুনটা করেছে।”

মাথা নেড়ে সায় দিল জেফরি।

“তবে বইটা বের হলে লেখকের অনেক অজানা কথা জানা যাবে। উনি অনেক বিষয়েই খোলামেলা স্বীকার করেছেন।”

“যেমন?”

“বিশেষ করে নারীঘটিত ব্যাপারগুলো...যদিও আমরা অনেকেই সেসব কাহিনী জানি তারপরও তিনি নিজে বিস্তারিত স্বীকার করে গেছেন। এজন্যে নিজের অনুতপ্ত হবার কথাও বলেছেন বার বার।”

“তা হতেই পারে। জীবনের অন্তিম অবস্থায় এসে অনেকেরই এ রকম বোধোদয় ঘটে,” বলল বেগ। “তবে কোনো বাঙালী লেখক এ রকম স্বীকারোক্তি করে গেছেন নিজের আত্মজীবনীতে সেটা বোধহয় বিরল।”

“বইটা কি আবেদ আলী সাহেব প্রকাশ করবেন?”

“আমি তাকে এ ব্যাপারে মুখ খুলতে বারণ করে দিয়েছি। ভদ্রলোক বেশ ভয়ে আছেন। মনে হয় না প্রকাশ করার মতো সাহস দেখাবেন।”

“স্যার, আমার মনে হয় উনি বইটা খুব জলদিই প্রকাশ করবেন। কোটি টাকার প্রফিট হবে। এটা উনিও জানেন।”

“বলো কি! কোটি টাকা!?” অবাক হলো জেফরি।

“জি, স্যার। কম করে হলেও বইটা দু'লক্ষ কপি বিক্রি হবে। পাঁচশ পৃষ্ঠার বই...বিশাল আকার। কোটি টাকাই হবে।”

“আমি চাইছি না বইটি এখনই প্রকাশ হোক। এটা প্রকাশ করার আইনী অধিকার কি তার আছে?”

“সেটা আমি বলতে পারবো না। আমাদের নিজস্ব লিগ্যাল অ্যাডভাইজারের সাথে কথা বলে দেখতে হবে। তবে আমি নিশ্চিত, উনি প্রকাশ করার চেষ্টা করবেন। আর সেটা করবেন খুব দ্রুত।”

“আবেদ আলীকে দেখে আমার কিন্তু অতো সাহসী বলে মনে হয়নি। ভদ্রলোক বেশ ভয় পেয়ে গেছিলেন।”

“বিশাল অঙ্কের প্রফিট ভীত ব্যবসায়িকেও সাহসী করে তোলে, স্যার।”

“এটা থামাতে হলে কি করতে হবে না হবে সে ব্যাপারে আমাদের লিগ্যাল অ্যাডভাইজারের সাথে আলাপ করে দ্যাখো তো।”

“ঠিক আছে, স্যার।”

“আবেদ আলীর সাথেও কথা বলে জেনে নিও উনি বইটি প্রকাশ করার ব্যাপারে কিছু ভাবছেন কি না।”

মাথা নেড়ে সায় দিল জামান।

“পুরো তদন্ত শেষ হবার আগে বইটা প্রকাশ হওয়া ঠিক হবে না। পাবলিক সেন্টিমেন্ট চলে যেতে পারে ভিন্ন দিকে। যেভাবেই হোক উনাকে থামাতে হবে।”

অধ্যায় ২৮

আবেদ আলী আবারও অস্থির হয়ে উঠেছে তবে ভয়ে নয় বিশাল অঙ্কের মুনাফার কথা ভেবে।

লেখক জায়েদ রেহমানের পাঠানো নতুন বইটা সারা রাত জেগে জেগে অনেকখানিই পড়ে ফেলেছে সে। বই তো নয় যেন বোমা। এই বোমাটা যখন ফাটবে সারা দেশ কেঁপে উঠবে। এভাবে আর কোনো বাঙালী লেখক নিজের জীবনের সব কথা অকপটে স্বীকার করেছে বলে মনে করতে পারল না সে। এই বই শুধু লেখক জায়েদ রেহমানের ভক্তরাই কিনবে না তার চরম শত্রু আর তার লেখা যারা অপছন্দ করে তারাও কিনবে, আবেদ আলী এ ব্যাপারে নিশ্চিত।

জায়েদ রেহমানের সর্বোচ্চ বিক্রি হওয়া বইটি এক লাখ কপির মতো বিক্রি হয়েছে। আবেদ আলীর ধারণা এই নতুন বইটা যদি এক্ষুণি প্রকাশ করা হয় তাহলে তিন-চার লাখ কপি কয়েক মাসেই শেষ হয়ে যাবে। কোটি কোটি টাকার ব্যপার। দেরি করা যাবে না। এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর সেজন্যেই পরামর্শ নিতে সবচাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি হামিদ কায়সারকে ডেকে নিয়ে এসেছে নিজের প্রকাশনা অফিসে।

"আইনী ঝামেলা আছে কি না বুঝতে পারছি না," আবেদ আলী তার বন্ধুকে বলল।

"কী রকম?" জানতে চাইল লম্বা দাড়ি আর বাবরি চুলের কবি।

"হোমিসাইড থেকে আমাকে এ ব্যাপারে কোনো কিছু না বলার জন্য বলে দেয়া হয়েছে। এখন যদি প্রকাশ করি।"

"আপনি খামোখাই ভয় পাচ্ছেন। এ রকম একটা রেডি আর হটকেক পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে এখনও বসে আছেন! কিসের আইনী ঝামেলা? জায়েদ রেহমান খুন হবার আগে আপনাকে মেইল করে এটা দিয়ে গেছেন। এমনকি কাকে উৎসর্গ করবেন, এর সত্ত্ব কে পাবে সবই তো বলে দিয়েছেন। সমস্যা কি?"

"কিন্তু ই-মেইলের কি আইনী কোনো ভিত্তি আছে?"

"ঠিক আছে, সেটার জন্য আমরা কোনো লিগ্যাল অ্যাডভাইজ নিতে পারি। আপনি চাইলে আমি আমার এক ব্যারিস্টার বন্ধুকে এখনই ফোন করে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইতে পারি।"

আবেদ আলী আগ্রহী হয়ে উঠল। ডেস্কে রাখা ল্যান্ডফোনটা বাড়িয়ে দিল কবি হামিদ কায়সারের দিকে। "এক্ষুণি করুন।"

ফোনটা হাতে তুলে নিতেই রিং হবার শব্দ শোনা গেলে হামিদ কায়সার প্রথমে বুঝতে না পারলেও একটু পরই বুঝতে পারল আবেদ আলীর মোবাইল ফোনটা বাজছে। তার মোবাইলে নস্টালজিয়া নামের রিংটোন সেটা করা আছে। এই টোনটা একেবারে পুরনো দিনের ল্যান্ডফোনের রিঙের মতো।

কলটা রিসিভ করল আবেদ আলী।

"জি, বলছি...হা..." মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার। তার সামনে বসে থাকা কবি হামিদ কায়সার ভুরু তুলে জানতে চাইলে আবেদ আলী মোবাইলটা একটু সরিয়ে ফিসফিস করে বলল, "হোমিসাইড থেকে..."

কিছুক্ষণ ওপাশের কথা শুনে গেল আবেদ আলী। "জায়েদ আমাকে এই বইটা বের করার জন্য স্পষ্ট তাগিদ দিয়ে গেছে...এখন বন্ধুর প্রতি আমারও তো একটা কর্তব্য আছে, না কি...না, এখনও সিদ্ধান্ত নেইনি...বলতে পারছি ...উমমম...আমি আমার লিগ্যাল অ্যাডভাইজারের সাথে কথা বলে আপনাকে জানাচ্ছি...না, এখন বলতে পারছি না।"

কবি হামিদ কায়সার মাথা নেড়ে সায় দিল।

"...আচ্ছা, ঠিক আছে...ওকে, আমি জানাবো।"

"কি বলল," আবেদ আলী ফোনটা রাখতেই কবি জানতে চাইল।

"লিগ্যাল অ্যাডভাইজারের কথা শুনে চুপসে গেছে," আবেদ আলী আত্মবিশ্বাসী হয়ে বলল বন্ধুকে। "এক্ষুণি আপনার ব্যরিস্টার বন্ধুকে ফোন করুন।"

.

পাভেল আহমেদ খুব অবাক হয়েছে। তার ধারণাই ঠিক। কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে আসবে। তবে খোঁড়াখুড়ি করার ইচ্ছে তার নেই যদি না তার সাথে সহযোগীতা করা হয়।

একটা নাম্বারে ফোন করে বন্ধ পেয়ে অন্য আরেকটা নাম্বারে কল করে জেনে নিয়েছে বন্ধ করে রাখা নাম্বারের মালিক দেশের বাইরে চলে গেছে গতকাল।

হঠাৎ এক দিনের নোটিশে বিদেশে? অন্য কিছুর গন্ধ পাচ্ছে এখন। পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে কেনার পরও এ রকম জিনিস প্রচার করা হবে না! বিশাল কোনো কারণ আছে এর পেছনে। এত আগ্রহ করে জিনিসটা নেবার পরও...

পাভেল আহমেদ জানে কাকে ফোন করলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে।

অধ্যায় ২৯

সি ই সিদ্দিকী সাহেবের বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যে অমূল্য বাবু একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তবে সে কোনো কর্মচারী নয়, আবার সিদ্দিকী সাহেবের ব্যবসায়িক অংশীদারও যে নয় সেটাও নিশ্চিত। অমূল্য বাবু যে আসলে কি সেটা সবার কাছেই একটা রহস্য। সিদ্দিকী সাহেবের সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অমূল্য বাবুকে বেশ সমীহের চোখে দেখে থাকে। তারা জানে সিদ্দিকী সাহেবের উপর এই লোকের অপরিসীম প্রভাব রয়েছে।

সিদ্দিকী সাহেব দেশের বাইরে গেছেন দু'তিন দিনের জন্য, তবে কোথায় গেছেন সেটা কেবল জানে অমূল্য বাবু, কারণ সে-ই সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সিদ্দিকী সাহেবের অবর্তমানে অমূল্য বাবুই যে সব কিছুর দেখাশোনা করে সেটা রীতিতে পরিণত হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে কোনো দরকার হলে তার কাছেই ম্যানেজার লেভেলের কর্মকর্তারা যোগাযোগ করে থাকে।

সিদ্দিকী সাহেবের সমস্ত ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড যেখান থেকে পরিচালিত হয় সেই হেড অফিসের দশ তলায় অমূল্য বাবুর একটি প্রাইভেট রুম আছে, আজ দুদিন ধরে সেখানেই অফিস করছে সে। তেমন কোনো কাজ নেই শুধু উপস্থিত থাকা। ব্যাপারটা অমূল্য বাবুর কাছে বিরক্তিকর হলেও চরম ধৈর্যশীল একজন মানুষ সে। ভারত-পাকিস্তানের ওয়ান ডে সিরিজ চলছে বলে তার জন্য সময়টা নিতান্ত মন্দ কাটছে না। সকাল থেকে বসে বসে টিভিতে খেলা দেখছে।

টিভির ভলিউমটা বেশি থাকার কারণে বুঝতে পারেনি মোবাইল ফোনটা বাজছে। তিনবার রিং হবার পর টের পেল।

"হাঁ, বলুন?" বলল অমূল্য বাবু।

"স্যার, একটা সমস্যা হয়েছে, স্বদেশ টিভির মহাপরিচালক ইকরাম সাহেব ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে বলল।

"বলুন।"

দ্বিধাগ্রস্ত মহাপরিচালক গলা খাকারি দিয়ে বলতে শুরু করল। সে জানে অমূল্য বাবু অল্প কথার মানুষ। যতোটুকু সম্ভব সংক্ষেপে বলে গেল ঘটনাটি। অমূল্য বাবু কোনো কথা বলল না, চুপচাপ শুনে গেল। শেষে কেবল বলল, "ঠিক আছে। তাকে বলুন আগামীকাল দুপুরের মধ্যে টাকাটা পেয়ে যাবে। আর কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।"

ফোনটা রেখে অমূল্য বাবুর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। টিভিতে ক্রিকেট খেলা চললেও সেটাতে আর মনোযোগ দিতে পারল না। একটা উটকো ঝামেলা তৈরি হয়েছে। সেটাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে খুব দ্রুত।

মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে একটা নাম্বার ডায়াল করল সে।

রিং হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশ থেকে ফোনটা ধরা হলো। যে ফোনটা ধরেছে সে কোনো দিনই আগে থেকে কিছু বলবে না, অমূল্য বাবু সেটা জানে। লোকটার মৃদু নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। গভীর করে দম নিয়ে নিলো অমূল্য বাবু।

"এক ঘণ্টার মধ্যে দেখা করো...ঠিক যেখানে এর আগে দেখা করেছিলাম।"

ফোনটা রেখে উদাস হয়ে পেছনের কাঁচের ভেতর দিয়ে দশ তলার নিচে ঢাকা শহরের ভিউ দেখতে লাগল সে।

তার প্রিয় খেলোয়াড় শচীন টেন্ডুলকার ব্যাট করছে এখন কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। এক নাদান এই পৃথিবীর সবচাইতে জঘন্য একটা কাজ করছে তাদের সাথে। সিদ্ধান্ত নিলো কোনো রকম অনুকম্পা দেখানো হবে না।

সব কিছু সহ্য করতে পারে কিন্তু ব্ল্যাকমেইল একদমই সহ্য করতে পারে অমূল্য বাবু।

.

কিছুক্ষণ আগে একটা ফোন পাবার পর থেকেই পাভেল আহমেদের মেজাজ ফুরফুরে হয়ে আছে। ঠিক যা ভেবেছিল তাই হয়েছে। তবে যে কাজটা সে করতে যাচ্ছে সেটা অনৈতিক। নিজের বিবেক একটু খচখচ করে উঠলেও সেটাকে তেমন একটা পাত্তা দিল না সে।

আগামীকাল এ সময় তার পকেটে চলে আসবে দু লাখ টাকা।

ভাগ্যিস আরেকটা কপি রেখেছিল। ব্যাপারটা যে এক মুরগী দুবার বিক্রি করার মতো হয়ে যাচ্ছে সেটা ভেবে মজা পেল সে। স্বদেশ টিভির রিপোর্টার হামিদ আলমকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি নিউজ প্রডিউসার কাশেম হাবিবকে ফোন করেছিল। নিজের পরিচয় দিয়ে গতকাল বিক্রি করা একটি দুর্লভ সাক্ষাৎকার কেন প্রচার করা হলো না সে বিষয়ে জানতে চায়।

"আমি নিজে ঐ ইন্টারভিউটা নিয়েছিলাম। আপনারা গতকাল সেটা প্রচার করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা প্রচার হয়নি। আমি জানতে পেরেছি ওটা আর প্রচার করবেন না আপনারা।"

"আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি না, তাই আপনাকে কিছু বলতে পারছি," প্রডিউসার কাশেম হাবিব বলেছিল।

"তাহলে যে জানে তাকে ফোনটা দিন। তা না হলে আমি অন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো।"

"মানে?"

"আমার কাছে ঐ ক্যাসেটটার আরেকটা কপি আছে। ব্যাকআপ কপি। আপনারা প্রচার না করলে আমি সেটা অন্য জায়গায় দিয়ে দেবো," পাভেল আহমেদ ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল।

"আপনি কিন্তু ওটা আমাদের কাছে বিক্রি করেছেন-"

কাশেম হাবিবকে মাঝপথে থামিয়ে দিল পাভেল আহমেদ। "আমি বিক্রি করেছি ওটা প্রচার হবার জন্য, ডাস্টবিনে ফেলে দেবার জন্য নয়। আপনারা যদি ওটা কালকের মধ্যে প্রচার না করেন তবে অন্য কোনো চ্যানেল সেটা প্রচার করবে।"

কাশেম হাবিব একটু ভেবে বলল, "আমি আপনাকে একটু পর ফোন করে জানাচ্ছি।"

মাত্র দশ মিনিট পরই পাভেল আহমেদের কাছে ফোন করা হয় তবে সেটা কাশেম হাবিব করেনি করেছিল চ্যানেলের মহাপরিচালক ইকরাম সাহেব নিজে। ভদ্রলোক সময় নষ্ট না করে সরাসরি আসল কথায় চলে আসে।

"আপনার কাছে থাকা দ্বিতীয় ক্যাসেটটাও যদি আমরা কিনে নেই তাহলে কতো দিতে হবে?"

"তার মানে আপনারা ইন্টারভিউটা প্রচার করবেন না?"

"আমরা প্রচার করি বা না করি সেটা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না, এই শর্তে দ্বিতীয় ক্যাসেটটা বিক্রি করতে হবে। কতো দিতে হবে বলুন?"

একটু ভেবে পাভেল আহমেদ বলল, "দুই লাখ?"

"ওকে। ক্যাসেটটা কখন দিচ্ছেন?" ঝটপট জানতে চাইল ইকরাম সাহেব।

পাভেল আহমেদ ভাবতেই পারেনি এক কথায় রাজি হয়ে যাবে। সে ভেবেছিল দু'লাখ চাইলে শেষ পর্যন্ত এক লাখে রফা হবে। আগামীকাল।"

"কখন?"

"উমমম...দুপুরের দিকে?"

“ঠিক আছে।”

পাভেল আহমেদ কিছু বলতে যাবে অমনি ভদ্রলোক গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “আর কোনো চালাকি করবেন না। আর কোনো ব্যাকআপ কপি যদি থাকে। তাহলে সেটা আপনার জন্য ভালো হবে না। কথাটা মনে রাখবেন।”

একটু ভয় পেয়ে গেল পাভেল। “ঠিক আছে। তাহলে-”

লাইনটা কেটে দেয়া হয় অপর পাশ থেকে।

ভয়টা তার মধ্যে অল্পক্ষণই ছিল, তারপরই পাভেল আহমেদের ঠোঁটে মুচকি হাসি দেখা দেয়। আমাকে ভয় দেখায়! শালা!

.

অন্ধকার একটা ঘরে টিভি চলছে।

অ্যানিমেল প্লানেট। একটা সিংহ ওৎ পেতে আছে শিকার ধরার জন্যে। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে সেটা। খুবই সতর্ক আর নিঃশব্দ। শিকারের খুব কাছে আসার পরই আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল সেটার উপর...

টিভিটা বন্ধ করে দেয়া হলে ঘরে নেমে এল নিকষ কালো অন্ধকার। কিছুক্ষণ সেই অন্ধকার থাকার পর ঘরে মৃদু আলোর ডিম লাইট জ্বলে উঠল। আবছায়া এক মানব মূর্তি বিছানা থেকে উঠে অ্যাটাচড বাথরুমে চলে গেল ধীরে ধীরে। সম্পূর্ণ নগ্ন সে। সুগঠিত শরীরটা ডিম লাইটের মৃদু আলোতেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আজ দুদিন ধরে এই ঘর থেকে সে বের হয়নি। একটানা কয়েক দিন ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে তার মোটেও খারাপ লাগে না। তিন-চারদিনের খাবারদাবার এক সঙ্গে কিনে এনে নিজের ঘরে বন্দি হয়ে থাকাটা তার প্রিয় মুহূর্ত। কিন্তু এখন তাকে আবারো বের হতে হবে। শীত হোক গ্রীষ্ম হোক, সব সময়ই ঠাণ্ডা পানিতে গোসল না করে সে বাইরে বের হয় না। ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করলে তার মধ্যে এক ধরণের ধীরস্থিরতা চলে আসে। ধীরস্থির থাকাটা তার জন্যে অনেক বেশি জরুরি।

অধ্যায় ৩০

হোমিসাইড প্রধান ফারুক আহমেদ মুখ ভার করে বসে আছে। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না জেফরি কেন এ রকম কথা বলছে। কিছুক্ষণ আগে তার এই প্রিয়পাত্রটি এসে তাকে যা বলেছে সেটাকে পাগলের প্রলাপ বলেই মনে হচ্ছে।

একটা মীমাংসিত কেস নিয়ে কেউ এ রকম কথা বলতে পারে!

এখনও জেফরি তার সামনেই বসে আছে।

“ঐ অজ্ঞাত যুবকটি নিয়ে তুমি খুব বেশি মাথা ঘামাচ্ছো, জেফ,” বলল সে। “এটারও অনেক ব্যাখ্যা হতে পারে...অ্যালোটিদেরই কারো গেস্ট হয়তো। অ্যাপার্টমেন্টে একটা খুন হয়েছে জানার পর ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারে মনে করে ভয়ে সটকে পড়েছে।”

এ কথাটা জেফরির সহকারী জামানও তাকে বলেছিল। মাথা নেড়ে সায় দিল জেফরি। আরেকটা বিষয় আছে যেটা সে নিজের বসের কাছে খুলে বলতে পারছে না।

“আবার এমনও হতে পারে, কোনো ফ্ল্যাটে হয়তো অসামাজিক কার্যকলাপ চলে থাকে যেটা ওখানকার কেউ জানে না। আজকাল তো ফ্ল্যাটগুলোতে এ রকম হচ্ছেই...সে ধরণের একজন ক্লায়েন্ট হয়তো ভোরের দিকে চলে গেছে।”

ফারুক সাহেবের উর্বর কল্পনা শক্তির প্রশংসা না করে পারল না সে।

“ওরকম কিছু হবার সম্ভাবনা একবারেই কম। ভিটা নুভায় যারা থাকে তারা এই সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠিত,” জেফরি বলল। একটু থেমে দ্বিধা কাটিয়ে উঠল সে। “স্যার, জায়েদ সাহেব

যে রাতে খুন হন সে রাতে তার স্ত্রী আর তার প্রেমিক আলম শফিক...”।

ভুরু তুলে তাকাল ফারুক সাহেব।

“...মানে, উনারা দু’দুবার শারীরিকভাবে মিলিত হয়েছিলেন...”

“উমমম! তো?”

“এটা কি অস্বাভাবিক ব্যাপার না?”

ফারুক আহমেদ এবার ভুরু কুঁচকে ফেলল। “অস্বাভাবিককেন? তোমার কাছে এ রকম কেন মনে হচ্ছে?”

জেফরি বেগ মুশকিলে পড়ে গেল। এ রকম একটি ব্যাপার নিজের বসের সামনে খোলামেলা আলোচনা করাটা তার জন্যে বিব্রতকর। তবে সাহায্যের জন্যে ফারুক আহমেদই এগিয়ে এল।

“তুমি বলতে লজ্জা পাচ্ছো কেন? খুলে বলো?”

“ব্যাপারটা প্রথমে আমার কাছে গুরুত্ব পায়নি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এটা স্বাভাবিক না। খুন করার পরিকল্পনা করে কেউ কি এসব করবে?”

একটু চুপ থেকে ফারুক সাহেব বলল, “তা করবে না।”

“তাহলেই বুঝুন?”

“মানে সাধারণত করবে না...কিন্তু—”

“কিন্তু কি, স্যার?”

“সাইকোপ্যাথদের ব্যাপারে এ রকম কাজ করা অসম্ভব নয়।”

উফ! মনে মনে বিরক্ত হলো জেফরি। তার এই স্যার মাঝেমাঝে খুবই হাস্যকর কথা বলে। “স্যার, আপনি কি মনে করছেন উনারা দুজনেই সাইকোপ্যাথ?”।

“ঠিক তা বলছি না তবে তারা দুজন যে স্বাভাবিক নয় সেটা তো মানবে? স্বাভাবিক মানুষ ঠাণ্ডা মাথায় খুনখারাবি করতে পারে না।”

আশাহত হলো জেফরি। ব্যাখ্যাটা তার মনোপুত হচ্ছে না। ব্যাপারটা ফারুক সাহেবও হয়তো বুঝতে পারল।

“শোনো, জেফ। খুন হবার আগে তারা দুজন অনেকটা সময় একসাথে ছিল...ছিল না?”

মাথা নেড়ে সায় দিল বেগ। “তিন-চার ঘণ্টার মতো।”

“তিন-চার ঘণ্টা! তো এই তিন-চার ঘণ্টায় দুজন নারী-পুরুষের মধ্যে সেরকম কিছু হতেই পারেই। এজন্যে অবশ্য তাদেরকে সাইকোপ্যাথ ভাবাটাও ঠিক হবে না,” কথাটা বলেই হেসে ফেলল সে।

“কিন্তু খুন হবার পরেও তারা আরেকবার মিলিত হয়েছিল। এটা কি অস্বাভাবিক না?”

একটু চিন্তায় পড়ে গেল হোমিসাইড প্রধান।

“স্যার, আপনার কথা আমি মেনে নিচ্ছি, তারপরও আমি চাইছি একটু ভালোভাবে তদন্ত করে বিষয়টা পরিস্কার করে নিতে।”

“ভালোভাবে? এরচেয়ে ভালোভাবে এই দেশে আর কোনো তদন্ত হয়েছে। কি না আমি জানি না। কতো দ্রুত আসামী ধরা হলো! একেবারে ক্রাইমসিন থেকে! সবই তো পরিস্কার। এ ঘটনার আর কি বাকি আছে?”

“স্যার, আমি কেবল কিছু অসঙ্গতি দূর করে নিতে চাইছি।”

“অসঙ্গতি।” ফারুক সাহেব যেন আপন মনে বলল কথাটা।

“পলিগ্রাফ টেস্টের কথাটা বাদই দিলাম। একবার ভেবে দেখুন, জায়েদ রেহমান যখন খুন হচ্ছেন তখন তার অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে এক যুবককে পুলিশ সন্দেহজনকভাবে

ঘোরাঘুরি করতে দেখে। ছেলেটাকে অবশ্য পুলিশ ধরতে না পারলেও সেই সূত্রেই কিন্তু ভিটা নুভায় পুলিশ খোঁজ নিতে গিয়ে এই ঘটনাটি আবিষ্কার করে। তারপর ভোরবেলায় এক অজ্ঞাত যুবক অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে সটকে পড়ল। তারচেয়েও বড় কথা জয়েদ সাহেব খুন হবার ঠিক কিছুক্ষণ আগে একজনকে মেইল করে গেছেন এমন একটি ল্যাপটপ থেকে যেটা কি না তার হাতের নাগালের বাইরে ছিল। এতোগুলো অসঙ্গতি দূর না করে এই তদন্ত শেষ হয় কিভাবে?"

ফারুক সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। "ওকে, তোমার যদি মনে হয় কেসটা আরো তদন্ত করতে হবে তুমি সেটা করতে পারো, কিন্তু..."

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল জেফরি বেগ।

"...সেটা যেন কেউ জানতে না পারে। অফিশিয়ালি এই তদন্ত এখন আমাদের জন্য ক্লোজড হয়ে গেছে। পুলিশকে আমরা সব তথ্য-উপাত্ত আর আলামত দিয়ে দিয়েছি। যদি তুমি নতুন কোনো কু পাও শুধু আমাকে জানাবে। আর কাউকে না। তারপর আমি ভেবে দেখবো কি করা যায়।"

শর্তটা মেনে নিলো জেফরি। "ঠিক আছে, স্যার।

উঠে দাঁড়াল সে, দরজার দিকে পা বাড়াতেই পেছন থেকে ফারুক আহমেদ বলল, "ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি সময় নষ্ট কোরো না। মনে রাখবে কেসটা এখন পুলিশ দেখছে।"

কোনো কথা বলল না জেফরি বেগ, শুধু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

অধ্যায় ৩১

পাভেল আহমেদ লা ডিপ্লোম্যাট বার থেকে সোজা বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছে একটা ইয়েলো ক্যাব নিয়ে। আজ একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছে। পকেটে প্রচুর টাকা থাকার কারণে নিজেকে সামলাতে পারেনি।

কথা ছিল স্বদেশ টিভির রিপোর্টার, তার বন্ধু হামিদ আলম বারে এসে তাকে বাকি পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে যাবে কিন্তু অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও সে আসেনি।

শেষে হামিদ আলমের কাছ থেকে পাভেল একটা ফোন পায়; সে জানায় একটা জরুরি কাজে আটকা পড়ে যাওয়ায় আজ আর আসতে পারছে না, কাল নিজে পাভেলের বাড়ি এসে টাকাটা দিয়ে যাবে। অফিস থেকে টাকাটা তুলে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছে সে। পাভেল যেন এ নিয়ে কোনো চিন্তা না করে।

এতো গেল পঁচিশ হাজার কিন্তু আগামীকাল দুপুরের মধ্যে যে দুই লাখ টাকা তার পকেটে চলে আসবে সেটা অবশ্য হামিদ আলম জানে না।

ইয়েলো ক্যাবে হাত পা ছড়িয়ে ভাবছে এরপর কি করবে।

পাভেল জানে স্বদেশ টিভির মালিক কে। ভদ্রলোক ঠিক কতো টাকার মালিক নিজেও জানে কি না সন্দেহ। এ রকম একজন ধনীর কাছে দুচার লাখ টাকা তেমন কিছু না। এখন তার আফসোস হচ্ছে দু'লাখ টাকা চেয়েছিল বলে। নজরটা একটু বড় করো, মনে মনে বলল সে। এখনও কিছু চাইতে গেলে খুব বেশি চাইতে পারে না সে। জন্মগত স্বভাব। নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্মালে এই এক সমস্যা। কিছু চাইতে গেলে নিজে থেকেই মনে হয় বেশি চেয়ে ফেললাম কি না।

যা হবার হয়েছে। ইন্টারভিউটা নিয়ে আর বেশি কিছু করবে না। এক জিনিস দু'বার বিক্রি করছে এটাই অনেক বেশি। কিন্তু ইন্টারভিউতে ছোট্ট একটা ঘটনার উল্লেখ আছে, আর কেউ না জানলেও সে জানে। জায়েদ রেহমান তার স্ট্রোকের জন্য একজনকে দায়ি করেছেন। স্ট্রোকের পর পর ইন্টারভিউটা নেয়া হয়েছিল তাই কথাটা তিনি মুখ ফসকে বলে ফেলেছন। এই ঘটনাটির জন্যেই চ্যানেল কর্তৃপক্ষ ইন্টারভিউটা চালাতে রাজি হয়নি। আর এখন এটাকে ধামাচাপা দেবার জন্যে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ উঠেপড়ে লেগেছে। তার পরবর্তী কাজ হবে সেই তথ্যটাকে কাজে লাগানো।

আবর্জনা যততা ঘাঁটা হবে ততোই দুর্গন্ধ বের হবে। তো আরেকটু ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখি না কি হয়?

ধনী হলেও অনেক সমস্যা! মানসম্মান রক্ষা করার ব্যাপারটা অনেক বড় হয়ে ওঠে তখন। সিদ্দিকী সাহেবও নিজের মানসম্মান রক্ষা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ঠিক আছে, আপনার মান সম্মান অক্ষত থাকবে। নো প্রবলেম! তো একটু খরচাপাতি করেন।

কথাটা ভাবতেই তার মাতাল ঠোঁটে মুচকি হাসি দেখা গেল।

ক্যাবের গতি কমে এলে আশেপাশে তাকিয়ে দেখতে পেল নিজের বাড়ির কাছে চলে এসেছে।

অবিবাহিত পাভেল এক রুমের একটা ঘরে একা থাকে। কিছু দিন আগেও মেসে ছিল কিন্তু এখন বেশ ভালো বেতন পায় বলে একটা আলাদা রুম ভাড়া নিয়েছে। সাংবাদিক বলে তাকে বেশ সমীহ করে বাড়ির মালিক। লোকটা আদম ব্যবসা করে সুতরাং পাভেলের মতো ক্রাইম রিপোর্টার তার বেশ উপকারে লাগে। দু'একবার ছোটখাট সমস্যায় পাভেল তাকে সাহায্যও। করেছে যার পুরস্কার হিসেবে মাসের এক তারিখে বাড়ি ভাড়া দিতেই হবে এ রকম একটি নিয়ম তার বেলায় প্রয়োগ করা হয় না।

ক্যাব থেকে নামার আগে চুলটা হাত দিয়ে আঁচড়ে জামাকাপড় ঠিকঠাক করে নিলো সে। নিজেকে ভদ্রস্থ করে সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে গেল যেন কেউ দেখে বুঝে না যায় সে মদ খেয়ে এসেছে।

প্রচর মদ খাওয়ার পর চার তলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে বেশ বেগ পেল সে, হাফিয়ে উঠল একেবারে। পকেট হাতরিয়ে চাবিটা বের করে ঘরে ঢুকেই অবাক।

তার চৌদ্দ ইঞ্চি রঙ্গিন টিভিটা চলছে। তবে কোনো শব্দ হচ্ছে না। এনিম্যাল প্রানেট নামের পাভেলের সবচাইতে অপছন্দের একটি চ্যানেলে চলছে টিভিতে!

দুপুরে ঘর থেকে বের হবার সময় টিভি সেটটা কি সে বন্ধ করে যায়নি?

নেশার ঘোরে মনে করতে পারল না। দরজাটা বন্ধ করে বাতি জ্বালিয়ে বিছানায় পড়ে থাকা রিমোটটা হাতে তুলে নিলো জঘন্য চ্যানেলটা বদলানোর জন্য। শুধু জন্তু জানোয়ারের কাজকারবার! মানুষ এই চ্যানেলটা দেখে কী করে!

রিমোটের বাটনে টিপ দেবার আগেই মাথার পেছনে প্রচণ্ড জোরে একটা আঘাত হতেই পাভেল আহমেদ টলে গেল। আচমকা চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেলে ক্ষণিকের জন্য তার কাছে মনে হলো বিদ্যুতের লোডশেডিং হয়েছে। বুঝি।

কিন্তু আর কিছু ভাবার সুযোগ পেল না সে।

কানে ভো ভো শব্দে পাভেল আহমেদের জ্ঞান ফিরে আসতে শুরু করল। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কেন বুঝতে পারছে না। দু'চোখ টেনে খোলার চেষ্টা করল সে।

প্রথমে ঘোলা ঘোলা দেখলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই দৃষ্টিটা স্পষ্ট হয়ে আসতেই চোখের সামনে তার সবচাইতে অপছন্দের চ্যানেলটা দেখতে পেল আবার।

শিকার ধরে উদরপূর্তি করছে দেখতে কদাকার একটি সিংহ।

টিভির আলো ছাড়া ঘরে আর কোনো আলো নেই। কয়েক সেকেন্ড পর সে বুঝতে পারল টিভি সেটের সামনে একটা হাতাওয়ালা চেয়ারে বসে আছে। তার দুহাত চেয়ারের হাতলের সাথে বাধা। তার দু'পা কি দিয়ে যেন বেধে রাখা হয়েছে, পাভেল আন্দাজ করতে পারল না। তবে তার মুখটা যে কাপড় দিয়ে শক্ত করে বেধে রাখা হয়েছে সেটা বুঝতে পারল বেশ ভালোভাবেই।

এক অজানা আশঙ্কায় পাভেল আহমেদের হৃদপিণ্ডটা হাতুড়ি পেটার মতো করে শব্দ করতে শুরু করল। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হলো তার। কিছুই বুঝতে পারছে না। যেন আচমকা তাকে ধরে নরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। নিজের ঘরটাকে এর আগে আর কখনই তার কাছে এতোটা ভীতিকর লাগেনি।

হঠাৎ তার গা ছম ছম করে উঠল। শরীরের সমস্ত পশম দাঁড়িয়ে গেল এক নিমেষে।

একটা আবছায়া মনুষ্যমূর্তি আস্তে করে পেছন থেকে চলে এল তার ঠিক সামনে। ঘরের আলোর স্বল্পতার কারণে চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। তবে খুব চেনা চেনা লাগছে তার কাছে। লোকটা একটু পিছিয়ে গিয়ে ঘরের এক কোণ থেকে একটা চেয়ার টেনে ঠিক তার সামনে বসে পড়লে টিভির আলোয় পাভেল আহমেদ চেহারাটা দেখতে পেল।

হায় আল্লাহ্!

অধ্যায় ৩২

আবেদ আলীর মোবাইলে দশ-পনেরোটি মেসেজ এসে জমা হয়েছে, সবগুলোই করেছে মিলি। একটারও জবাব দিতে পারেনি সে। একদমই ফুরসত পাচ্ছে না। সারাটা দিন গেছে বিভিন্ন কাজ করে। দারুণ ব্যস্ততা যাচ্ছে আজ।

কবি হামিদ কায়সারের ব্যারিস্টার বন্ধু বলেছে বইটা প্রকাশ করার ব্যাপারে তার কোনো আইনী ঝামেলা হবে না। কপিরাইটের নিয়ম অনুযায়ী জায়েদ রেহমানের সাবেক স্ত্রী গোলনূর আফরোজ তরফদারকে প্রাপ্য টাকা দিয়ে দিলেই হবে।

কথাটা শোনার পর থেকেই আবেদ আলী দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিয়েছে। অনেক দিন পর কাজেকর্মে এতো ব্যস্ততায় সারাটা দিন কাটছে তার। বইটা যতো দ্রুত সম্ভব প্রকাশ করতে হবে। এটাই এ মুহূর্তে তার একমাত্র চ্যালেঞ্জ।

লেখক জায়েদ রেহমানের মৃতদেহ এখনও পড়ে আছে হাসপাতালের পোস্টমর্টেম রুমে। শোনা গেছে দুদিন পর তার লাশ দাফন করার সম্ভাবনা রয়েছে। আবেদ আলী চাচ্ছে যে করেই হোক দুদিনের মধ্যেই বইটা প্রকাশ করতে। একেবারে তাক লাগিয়ে দেবে সবাইকে।

কিন্তু তার ম্যানেজার আর কর্মচারীরা এখনও এসবের কিছুই জানে না, তাদেরকে শুধু বলা হয়েছে পাঁচশ' পৃষ্ঠার একটি নতুন বই প্রকাশ করতে হবে দুদিনের মধ্যে। বইটা বের হবার ঠিক আগে সবাইকে জানাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। আর এ কারণে তাকেই সব ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।

পুরো পাণ্ডুলিপি একদম রেডি, তারপরও কবি হামিদ কায়সারকে দিয়ে একটু দেখিয়ে নিচ্ছে। পাঁচশ' পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি দেখা মুখের কথা নয় তবে হামিদ কায়সার বন্ধুর জন্যে কাজটা করতে রাজি হয়েছে।

দুটো স্প্যানিশ ভদকা স্মিরনফ নিয়ে আবেদ আলীর বাড়িতে বসেছে তারা। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের সাথে যোগ দেবে আর্টিস্ট মাসুম তারেক। বিকেলের দিকে আবেদ আলী তাকে ফোন করে জরুরি ভিত্তিতে জায়েদ রেহমানের সর্বশেষ বই, তার আত্মজৈবনীমূলক উপন্যাস কথার জন্য একটা প্রচ্ছদ করে দিতে বলেছে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা বইয়ের প্রচ্ছদ! কথাটা শুনে প্রথমে রাজি না হলেও নিয়মিত পারিশ্রমিকের তিনগুন প্রস্তাব দেয়াতে কাজটা করতে সম্মত হয়েছে সে। কথা দিয়েছে রাত এগারোটার পর আবেদ আলীর বাড়ি এসে প্রচ্ছদটার সিডি দিয়ে যাবে সেই সাথে একটু পানাহার করবে গভীর রাত পর্যন্ত।

টাকা আর মদ দুটোর টোপই দেয়া হয়েছে। আবেদ আলী জানে দ্বিতীয়টার জন্যে এই আর্টিস্ট বেশি লালায়িত।

কবি হামিদ কায়সার সেই বিকেল থেকে বিরতিহীনভাবে কথা' নামের জায়েদ রেহমানের আত্মজৈবনীমূলক উপন্যাসটির প্রুফ দেখে যাচ্ছে। খুব একটা ভুল নেই। কিছু বানানের ভুল আর অনেক জায়গায় এক কথা দু'বার টাইপ করা হয়েছে। তারপরও পাঁচশ' পৃষ্ঠার একটি বই পড়ে শেষ করা যেইসেই কথা নয়।

সন্ধ্যার পর থেকে তার পড়ার গতি আরো বেড়ে গেছে ভদকার আর্বিভাবে। আবেদ আলীর ড্রইংরুমের মেঝেতে কার্পেটের উপর তারা হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে। কবির চোখ প্রিন্ট করা পাণ্ডুলিপির দিকে থাকলেও ভদকার গ্লাসে চুমুক দিয়ে যাচ্ছে ঘনঘন।

বইটা যতোই পড়ছে ততোই অবাক হচ্ছে হামিদ কায়সার। উল্লেখযোগ্য অংশগুলো জোরে জোরে আবৃত্তি করে শোনাচ্ছে পাশে বসে থাকা আবেদ আলীকে, সে ব্যস্ত আছে প্রোডাকশন কস্টের হিসেব নিয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ভালো আবৃত্তি করতে হামিদ কায়সার, এখনও মাঝেমধ্যে স্বরচিত কবিতাপাঠের অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করতে হয় তাকে, দরাজ কণ্ঠে চুম্বক অংশগুলো রসিয়ে রসিয়ে আবৃত্তি করে বেশ মজা পাচ্ছে সে।

"জায়েদ রেহমান এতোটা সাহসী আগে জানতাম না," পাণ্ডুলিপি থেকে চোখ না সরিয়েই বলল হামিদ কায়সার। শব্দ করে ভদকার গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিল।

"কিন্তু আমি যতোদূর জানি সে মোটেও সহাসী ছিল না," দ্বিমত পোষণ করল আবেদ আলী। "সব সময় একটা ভণ্ডামির মুখোশ পরে থাকতো। নিজেকে একজন রহস্যময় মানুষ হিসেবে প্রজেক্ট করতো, আর এই কাজটা করতো একেবারে পরিকল্পনা করে।"

"তবে এখানে সে অনেক সাহসী কথা লিখেছে। হয়তো শেষের দিকে রিয়ালাইজ করতে পেরেছিল। দেখো না এখানে কি লিখেছে :

" 'নিজের মেয়ের বান্ধবী বর্ষার সাথে কেন জড়াতে গেলাম? এই প্রশ্নটি আমি অনেকবারই করেছি নিজেকে। আমার প্রথম স্ত্রী গোলনূরকে নিয়ে আমার তো কোনো আক্ষেপ ছিল না। তারপরও আমি আস্তে আস্তে বর্ষার দিকে ঝুঁকেছি। পরিবার, সমাজ সংসার সবকিছুকে তোয়াক্কা না করে এগিয়ে নিয়ে গেছি এই সম্পর্কটি আমার নিজের মেয়ে আর ছেলে লজ্জায় ঘৃণায় আমাকে পরিত্যাগ করেছে। এখন জীবনের এ পর্যায়ে এসে স্বীকার করতেই হচ্ছে আমি একজন উভকামী। হতে পারে এটা আমার এক ধরণের রোগ। মৃত্যুরদ্বারপ্রান্তে এসে আমি আরো স্বীকার করছি আমি একজন পেডেরাস্ট ছিলাম..."

পাণ্ডুলিপি থেকে মুখ তুলে তাকাল হামিদ কায়সার। "উভকামী!? পেডেরাস্ট!? আবেদ ভাই, অল্পবয়সি মেয়েদের ব্যাপারে জায়েদ রেহমানের ঝোঁক ছিল জানতাম কিন্তু উভকামী, পেডেরাস্ট!?"

আবেদ আলী কাঁধ তুলল। "আমি অবশ্য এ রকম কোনো কথা শুনিনি।"

"জায়েদ সাহেব নিজের বারোটা বাজালেও আপনার কিন্তু কপাল খুলে দিয়ে গেছে।"

আবেদ আলীও জানে সেটা। তবে মুখে কিছু বলল না।

"আমি কোনো বাঙালী লেখকের আত্মজীবনীতে এ রকম সাহসী কথা পড়িনি। সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র ফরাসি ঔপন্যাসিক আঁদ্রে জিদই প্রথম নিজেকে পেডেরাস্ট বলে স্বীকার করেছিলেন।"

"কিন্তু পাঠক ব্যাপারটা কিভাবে নেবে বলে মনে করেন?" জানতে চাইল আবেদ আলী।

"কমার্শিয়ালি এটা হবে এ দেশের সবচাইতে বেশি বিক্রিত বই, এটা আমি বলতে পারি... আর পাঠক কিভাবে নেবে? উমমম...একেকজন একেকভাবে নেবে। কেউ হয়তো জায়েদ রেহমানের এই স্বীকারোক্তিটাকে সাধুবাদ জানাবে, কেউ হয়তো তার এসব কথা পড়ে তাকে আরো বেশি ঘৃণা করবে। কিন্তু যা-ই করুক না কেন পকেট ভারি হবে আপনারই।"

আবেদ আলী এবারো কিছু বলল না। যেন জবাব দেবার হাত থেকে বাঁচার জন্যেই ভদকার গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিতে লাগল।

এমন সময় ড্রইংরুমে এসে হাজির হলো আর্টিস্ট মাসুম তারেক। বাড়ির কাজের লোককে আগে থেকেই বলে রাখা ছিল সে এলে তাকে যেন সরাসরি ড্রইংরুমে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

"আরে আর্টিস্ট," আবেদ আলী উঠে দাঁড়াল। "আসো আসো। এখনও পুরো একটা বোতল ইনট্যাক্ট আছে।"

প্রথমে আবেদ আলী এবং পরে কবি হামিদ কায়সারের সাথে হাত মিলিয়ে কার্পেটের উপর বসে পড়ল সে। "ভাই, সেই বিকেল থেকে আপনার কাজ করে যাচ্ছি, একদম টায়ার্ড। আগে মাল দিন। একটু টেনে দম নিয়ে নেই।"

আবেদ আলী হাসতে হাসতে আর্টিস্টের জন্য এক গ্লাস ভদকা ঢেলে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “আমার কাজ কতো দূর?”

কথাটা আমলেই নিলো না আর্টিস্ট। পুরো এক গ্লাস ভদকার অর্ধেকটা এক ঢোকে শেষ করে হাসি হাসি মুখে তাকাল আবেদ আলীর দিকে। “ফাটাফাটি একটা কভার করেছি। এতো দ্রুত এ রকম ভালো কাজ জীবনেও করিনি।”

“পুরো কাজ শেষ?”

গ্লাসের বাকিটুকু শেষ করে ফেলল আর্টিস্ট মাসুম তারেক। “শেষ!”

“কোন্টার কথা বলছো, ভদকার না আমার কাজের?” আবেদ আলী ঠাট্টাচ্ছলে বলল।

দাঁত বের করে হাসল মাসুম তারেক। “দুটোই।”

তারা তিনজনেই হো হো করে হেসে উঠল একসঙ্গে।

অধ্যায় ৩৩

পাভেল আহমেদের দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে আছে। মুখ শক্ত করে বাধা সেজন্যে কোনো কথা বলতে না পারলেও এক ধরণের চাপা গোঙানী বের হচ্ছে।

তার সামনে যে লোকটি তার দিকে ঝুঁকে আছে সে একেবারেই ধীরস্থির আর শান্ত। দেবদূতের মতো ফুটফুটে চেহারার এই যুবককে এ শহরে হাতেগোনা যে অল্প কয়েকজন লোক চেনে তাদের মধ্যে পাভেলও রয়েছে। ক্রাইম রিপোর্টার হিসেবে অনেক সন্ত্রাসী আর মাস্তানের মুখোমুখি হয়েছে সে কিন্তু তার সামনের এই যুবকটি সেরকম কেউ না, আর এটাই হলো তার ভয়ের কারণ।

একজন পেশাদার খুনি!

একটা ভয় জেঁকে বসল তার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে সারা গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেল। যুবকটি ঠিক তার সামনে আরেকটা চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল পাভেলের দিকে।

"তুমি জানো আমি কেন এখানে এসেছি।" খুব কোমল করে বলল কথাটা।

গোঙানীর মতো একটা শব্দ করল পাভেল।

"ওটা কোথায়?" জানতে চাইল অজ্ঞাত যুবক।

আবারো গোঙানী হলো।

"ও!" কোমর থেকে একটা অটোমেটিক পিস্তল বের করল সে। "আমি এখন তোমার মুখের বাধন খুলে দেবো, তুমি শুধু বলবে ওটা কোথায় রেখেছে। এর থেকে বেশিও না... কমও না। ঠিক আছে?"

পাভেল আহমেদ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল।

"আমার কথা বুঝতে পারছো?"

উদভ্রান্তের মতো মাথা দোলাল সে।

"গুড।"

মুখের বাধন খুলে দেবার পর পাভেল আহমেদ বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে নিলো। কিন্তু যুবকের হাতে পিস্তলটা দেখে চিৎকার করার সাহস দেখাতে পারল না।

"ওটা কোথায় রেখেছো?" আবারো জানতে চাইল সে।

"কিসের কথা বলছেন?" ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল পাভেল আহমেদ।

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল যুবক। যেন অবুঝের মতো একটা কথা বলে। ফেলেছে সাংবাদিক। "যে জিনিস তুমি দু'বার বিক্রি করতে চাইছো।"

"আমাকে খুন করবেন না। প্লিজ। আমি ওটা দিয়ে দিচ্ছি। প্লিজ। আমাকে।"

হিস্ শব্দ করে মুখে আঙুল দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল অজ্ঞাত যুবক। "শুধু ওটা কোথায় রেখেছো সেটাই বলবে। অন্য কিছু না," বলেই পিস্তলটা তার মুখের সামনে তুলে ধরল।

"ঐ যে...টিভির পাশে যে ড্রয়ারটা আছে..."

"কোন্ ড্রয়ারে?"

"উপরেরটায়..." বলেই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল পাভেল।

যুবক ড্রয়ারটা হাতরে ক্যাসেটটা পেয়ে গেল খুব সহজেই। পাভেলের দিকে দেখিয়ে বলল, "এটাই তো?"

"হ্যাঁ..."

পকেটে ভরে রাখল সেটা। তারপর আবারো পাভেলের সামনে এসে বসল সে। "আর কোনো ব্যাকআপ রেখেছো?"

“না।”

মুচকি হাসল যুবক। “এখনও সময় আছে, পরে যদি জানতে পারি আরেকটা রেখে দিয়েছো তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হবে।”

পাভেল আহমেদ একটু আশার আলো দেখতে পেল। তার মানে আমাকে এখন খুন করবে না! “সত্যি বলছি। আর কোনো কপি নেই। আপনি পুরো ঘর তল্লাশী করে দেখতে-”

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল দেবদূতের মতো দেখতে যুবকটি। পাভেল এতোক্ষণে খেয়াল করেনি বিছানার সাইডটেবিলের উপর একটা বিদেশি মদের বোতল আর একটা গ্লাস রাখা আছে। যুবক সেই বোতলটা হাতে তুলে নিয়ে আয়েশী ভঙ্গিতে পাভেলের সামনে এসে বসল আবার। “তোমার ঘরে একটাই গ্লাস দেখতে পাচ্ছি। মেহমান এলে কিভাবে আপ্যায়ন করো কে জানে। সমস্যা নেই। আমি গ্লাসে খাচ্ছি। তুমি বোতল থেকে খাও।” বলেই বোতলটা বাড়িয়ে দিল পাভেলের দিকে।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল পাভেল।

“খাও।” তাড়া দিল যুবক।

“বারে অনেক খেয়েছি...আর খেতে ইচ্ছে করছে না।”

“তোমাকে এখন খেতেই হবে। অর্ধেক বোতল খেয়ে মাতাল হবে তারপর আমি তোমার কাছ থেকে কিছু সত্য কথা জেনে নেবো। আমি জানি, মাতাল না হলে তুমি সত্য বলবে না।”

“আপনি আমাকে বলুন, আমি সব বলবো। যা জানতে চান-”

যুবক তার পিস্তলটা পাভেলের কপালে ঠেকালো। “আমি যা বলবো তাই করবে। কোনো প্রশ্ন করবে না।”

“ঠিক আছে। খাচ্ছি,” কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল পাভেল। “এটা সরিয়ে রাখুন। আমি খাচ্ছি।” পিস্তলের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

যুবক পিস্তলটা নামিয়ে রাখল। পাভেলের হাত-পায়ের বাধন না খুলেই বোতলটা তার মুখে ঠেসে ধরল সে। ভয়ে বাধ্য ছেলের মতো আকণ্ঠ পান করে গেল পাভেল আহমেদ। জীবনে আর কখনও মদ নামক জিনিসটা এতো বিস্বাদ আর তেতো লাগেনি তার কাছে। বুঝতে পারল প্রচণ্ড ভয়ে খাচ্ছে বলে এমনটি হচ্ছে।

বোতলটা অর্ধেকের মতো খালি হয়ে গেলে যুবক সেটা তার মুখ থেকে সরিয়ে নিজের চোখের সামনে তুলে ধরল। “চলবে।” কথাটা বলেই বোতলটা বিছানার উপর ফেলে দিলে বোতলের বাকি মদ গড়িয়ে পড়ল সেখানে।

পাভেল আহমেদ বিস্ময়ে চেয়ে রইল সেদিকে। তারপর যুবকের দিকে ফিরে বলল, “কি জানতে চান, বলুন?”

যুবক স্থির চোখে তাকাল তার দিকে। নিজের মুখের কাছে তর্জনী এনে চুপ করতে ইশারা করে পিস্তলটা পাভেলের মুখের কাছে ধরে শান্ত কণ্ঠে বলল, “আমি এখন চলে যাবো। মনে রাখবে তোমার সাথে আমার দেখা হয়নি...তুমি আমাকে চেনো না। ঠিক আছে?”

পাভেল আহমেদ ভয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল।

“তুমি বেশ বুদ্ধিমান। আশা করি বাকিটা আর বলে দিতে হবে না।”

“বুঝতে পেরেছি। কিছু বলবো না। কাউকে কিছু বলবো না।”

“গুড।” যুবক এরপর পাভেলের হাত-পায়ের বাধন খুলে দিয়ে পাভেলকে উঠে দাঁড়াতে বলল। “আমি চলে গেলে চুপচাপ দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকবে। কাউকে ফোন করবে না।”

পাভেল মাথা নেড়ে সায় দিল আবারো।

“আমি বাইরে থেকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য রাখবো। তুমি যদি কিছু করো...”

“আমি কিছু করবো না। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, কাঁপাকাপা গলায় বলল পাভেল।

পাভেলের গালে আলতো করে চাপড় মেরে দরজার দিকে পা বাড়াল সে। দরজাটা আস্তে করে খুলে সিঁড়ির দিকটা দেখে নিয়ে পাভেলের দিকে ফিরল আবার। “যা বললাম তাই করবে।”

পাভেল উদভ্রান্তের মতো মাথা দোলাল। এই দানব যতো জলদি তার ঘর থেকে বের হয়ে যায় ততই মঙ্গল।

“গুড,” বলল অজ্ঞাত যুবক। “আরেকটা কথা মনে রাখবে...কোটিকোটি টাকার মালিকদের কখনই ব্ল্যাকমেইল করবে না...” কথাটা বলেই বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

পাভেল আহমেদ সঙ্গে সঙ্গে দরজার লক বন্ধ করে দিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচলো যেন। প্রচুর মদ খাওয়াতে মাথাটা চক্কর দিতে শুরু করেছে। বিছানার উপর ধপাস করে বসে পড়ল সে। এ যাত্রায় অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। এখনও ভয়ে থর থর করে কাঁপছে তার সারা শরীর।

কিছুক্ষণ পরই টের পেল তার নিশ্বাস আবার দ্রুত হয়ে উঠছে। কিন্তু কেন বুঝতে পারল না।

দশ মিনিট পর হাত-পা মৃগীরোগীর মতো কাঁপতে শুরু করলে অজানা এক আশঙ্কায় পাভেল আহমেদ পকেট হাতরিয়ে মোবাইলটা বের করার চেষ্টা করল।

নেই!

মোবাইলটা গেল কোথায়?

দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। বিছানা থেকে উঠে দরজার কাছে এগোতেই বুঝতে পারল দুপা অবশ হয়ে গেছে।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

*

পাভেল আহমেদের বাড়ি থেকে দুশ গজ দূরে এক নিরিবিলি রাস্তা দিয়ে কালো জ্যাকেট আর কালো প্যান্ট পরা দেবদূতের মতো দেখতে এক যুবক ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে।

রাস্তার পাশে ফুটপাতে প্রচণ্ড শীতের রাতে চট আর ছেঁড়াফাড়া কম্বল মুড়ে কুঁকড়ে পড়ে আছে এক বুড়ো। যুবকটি সেই লোকের দিকে এগিয়ে গেল। আস্তে করে হাঁটু মুড়ে বুড়োর পাশে একটা দামি মোবাইল ফোন রেখে আবার হাঁটতে লাগল ধীর পায়ে।

অধ্যায় ৩৪

লেখক জায়েদ রেহমান খুন হবার তিন দিন পর তার আত্মীয়স্বজনের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হলো। পোস্টমর্টেম খুব দ্রুত সম্পন্ন হলেও আইনগত কিছু ঝামেলার কারণে এই দেরি। ঐ দিন বিকেলেই তার জানাযা শেষে দাফন করার সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে।

এদিকে বিস্ময়করভাবেই দ্রুততার সাথে জায়েদ রেহমানের সর্বশেষ বই কথা'র কাজ শেষ করে ফেলেছে প্রকাশক আবেদ আলী। এমনিতে একটি পত্রিকা রাখলেও আজকের জন্যে তিনটি দৈনিক পত্রিকা রেখেছে সে। জায়েদ রেহমানের নতুন বইয়ের চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন দিয়েছে এইসব পত্রিকায়।

তিনটি পত্রিকা খুলেই আবেদ আলী বিজ্ঞাপনগুলো ভালো করে দেখে সন্তুষ্ট হলো। সে নিশ্চিত প্রকাশনা ব্যবসার সবাই নড়েচড়ে বসবে এই বিজ্ঞাপনগুলো দেখে। বিজ্ঞাপনের ভাষা লিখে দিয়েছে তার কবি বন্ধু হামিদ কায়সার। একেবারে ভিন্নভাবে তৈরি করা হয়েছে এই বিজ্ঞাপনটি। যতোই দেখছে আবেদ আলী ততোই মুগ্ধ হচ্ছে। জায়েদ রেহমানের চমৎকার একটি রঙ্গিন ছবি, তার পাশে সাদা আর হলুদ রঙের অক্ষরে কিছু কথা লেখা :

খুন হবার কিছুক্ষণ আগে জনপ্রিয় লেখক জায়েদ রেহমান তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে একটি ই-মেইল করে নিজের এই আত্মজীবনীটি প্রকাশ করার তাগিদ দেন ...যতো বাধাই আসুক এই বইটি প্রকাশ কোরো...তোমার সাথে হয়তো আর দেখা হবে না...আমাকে ক্ষমা করে দিও...! না। আমরা কোনো বাধাই তোয়াক্কা করিনি। লেখকের শেষ ইচ্ছেকে সম্মান জানিয়ে প্রকাশ করা হলো কথা! এটি জায়েদ রেহমানের শেষ কথা! এটি তাঁর সব কথা!

দু'দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে একটি অসাধ্য কাজ করেছে সে। লেখক জায়েদ রেহমানের লাশ দাফন হওয়ার আগেই তার সর্বশেষ একটি বই প্রকাশ হতে যাচ্ছে অবয়ব প্রকাশনী থেকে খুব সম্ভবত এ রকম একটি কাজ ইতিহাসেই বিরল।

এমন সময় তার মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলে আবেদ আলী সেটা রিসিভ করল। তার কবি বন্ধু হামিদ কায়সার ফোন করেছে।

"হ্যাঁ, কি খবর?"

"নির্মল প্রকাশনী থেকে ফোন করেছিল আপনাকে?" কবি জানতে চাইল।

"না!" বিস্মিত হলো আবেদ আলী। "ওরা কেন আমাকে ফোন করবে?"

এই নির্মল প্রকাশনী হলো আবেদ আলীর দু'চোখের বিষ। কাপড় ব্যবসায়ি থেকে প্রকাশক বনে যাওয়া এক অর্বাচীন শুধুমাত্র টাকার জোরে লেখক জায়েদ রেহমানকে তার কাছ থেকে অনেকটা ছিনিয়ে নিয়েছে দু'বছর আগে।

"ওরা তো আজব একটা কথা বলছে..."

"কি বলছে?" উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল অবয়ব প্রকাশনীর সত্ত্বাধিকারী।

"বলছে লেখক জায়েদ রেহমানের সর্বশেষ বইয়ের পাণ্ডুলিপি না কি তাদের কাছে আছে। তারাই না কি এর বৈধ প্রকাশক।"

আবেদ আলী ক্রোধে ফেঁটে পড়ল। "তাদের কাছে যদি সত্যি পাণ্ডুলিপিটি থেকে থাকে তাহলে প্রকাশ করছে না কেন!?" দু'বছর ধরে তারা জায়েদ রেহমানকে কজা করে রেখেছিল, এখন আবার নতুন নাটক শুরু করেছে। "কে ফোন করেছিল?"

কবি হামিদ কায়সার শান্ত কণ্ঠে বলল, "একটু আগে বিজ্ঞাপন দেখে কুদরত সাহেব নিজে আমাকে ফোন করে বললেন।"

এই কুদরত সাহেব হলো নির্মল প্রকাশনীর মালিক।

"আচ্ছা," বলল আবেদ আলী। "আর কি বলল?"

“বলল বইটা যদি প্রকাশ করা তাহলে সে না কি আদালতে যাবে।”

একটু ভাবলো আবেদ আলী। “আদালতে গেলে যাবে আমার কি করার আছে? আমি তো বইটা চুরি করে আনিনি, জায়েদ নিজে আমাকে সেটা দিয়ে গেছে।”

“আমাকে ফোন করে বার বার বলল আমি যেন আপনাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে এ কাজ করা থেকে বিরত রাখি। তা না হলে আজ সন্ধ্যায় তারা না কি একটি প্রেসকনফারেন্স ডাকবে।”

“প্রেসকনফারেন্স ডাকবে!”

“হ্যাঁ।”

“শালার সাহস কতো বড়! আমি হাজার হাজার কপি বই বের করে তাদের ভয়ে গুদামে রেখে দেবো?” আবেদ আলী ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। “মনে। করেছে তার এই হুমকিতে আমি পেচ্ছাব করে দেবো, অ্যাঁ?”

“আমার মনে হয় আমার ব্যারিস্টার বন্ধুর সাথে এ নিয়ে কথা বলা দরকার। আপনি কি বলেন?”

“অবশ্যই। এক্ষুণি কথা বলতে হবে।”

“তাহলে আমার এখানে চলে আসুন। দু’জন এক সঙ্গেই যাই।”

একটু ভেবে আবেদ আলী জানাল, “ঠিক আছে, আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি।”

*

সাংবাদিক পাভেল আহমেদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো সকাল দশটার দিকে। বাড়িওয়ালা নিজে কী একটা প্রয়োজনে পাভেল আহমেদের খোঁজ করতে গিয়ে আবিষ্কার করে সাংবাদিক নিজের ঘরে মরে পড়ে আছে।

একটু বেশি পান করে ফেলায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রাতের কোনো এক সময় মৃত্যু হয়েছে তার-পুলিশ এটাই ধরে নিয়েছে।

ঘরের দরজা ভেতর থেকে লক্ করা ছিল, আর বিছানায় একটা খালি মদের বোতলও খুঁজে পাওয়া গেছে। অতিরিক্ত মদ্যপানই যে মৃত্যুর একমাত্র কারণ সে ব্যাপারে কারোর মনে কোনো সন্দেহ দেখা দিল না। অপমৃত্যুর জন্য কোনো মামলাও রেকর্ড করা হলো না পুলিশের খাতায়। ফলে তার এই মৃত্যু নিয়ে তেমন একটা হৈচৈ হলো না বলা চলে। কারো মনে হলো না জ্বলজ্যান্ত একজন সাংবাদিক এভাবে মরে গেল কেন।

পাভেল আহমেদের ঘরে সব কিছু অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেলেও পুলিশ তার ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনটি খুঁজে না পেয়ে সেটাতে রিং দিতেই অনেকক্ষণ পর এক বৃদ্ধ ভয়ার্ত কণ্ঠে জবাব দিল। সে জানাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই পায়ের কাছে এই ফোনটা পড়ে থাকতে দেখে। নিতান্তই একজন বাস্তুহারা, থাকে পাভেল আহমেদের বাড়ির খুব কাছের একটা ফুটপাতে।

পাভেল আহমেদ একজন সাংবাদিক হলেও তার মৃত্যুর খবর কোনো টিভি চ্যানেল আর পত্রিকায় গুরুত্ব পেল না কারণ এদিনের সবচাইতে বড় খবর ছিল লেখক জায়েদ রেহমানের নামাজে জানাযা এবং তার সর্বশেষ একটি বই প্রকাশের ঘটনা।

লেখকের জানাযা আর সকারের অনুষ্ঠান বেশিরভাগ চ্যানেলই লাইভ ব্রডকাস্ট করল আর পরদিন সমস্ত দৈনিক পত্রিকায় এই একটি খবরই ঠাঁই পেল প্রধান শিরোনাম হিসেবে।

অবশ্য পাভেল আহমেদ যে পত্রিকায় কাজ করতো তারা ভেত দু’কলামের একটা বক্সনিউজ করলেও অন্য দুয়েকটি পত্রিকা এক কলামে ছোট্ট একটা দায়সারাগোছের নিউজ করল। বাকিরা তাও করল না।

জায়েদ রেহমান সংক্রান্ত সংবাদের ডামাডোলে খবরটা খুব বেশি লোকের চোখেও পড়ল

না।

অধ্যায় ৩৫

কুদরত হোসেনের মেজাজ বিগড়ে আছে। কোনোভাবেই ঘুম আসছে না তার। এমনিতেই দু'তিন ধরে মনের অবস্থা ভালো যাচ্ছে না, তার উপর এই ঘটনা তার ব্লাড প্রেসার আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

লেখক জায়েদ রেহমানের মৃত্যুতে কার কি ক্ষতি হয়েছে সে জানে না, সে শুধু জানে, অপরিমেয় ক্ষতি হয়ে গেছে তার। সোনার ডিম পাড়া হাঁসের মৃত্যু হলে যেমন হয় আর কি।

এই যে তার আজকের প্রতিষ্ঠা সেটা তো এককভাবে লেখক জায়েদ রেহমানের কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে। প্রকাশক হিসেবে সম্মান আর প্রতিপত্তির সাথে কোটি টাকার মালিকও বনে গেছে সে। তাই জায়েদ রেহমানের মৃত্যুতে অনেক কষ্ট পেলেও মেনে নিয়েছিল। জন্ম-মৃত্যুর উপর তো মানুষের হাত থাকে না। সবাইকে একদিন না একদিন মরতেই হয়। কিন্তু অবয়ব প্রকাশনী এ কী বলছে! জায়েদ রেহমান তার শেষ বইটা তাদেরকে দিয়ে গেছে!?

এই বইটির কাজ লেখক শুরু করেছিলেন তার হার্ট অ্যাটাক হবারও আগে, ওপেন-হার্ট সার্জারির পর পরই। সে জানে, এখনও ওটা শেষই হয়নি, অথচ অবয়ব প্রকাশনী আজকে বইটি প্রকাশ করে ফেলেছে!

অসম্ভব।

বেশ বড় একটা বই-ধীরে ধীরে সময় নিয়ে লিখছিলেন লেখক। কুদরত হোসেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল বইটির লেখা শেষ হবার জন্য। এ বাবদ কয়েক লাখ টাকাও দিয়ে দিয়েছিল লেখককে। গত সপ্তাহে যখন জায়েদ রেহমানের সাথে দেখা করতে গেল তখনও লেখক তাকে জানালেন বইয়ের কাজ অনেকটুকুই বাকি আছে। তাকে কথা দিলেন, সামনের বই মেলার ঠিক আগে কাজটা শেষ করতে পারবেন বলে। বই মেলা আসতে তো এখনও দেড়মাস বাকি। এই সময়ের মধ্যে অবশ্যই লেখাটা শেষ করতে পারতেন।

তাছাড়া মিসেস রেহমানের সাথে তার নিয়মিত যোগাযোগ আছে। জায়েদ রেহমান খুন হবার আগের দিনও তার সাথে কথাবার্তা হয়েছে, মিসেস রেহমান বলেছিল জায়েদ রেহমান না কি এখন অন্য একটা উপন্যাস লিখছে, আত্মজীবনীর কাজ আপাতত বন্ধ আছে।

কোনোভাবেই হিসেব মেলাতে পারছে না কুদরত হোসেন। মিসেস রেহমান নিজেই এখন খুনের দায়ে জেলে আছে, সে থাকলে জানা যেতো আসলে কি হয়েছে।

বিগত দু'বছর ধরে যে লেখকের বই ছেপে যাচ্ছে সে তার সবচাইতে আলোচিত এবং সাড়া জাগানো বইটি কি না ছেপে বসেছে অবয়ব প্রকাশনীর আবেদ আলী! এই আবেদ আলী লোকটি যেমন তাকে অপছন্দ করে ঠিক তেমনি সেও তাকে প্রচণ্ড ঘৃনা করে।

কী অহংকার। তাকে বলে কি না অশিক্ষিত প্রকাশক! তার কাপড়ের ব্যবসার কথা ইঙ্গিত করে সবার কাছে বলে বেড়ায় হাঁটু ভেঙে যে বসে বসে কাপড় কাটতো সে হয়েছে প্রকাশক!

এখন এই উন্নাসিক আর অহংকারী লোকটা তাকে টেক্কা মেরে দিয়েছে। এটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না। তার সাথেই তো জায়েদ রেহমান কথাই বলতো না!

অসম্ভব!

প্রেসকনফারেন্স করেছে আজ সন্ধ্যার দিকে, তার আগে বিকেলের দিকে আদালতে গিয়ে মামলাও করে এসেছে কিন্তু তাতে কিছুই হচ্ছে না। বইটা হটকেকের মতো বিক্রি হচ্ছে। আদালত থেকে নিষেধাজ্ঞা চেয়েছিল কিন্তু সেটা পাওয়া যাবে এক সপ্তাহ পর।

নিজের টেনশন দূর করার জন্য স্লিপিং পিল খেলো কুদরত হোসেন। এক ঘন্টা আগেও একটা খেয়েছিল কাজ হয়নি।

বেডসাইড ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ১২:৫০।

তার পাশেই তার বউ কী নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। এভাবে ঘুমাতে পারলে হাই প্রেসারটা একটু নিয়ন্ত্রণে আনা যেতো। দুচোখ বন্ধ করে মাথা থেকে সব রকম ব্যবসায়িক চিন্তা বাদ দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করল নির্মল প্রকাশনীর কুদরত হোসেন।

মাঝরাতের দিকে তার ঘুম ভেঙে গেল ল্যান্ডফোনের রিঙের শব্দে। প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে উঠে বসল বিছানায়। এতো রাতে কোন্ গর্দভ ফোন করল তাকে?

রিংঙের শব্দে তার বউয়েরও ঘুম ভেঙে গেল। "আরে ফোনটা ধরো না।"

ফোনটা তুলে নিলো কুদরত হোসেন। "হ্যালো!"

"আমি মোরশেদ, স্যার," একটা কণ্ঠ বলল তাকে।

"মোর্শেদ...?" কুদরত সাহেবের নির্মল প্রকাশনীর ম্যানেজার।

"স্যার"

"এতো রাতে আমাকে কেন ফোন করেছো?" তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে জানতে চাইল কুদরত হোসেন।

"স্যার, আমাদের অফিসে চুরি হয়েছে। ওখানকার দারোয়ান একটু আগে আমাকে ফোন করে জানাল।"

"কি?" কুদরত সাহেব নড়েচড়ে বসল।

"আমি এখন ওখানেই যাচ্ছি। পুলিশকে খবর দেয়া হয়েছে।"

"অফিসে চুরি হয়েছে! ওখানে তো আমরা টাকা-পয়সা রাখি না। শুধু কিছু বই আর..." কুদরত হোসেন আর বলতে পারল না। "হায় হায়!"

"স্যার...?" উদ্বেগের সাথে বলল ম্যানেজার।

"জলদি যাও। দ্যাখো কি কি চুরি হয়েছে..."

কুদরত সাহেব জানে তার কম্পিউটারে অনেক বইয়ের পাণ্ডুলিপি রয়েছে কিন্তু সেটা তো চুরির করার মতো বস্তু নয়। পাণ্ডুলিপি চুরি করলেই তো আর সেটা প্রকাশ করা যাবে না। তাহলে...?

"জি, স্যার," বলল ম্যানেজার। "আপনি চিন্তা করবেন না, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি ।"

"হ্যাঁ, ওখানে গিয়ে আমাকে জানাও কি চুরি হলো।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

কুদরত সাহেব ফোনটা রেখে দিল। টের পেল হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে। তার প্রকাশনা অফিসে চুরি করার মতো এমন কিছু থাকে না।

তবে হ্যাঁ, একটা জিনিস আছে যেটা চোরের লক্ষ্যবস্তু হতে পারে। খুব সম্ভবত সেটাই চুরি হয়েছে।

অধ্যায় ৩৬

লেখক জায়েদ রেহমানকে চিরনিদ্রায় শায়িত করতে না করতেই তার সর্বশেষ বইটি নিয়ে আরেকটি নতুন বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে, আর ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত গড়িয়েছে আদালতে।

এই খবরটা ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগকে বেশ কৌতূহলী করে তুলল। সে জানে অবয়ব প্রকাশনীর সত্ত্বাধিকারী আবেদ আলীকে লেখক নিহত হবার কিছুক্ষণ আগে এই বইটি মেইল করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বিগত দু'বছর ধরে জায়েদ রেহমানের বই যে প্রকাশনী থেকে বের হচ্ছিল সেই নির্মল প্রকাশনী দাবি করছে তাদের কাছে লেখকের আত্মজৈবনীমূলক উপন্যাস কথা'র পাণ্ডুলিপি রয়েছে। তারাই না কি এই বইটি প্রকাশ করার একমাত্র আইনগত অধিকার রাখে।

তবে নির্মল প্রকাশনীর মালিক কুদরত সাহেব দেরি করে ফেলেছে। লেখক জায়েদ রেহমানকে যে দিন কবর দেয়া হলো সেদিনই কথা নামের তার সর্বশেষ বইটি প্রকাশ হয়ে যায়। সকালবেলা দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখেই ভদ্রলোক প্রথম জানতে পারে জায়েদ রেহমানের এই বইটি আজ অবয়ব প্রকাশনী থেকে বের হচ্ছে। আদালতের শরণাপন্ন হবার আগেই হু হু করে বিক্রি হয়ে গেছে কয়েক হাজার কপি। শোনা যাচ্ছে আদালতে যাবার বিষয়টি আর এ সংক্রান্ত বির্তকের খবর জানাজানি হবার পর বইয়ের বিক্রি আরো কয়েকগুন বেড়ে গেছে।

আবেদ আলীকে কোনোভাবেই থামিয়ে রাখা যায়নি। জেফরি অবশ্য জানে তাকে থামানোর মতো আইনগত ভিত্তিও তাদের ছিল না। তারপরও চেষ্টা করেছিল।

জামানের কথাই ঠিক। ব্যবসায়ি ভদ্রলোক লাভের গন্ধ আঁচ করতে পেরে ঠিক সময় দান মেরে দিয়েছেন।

তবে কুদরত সাহেবও বসে নেই, আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে সে। এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় বেশ খবর হয়েছে। ক্রমশ ঘোলা হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। শুরুতে যে কেসটাকে মনে হয়েছিল পানির মতো সহজ এখন সেটা ঘোলা পানির মতো অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে; জেফরির আশঙ্কা শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কাদার মতো দলা পাকিয়ে পিচ্ছিল না হয়ে যায়!

এই মুহূর্তে জেফরির হাতে তিনটি রিপোর্ট আছে : জায়েদ রেহমানের পোস্টমর্টেম এবং সিগারেট ফিল্টার থেকে পাওয়া সালিভার রিপোর্ট আর পলিগ্রাফ টেস্টের প্রিন্ট কপি।

লেখক জায়েদ রেহমানকে শ্বাসরোধ করে নয়, বরং তার বুকে প্রচণ্ড আঘাত করে হার্টের বাল্ব অকেজো করে হত্যা করা হয়েছে। আর সিগারেট ফিল্টারে যে লালা বা সালিভা পাওয়া গেছে সেটা অবধারিতভাবেই মিসেস রেহমানের প্রেমিক আলম শফিকের।

কিন্তু তারচেয়ে বড় একটা তথ্য হলো গতকাল পুলিশ রিমান্ডে মিসেস রেহমান আর আলম শফিক এই হত্যাকাণ্ডে নিজেদের সম্পৃক্ততার কথা একদম অস্বীকার করেছে। জেফরি ভেবেছিল পুলিশ রিমান্ডে হয়তো আসামীরা হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করে নেবে।

জেফরি বেগের কাছে এগুলো নতুন কোনো তথ্য নয়, তারপরও তার মনে ক্ষীণ আশা ছিল ফরেনসিক রিপোর্টে হয়তো এমন কিছু থাকবে যা তার সন্দেহকে দৃঢ় করবে। কিন্তু আবারো গোলকধাঁধার মতো কানাগলিতে ফিরে এসেছে সে। সেই সাথে পুলিশ রিমান্ডে আসামীদের স্বীকারোক্তি তাকে অনেকটাই ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। তার মনে হচ্ছে না মিসেস রেহমান আর তার প্রেমিক আলম শফিক এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি এখন এমনই যে, সে যদি বলে লেখক জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ড অন্য কেউ করেছে তাহলে তাকে পাগল ভাববে সবাই।

গতকাল লেখক জায়েদ রেহমানের নতুন উপন্যাসটির উল্লেখযোগ্য অংশ হাইলাইটস

করে মেইল করে পাঠিয়েছে তার সহকারী জামান। তারপর থেকে কম্পিউটারের সামনে বসে বসে অনেকখানিই পড়েছে। এই বইটি যে পড়বে তার বদ্ধমূল ধারণা হবে খুনটা করেছে মিসেস রেহমান আর তার প্রেমিক।

জায়েদ রেহমান যে তার অল্পবয়সি স্ত্রীকে সন্দেহ করতেন, তার কাছ থেকে খারাপ কিছুর আশঙ্কা করতেন সেসবের অনেক বর্ণনা রয়েছে বইতে। এমন কি মিসেস রেহমান কয়েক মাস ধরে লেখককে তার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তার এবং শিশু সন্তানের নামে লিখে দেয়ার জন্যে রীতিমতো চাপও দিচ্ছিল।

যতোই পড়ছে ততোই অবাক হচ্ছে সে। এ বই প্রকাশ হলে জায়েদ রেহমান সম্পর্কে যেসব মুখরোচক গালগল্প চালু আছে সেগুলো আরো দৃঢ় হবে, তার নিন্দুকেরা হয়ে উঠবে আরো উৎসাহী। এ রকম একটি লেখা প্রকাশ করার জন্য জীবনের অন্তিম মুহূর্তে লেখকের মরিয়া হয়ে ওঠার কোনো কারণই খুঁজে পাচ্ছে না জেফরি।

আর পড়তে ইচ্ছে করছে না বলে কম্পিউটারটা বন্ধ করে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের বিভিন্ন দিক নিয়ে ভাবতে লাগল সে।

লেখক জায়েদ রেহমানের মৃত্যুতে সবচাইতে লাভবান হয়েছে কে?

অবধারিতভাবেই উত্তরটা হতে পারতো মিসেস রেহমান কিন্তু ভদ্রমহিলা এখন যে অবস্থায় আছে তাতে করে এ কথা বলার আর কোনো জো নেই। বেনিফিসিয়ারি তত্ত্ব দিয়ে সব সময় সব ঘটনাকে বিচার করা ঠিক নয়। অনেক সময় দৃশ্যমান সুবিধাভোগী আদতে কোনো সুবিধাই পায় না। আর কে লাভবান হচ্ছে না হচ্ছে সেটা বের করাও খুব একটা সহজ নয়।

তারপরও জেফরি জানে এখন পর্যন্ত জায়েদ রেহমানের মৃত্যুতে একজনই সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে : প্রকাশক আবেদ আলী।

তাকে কেউ সন্দেহের চোখে দেখছে না, অথচ লেখকের মৃত্যুর পর সে এখন কোটি টাকার মুনাফার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। সমস্ত সন্দেহ মিসেস রেহমান আর তার প্রেমিকের উপর নিবদ্ধ। তাদেরকে কোনোভাবেই বেনিফিশিয়ারি বলার উপায় নেই।

জায়েদ রেহমানের শেষ বইটি এমন একজন প্রকাশক দাবি করে বসেছে। যে কি না বিগত দু'বছর ধরে জায়েদ রেহমানের সমস্ত বই প্রকাশ করে আসছে। আবেদ আলীর সাথে লেখকের কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ ছিল অথচ তাকেই দিয়ে গেলেন নিজের শেষ বইটি?

নিজের মনে উদয় হওয়া ভাবনাটি নিজের কাছেই খুব বেশি উর্বর কল্পনা বলে মনে হচ্ছে। তারপরও এ জগতে অনেক অসম্ভব ঘটনার মতো এই দূরকল্পনাটিও যে সম্ভব হতে পারে সেটা জানে জেফরি বেগ।

আবেদ আলীকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় এসে গেছে।

মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে একটা নাম্বারে ডায়াল করল সে।

"হ্যাঁ, জামান, কোথায় আছো?"

"অফিসে, ওপাশ থেকে তার সহকারী জামান জবাব দিল।

"নির্মল প্রকাশনীর প্রকাশকের সাথে যোগাযোগ করে তার কাছ থেকে জায়েদ রেহমানের শেষ বইয়ের পাণ্ডুলিপিটা জোগাড় করার চেষ্টা করবে। উনি হয়তো দিতে চাইবেন না কিন্তু তুমি তাকে বোঝাবে, সেটা দিলে আমরা আবেদ আলীর ব্যাপারে একটু তদন্ত করে দেখবো জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের সাথে ভদ্রলোকের কোনো সম্পৃক্ততা আছে কি না। বুঝেছো?"

জামান বুঝতে পেরেছে। এই মুহূর্তে নির্মল প্রকাশনীর প্রকাশক আবেদ আলীর উপর মহা ক্ষেপে আছে। এসব বললে ভদ্রলোক সোৎসাহে পাণ্ডুলিপি দিয়ে দেবে।

“ঠিক আছে, স্যার। আমি তার সাথে যোগাযোগ করে আপনাকে জানাচ্ছি।”

ফোনটা রেখে দিল বেগ।

জেফরির সহকারী জামান ইয়েলো পেজ ঘেঁটে নির্মল প্রকাশনীর নাম্বারটা বের করে সেখানে ফোন করলে তিনচার বার রিং হবার পর একজন ফোনটা ধরল।

“আমি একটু আপনাদের প্রকাশকের সাথে কথা বলতে চাইছিলাম,” বলল জামান।

“কোত্থেকে বলছেন?” ওপাশ থেকে জানতে চাইল।

“হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট।” কোনো সাড়া শব্দ নেই।

“হ্যালো?” জামান তাড়া দিল।

“জি, বলছি,” জবাবে বলল একটা কণ্ঠ।

“আমি আপনাদের প্রকাশকের সাথে—”

“জি, আমিই প্রকা ক...বলুন।”

“আপনার নাম?”

“কুদরত হোসেন।”

“কুদরত সাহেব, আমি হোমিসাইড থেকে সহকারী ইনভেস্টিগেটর জামান আহমেদ বলছি।”

“জি, বলুন?” কণ্ঠটা ভয়ার্ত শোনাচ্ছে এখন।

“আমি লেখক জায়েদ রেহমান হত্যাকাণ্ডের সহকারী ইনভেস্টিগেটর। আপনারা দাবি করছেন লেখক তার সর্বশেষ বইটির পাণ্ডুলিপি আপনাদের দিয়ে গেছেন-”

“জি।”

“আপনারা তো এই বিষয়টা আদালতে নিয়ে গেছেন, তাই না?”

“জি। গতকালকেই আমরা আদালতে একটি আর্জি দিয়েছি।”

“আপনাদের কাছে জায়েদ রেহমানের যে পাণ্ডুলিপিটা আছে সেটার একটা কপি আমাদেরকে দিতে হবে।”

ওপাশ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

জামান বলতে লাগল। “আমরা জায়েদ সাহেবের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আবেদ আলীকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাচ্ছি। তো আপনাদের কাছে থাকা উনার পাণ্ডুলিপিটা আমাদের হাতে থাকলে অনেক সাহায্যে আসবে।”

ওপাশ থেকে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার আওয়াজ শোনা গেল। “কিন্তু সেটা তো আমরা আপনাকে দিতে পারবো না।”

জামান অবাকই হলো। সাধারণত হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টকে সবাই সমীহ করে। আজ পর্যন্ত কোথাও থেকে সাহায্য চেয়ে বিমুখ হয়নি সে। “কেন দিতে পারবেন না সেটা কি জানতে পারি?”

“ওটা গতকাল রাতে চুরি হয়ে গেছে,” নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল ভদ্রলোক।

অধ্যায় ৩৭

জেফরি বেগের সন্দেহটা ক্রমশ গাঢ় হয়ে উঠছে। প্রকাশক আবেদ আলী লোকটার ব্যাপারে আরো ভালো করে খোঁজ খবর নিতে হবে। পুরো ঘটনায় একমাত্র লাভবান এই লোককে নিয়ে আসতে হবে সন্দেহের মাইক্রোস্কোপের নিচে।

জায়েদ রেহমান খুন হবার আগে তাকে একটা মেইল করে সর্বশেষ বইয়ের পাণ্ডুলিপি দিয়ে গেছেন। এখন দেখা যাচ্ছে সেই পাণ্ডুলিপির দাবিদার আরেকজন প্রকাশক। সব কিছু বিবেচনায় নিলে সেই প্রকাশকের দাবিটাই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়, কিন্তু এখন তার অফিস থেকে পাণ্ডুলিপি চুরির ঘটনায় মনে হচ্ছে তার দাবিটা একেবারেই সত্যি।

জামানকে সঙ্গে নিয়ে জেফরি এখন কুদরত সাহেবের অফিসে এসেছে। যেহেতু হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট এখন আর অফিশিয়ালি এই কেসের তদন্ত করছে না, সেটা অপর্ণ করা হয়েছে পুলিশের উপর তাই ওখানে প্রকাশককে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করাটা ঠিক হবে না বলে নিজেই চলে এসেছে।

তারা বসে আছে কুদরত সাহেবের প্রাইভেট অফিসে। লোকটা হোমিসাইডের নাম শুনে প্রথমে একটু ভড়কে গেলেও এখন খুব সহযোগীতা করছে। বেশ আন্তরিকতার সাথে ব্যবহার করছে তাদের সাথে। কারণটা স্পষ্ট : তার প্রধানতম ব্যবসায়িক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে ভদ্রলোক।

"আপনি বলছেন মাসখানেক আগে পাণ্ডুলিপিটা হাতে পেয়েছিলেন?" জেফরি প্রশ্ন করল কুদরত সাহেবকে।

"জি।"

"ওটা কি হাতে লেখা ছিল?"।

"না। স্ট্রোকের পর থেকে উনি হাতে লিখতেন না। ল্যাপটপে লিখতেন। পাণ্ডুলিপিটা সফট কপির ছিল।"

"তাহলে কম্পিউটার থেকে ওটা চুরি হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

অবাক হলো জেফরি।

"চুরির কথা শুনে আমি ভেবেছিলাম অফিসের কম্পিউটার চুরি হয়েছে। কারণ এর আগেও এখান থেকে মূল্যবান কম্পিউটার আর প্রিন্টার চুরি হয়েছিল। কিন্তু আজব ব্যাপার হলো অফিসের তালা ভাঙা থাকলেও জায়েদ রেহমনের পাণ্ডুলিপির প্রিন্ট কপি এবং সিডিটা ছাড়া আর কিছুই খোয়া যায়নি। সকালে এসে কম্পিউটার চেক করে দেখি হার্ডডিস্কও একেবারে ফাঁকা।"

"আপনাদের কাছে কোনো প্রিন্ট করা পাণ্ডুলিপি ছিল না?"

"এক কপি ছিল। সেটাও চুরি হয়েছে।"

"বলেন কি!" জেফরির কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তার মানে আপনাদের কাছে সেই পাণ্ডুলিপির আর কোনো কিছুই নেই...সিডি, প্রিন্ট কপি এমনকি কম্পিউটারে রাখা...সবগুলোই?"

"জি, সবগুলোই।"

"আপনি পাণ্ডুলিপিটা পড়ে দেখেছিলেন?"

একটু ইতস্তত করল প্রকাশক সাহেব। "ইয়ে...মানে...আমি তো অনেক কাজে ব্যস্ত থাকি, সময় পাই না। তবে আমার এক লোক আছে পাণ্ডুলিপির প্রুফ দেখার জন্যে...সে ওটা পড়েছিল।"

“আচ্ছা। সেই লোক কি এখন আপনার এখানে আছে?”

“হ্যাঁ, আছে। এখানেই কাজ করে।”

“তার সাথে একটু কথা বলতে চাই।”

কুদরত সাহেব ইন্টারকমটা তুলে নিয়ে বাবু নামের এক লোককে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলল। “কমল বাবুই আমার পাণ্ডুলিপি দেখেটেখে দেয়। বাংলা ভাষাটা তার ভালো জানা আছে। আমি এই ব্যবসা শুরু করার পর থেকেই আমার এখানে কাজ করছে।“

দরজায় নক হতেই কুদরত সাহেব ভেতরে আসতে বললে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো ষাটোর্ধ বয়সের এক রোগাপাতলা বৃদ্ধ। দেখে মনে হয় সারা বছরই অসুস্থ থাকে এই লোক।

“বাবু, ঐ চেয়ারটায় বসেন, কুদরত হোসেন বলল। তারপর জেফরি আর জামানের দিকে ফিরল সে। “উনারা হলেন হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের লোক। আমাদের এখান থেকে জায়েদ সাহেবের যে পাণ্ডুলিপি চুরি হয়েছে সে ব্যাপারে উনারা কিছু জানতে চান।”

পুলিশের কথা শুনে বাবু নামের লোকটি যেন কুকুঁড়ে গেল। মোটা কাঁচের চশমার ভেতর দিয়ে পিটপিট করে তাকাল জেফরি আর জামানের দিকে।

“আমাদের বেশিরভাগ পাণ্ডুলিপি বাবুই দেখাশোনা করেন, তবে জায়েদ রেহমানের পাণ্ডুলিপি উনি ছাড়া আর কেউ দেখেন না। আপনাদের যা জানার উনাকে জিজ্ঞেস করুন।”

“কমল বাবু, জায়েদ সাহেবের শেষ পাণ্ডুলিপিটা কি আপনি পড়ে দেখেছিলেন?” জেফরি জানতে চাইল।

মাথা নেড়ে জবাব দিল বুড়ো। মুখে কিছু বলল না।

“পুরোটা পড়েছিলেন?”

আবারো মাথা নেড়ে জবাব দিল। “পুরোটা তো হাতে পাইনি। জায়েদ রেহমান ওটা শেষ করে উঠতে পারেননি।” জবাব দিল ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী কমল বাবু।

জেফরি অবাক হয়ে তাকাল কুদরত সাহেবের দিকে। “আপনার কাছে পুরো পাণ্ডুলিপি ছিল না?”

একটু ইতস্তত করে জবাব দিল প্রকাশক। “না...মানে, উনি বলেছিলেন সামনের বইমেলার আগে পুরো কাজ শেষ করে ফেলবেন। প্রায় সত্তর-আশি ভাগ কাজ হয়ে গিয়েছিল। উনি আমাকে বললেন, আপনি প্রুফ দেখাতে থাকেন এই ফাঁকে আমার বাকি কাজ শেষ হয়ে যাবে...”

“আচ্ছা।” জেফরি একটু থেমে আবার বলল কমল বাবুকে। “আপনার কাছে তো একটা কপি ছিল সেটার কি অবস্থা?”

“গত সপ্তাহে ওটার প্রুফ দেখা শেষ হলে আমি অফিসে জমা দিয়ে দেই। ওটাও চুরি হয়ে গেছে।”

“এই চুরির ব্যাপারে আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?” কুদরত সাহেবের দিকে ফিরে বলল জেফরি বেগ।

“অবশ্যই,” নিজের চেয়ারে সোজা হয়ে বসল ভদ্রলোক। “এটা তো পানির মতো পরিস্কার...আবেদ আলী এই কাজ করিয়েছে। একটা ভুয়া পাণ্ডুলিপি জায়েদের নামে চালিয়ে ব্যবসা করছে এখন। যে-ই জানতে পারল আমার কাছে আসলটা আছে সঙ্গে সঙ্গে সেটাও চুরি করে নিলো। “

“আপনার সাথে কি আবেদ আলীর সম্পর্ক খারাপ ছিল?”

“আমাদের সাথে আসলে ওরকম কিছু হয়নি। ব্যাপরটা একেবারেই ব্যবসায়িক। জায়েদ রেহমানকে নিজের কজায় রেখে দীর্ঘদিন ব্যবসা করেছে সে, কোটিকোটি টাকা কামিয়েছে।

বন্ধুত্বের সুযোগে লেখককে ঠকিয়ে গেছে দিনের পর দিন। জায়েদ সাহেবের আগের স্ত্রীর সাথে তার ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আবেদ আলী লেখককে একেবারে নিজের পকেটে রেখে দিয়েছিল...” একটু থেমে আবার বলতে লাগল কুদরত হোসেন। “উনি যখন আমাকে উনার বই দেয়া শুরু করলেন তখন থেকেই আমার সাথে তার দ্বন্দ্ব। আমার নামে যা তা বলে বেড়াতো। জায়েদ সাহেবের সাথেও তার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় তখন থেকে

“আপনার সাথে জায়েদ রেহমানের পরিচয় কিভাবে হলো?” তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল জেফরি।

থতমত খেয়ে গেল প্রকাশক ভদ্রলোক। জবাবটা মনে মনে গুছিয়ে নেবার জন্যে একটু ভেবে নিলো। “উনার দ্বিতীয় স্ত্রী আমার আত্মীয় হয়...বেশ ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলতে পারেন।”

একটু চুপ করে থেকে জামানের দিকে তাকাল জেফরি। এতোক্ষণ ধরে সে কোনো কথা বলেনি। “কুদরত সাহেব, আপনি মনে করছেন লেখক জায়েদ রেহমানের যে বইটি অবয়ব প্রকাশনী থেকে বের হয়েছে সেটা আসলে তিনি লেখেননি?”

“অবশ্যই। তার সাথে তো জায়েদ সাহেব কথাই বলতেন না। তাছাড়া উনার খুন হবার কয়েক দিন আগেও আমি দেখা করে এসেছি। উনি আমাকে বলেছেন এই বইয়ের কাজ শেষ করতে আরো এক-দেড় মাসের মতো সময় লাগতে পারে।”

“আপনি কি অবয়ব প্রকাশনী থেকে বের হওয়া বইটি পড়ে দেখেছেন?”

“হ্যাঁ, যেদিন বের হয় সেদিনই কিনে এনেছি কয়েক কপি। কিছুটা পড়েও দেখেছি। একেবারে জালিয়াতি। এ রকম জালিয়াতি এ দেশের প্রকাশনা ইতিহাসে আর কখনও হয়নি।”

“আপনার কাছে যে পাণ্ডুলিপিটা ছিল সেটা তো আপনি পড়েননি তাহলে কি করে বুঝলেন ওটা জাল?”

কুদরত সহেব একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেলো। “ইয়ে...মানে-”

“আমি পড়েছি...”

কুদরত সাহেবকে রক্ষা করতে কমল বাবু এগিয়ে এলে তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল জেফরি বেগ।

“উনি ঠিকই বলেছেন। যেটা বের হয়েছে সেটা জাল। আমাদের কাছে যে পাণ্ডুলিপি ছিল সেটার সাথে এই বইয়ের কিছু কিছু জায়গায় একেবারেই মিল নেই।”

“কিছু কিছু জায়গায় মিল নেই!? তার মানে কিছু কিছু জায়গায় মিল আছে?”

কমল বাবু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। “হ্যাঁ, মিল আছে।” কথাটা কুদরত সাহেবের পছন্দ না হলেও এ নিয়ে কিছু বলল না সে।

একটু ভেবে জেফরি বলল, “দুয়েকটি উদাহরণ দিতে পারবেন? মানে ঠিক কোন্ কোন্ জায়গায় অমিল আছে?”

“সব তো মনে নেই তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত...” কুদরত সাহেবের দিকে তাকাল ভদ্রলোক। “অবয়ব প্রকাশনী থেকে যে বইটি বের হয়েছে সেখানে জায়েদ সাহেব নিজের জীবনে এমন কিছু কথা স্বীকার করেছেন যেটা আমাদের কাছে থাকা পাণ্ডুলিপিতে একদমই ছিল না।”

“আরেকটু পরিস্কার করে বলুন?”

“...যেমন তার দাম্পত্য জীবন, নারীঘটিত ব্যাপারগুলো...ওখানে যেভাবে অকপটে লেখক স্বীকার করেছেন সেরকম কিছুই আমাদের কাছে থাকা পাণ্ডুলিপিটাতে ছিল না।”

কুদরত সাহেবের দিকে তাকাল জেফরি। ভদ্রলোকের চোখেমুখে তিক্ত হাসি লেগে রয়েছে। "বুঝলেন না, এক ঢিলে দুই পাখি মারা। বাণিজ্যও হলো প্রতিশোধও নেয়া হলো!"

"প্রতিশোধ?"

"হ্যাঁ, জায়েদ রেহমানের উপর প্রতিশোধ। আমার কি মনে হয় জানেন, ঐ আবেদ আলীর সাথে জায়েদ সাহেবের আগের স্ত্রীও জড়িত আছে। তারা দু'জনে মিলেই কাজটা করেছে।"

"কোন্ কাজটা?"

কুদরত সাহেব ধন্দে পড়ে গেল। তার খুব বলতে ইচ্ছে করছে জায়েদ রেহমান খুনের কথা কিন্তু সেটা বলা ঠিক হবে না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে উল্টো তাকেই সন্দেহ করে বসতে পারে এই ইনভেস্টিগেটর। "মানে, এই চুরি আর জালিয়াতির কথা বলছি আর কি..."

"আপনার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে তো এটাও ধরে নিতে হবে জায়েদ রেহমানকে খুন করার পেছনে তাদের হাত রয়েছে!" কথাটা বলে জেফরি স্থির চোখে চেয়ে রইল কুদরত সাহেবের দিকে।

ভদ্রলোক কি বলবে বুঝতে পারল না। একটু আমতা আমতা করে অবশেষে বলল, "আমি তো সেটা বলতে পারবো না, তবে আপনারা তদন্ত করে দেখতে পরেন তারা জড়িত আছে কি না। আমার যা মনে হচ্ছে আমি কেবল সেটাই বলছি।"

জেফরি বেগ ভাবনায় পড়ে গেল। তার আশঙ্কাই সত্যি হয়ে উঠছে। এই কেসটা একেবারেই জটিল। গোলকধাঁধার মতো অসংখ্য গলি আছে কিন্তু বের হবার পথ পাওয়া যাচ্ছে না। বার বার একই জায়গা ফিরে আসছে নয়তো কানা গলিতে গিয়ে ঢুকে পড়ছে সে।

অধ্যায় ৩৮

সি ই এ সিদ্দিকী ছেলেকে বোম্বের এক রিহ্যাবে রেখে দেশে ফিরে এসেছেন গতকাল রাতে। তার সাথে দেখা করতে এসেছে অমূল্য বাবু।

এ ক'দিনে কি কি ঘটেছে সে সম্পর্কে জানার জন্যে সিদ্দিকী সাহেব উদগ্রীব হয়ে আছেন।

তারা বসে আছে বিশাল ড্রইংরুমে।

অমূল্য বাবু একটা ছোট্ট প্যাকেট বাড়িয়ে দিল সিদ্দিকী সাহেবের দিকে। "এটা রাখুন। নষ্ট করার আগে একবার দেখে নিতে পারেন।"

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখলেন তিনি। "এটা কি?"

"জায়েদ রেহমানের সেই ইন্টারভিউয়ের টেপ।"

"আপনি কিভাবে পেলেন?" কথাটা বলেই সিদ্দিকী সাহেব মনে মনে ভাবলেন তার এটা বলা ঠিক হয়নি। এই লোক যে কতোভাবে কতো কিছু করতে পরে সেটা তিনি নিজেও জানেন না।

"লম্বা গল্প। পাভেল আহমেদ নামের এক সাংবাদিক এই ইন্টারভিউটা নিয়ে আমাদেরকে ব্ল্যাকমেইর করতে চেয়েছিল।"

"ব্ল্যাকমেইল!?"

অমূল্য বাবু আলতো করে মাথা দোলাল।

"তার মানে সে জেনে গেছে! কিভাবে জানল?"

"জেনে গেছিল কি না জানি না তবে মনে হয় কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছিল।"

অমূল্য বাবুর কথা শুনে সিদ্দিকী সাহেবের কাছে কেমন জানি খটকা লাগল। "তাহলে তো বিপদের কথা

সিদ্দিকী সাহেবকে মাঝপথে থামিয়ে দিল বাবু। "এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না।"

সিদ্দিকী সাহেব প্যাকেটটার দিকে একবার তাকিয়ে অমূল্য বাবুর দিকে তাকালেন। একটা আশঙ্কা তার মনে উঁকি মারছে কিন্তু মুখে সেটা বললেন না।

"ঐ সাংবাদিক এখন কোথায়?" আস্তে করে জানতে চাইলেন তিনি।

অমূল্য বাবু দুচোখ বন্ধ করে রাখল কয়েক সেকেন্ড। তারপর চোখ খুলে বলল, "অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে...তার কথা বাদ দিন; ইরাম কেমন আছে?"

সিদ্দিকী সাহেবের শিড়দাঁড়া দিয়ে শীতল একটি প্রবাহ বয়ে গেল। "ভালো আছে। আগের মতো আর পাগলামি করেনি। মনে হয় না ওখান থেকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে।"

"ওটা এশিয়ার মধ্যে সেরা রিহ্যাব। আশা করি সে সুস্থ হয়ে ফিরবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন সিদ্দিকী সাহেব। "ডাক্তার বলেছে কমপক্ষে ছ'মাস লাগবে। ড্রাগটা তো খুবই আনইউজুয়াল, তাই সময় নেবে।"

"চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

উদাস ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে সায় দিলেন সি ই এ সিদ্দিকী। "বাকি খবর কি?"

"সব ঠিক আছে। চিন্তার কিছু নেই।" অমূল্য বাবু একটু থেমে আবার বলল, "জায়েদ রেহমানের শেষ বইটা বের হয়েছে।"

কথাটা শুনে স্থির চোখে চেয়ে রইলেন তিনি। "তাই না কি?"

"বেশ ভালো বিক্রি হচ্ছে। এদিকে জায়েদ রেহমানের বই যে প্রকাশনী থেকে দু'বছর ধরে বের হয়ে আসছে তারা দাবি করছে তাদের কাছে না কি জায়েদ রেহমানের আসল বইটি

ছিল।”

ভুরু কুঁচকে তাকালেন সিদ্দিকী। “তারপর?”

“ঐ প্রকাশক এ নিয়ে আদালতে গেছে।”

সিদ্দিকী সাহেবকে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে দেখে অমূল্য বাবু সঙ্গে সঙ্গে বলল, “চিন্তার কোনো কারণ নেই, ওরা ওদের পাণ্ডুলিপিটা খুঁজে পাচ্ছে না।”

এবার আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না সিদ্দিকী সাহেব।

“ওটা চুরি হয়ে গেছে।” কথাটা বলেই অমূল্য বাবু আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে দু’চোখ বন্ধ করে মাথাটা একটু নাড়লেন।

“জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কতোদূর এগোলো?” প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইলেন সিদ্দিকী সাহেব।

“যা হবার তাই হচ্ছে। মিসেস রেহমান আর তার প্রেমিক যে খুনটা করেছে সেটা এখন প্রতিষ্ঠিত।”

“তাহলে ইরামের ব্যাপারে কোনো রকম ইনকোয়ারি হবার সম্ভাবনা নেই?”

“না, নেই।”

স্বস্তি বোধ করলেন সিদ্দিকী সাহেব।

অধ্যায় ৩৯

কুদরত হোসেনের সাথে কথা বলে আসার পর থেকে জেফরির মনে সন্দেহটা আরো দৃঢ় হয়েছে। তার সহকারী জামান খোঁজ নিয়ে জেনেছে কথা নামের যে বইটি প্রকাশ হয়েছে সেটির রয়্যালটি বাবদ অনেক টাকা চলে গেছে লেখকের সাবেক স্ত্রীর ভ্যানিটিব্যাগে।

এখন দেখা যাচ্ছে লেখকের মৃত্যুতে আসলে দু'জন মানুষ লাভবান। হয়েছে : আবেদ আলী আর জায়েদ রেহমানের প্রথম স্ত্রী গোলনূর আফরোজ তরফদার।

তাহলে কি কুদরত সাহেবের কথাই ঠিক? আবেদ আলী আর গোলনূর আফরোজ তরফদার কোনো পেশাদার খুনিকে দিয়ে কাজটা করায়নি তো?

কিন্তু এটা কি করে সম্ভব? জায়েদ রেহমান নিজের বাড়িতে খুন হয়েছেন। ঐ সময় সেখানে ছিল তার স্ত্রী আর তার প্রেমিক। ব্যাপারটা তো পানির মতোই পরিস্কার।

তারপরেও নিজের সহকারী জামানকে দিয়ে কিছু তথ্য জোগাড় করে নিয়েছে সে। এই তথ্যগুলো খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে তার কাছে।

জায়েদ রেহমান খুন হবার এক সপ্তাহ আগে থেকে এখন পর্যন্ত আবেদ আলী যাদের সাথে ফোন করেছে কিংবা তাকে যারা ফোন করেছে সেটার একটা তালিকা জোগাড় করে নিয়ে এসেছে জামান। হোমিসাইডের জন্য কাজটা তেমন কঠিন কিছু না। সরকারী বেসরকারী সব ফোন কোম্পানিই আইন মোতাবেক হোমিসাইডকে যেকোনো ফোন নাম্বারের কললিস্ট দিতে বাধ্য। আর এই কম্পিউটারের যুগে সেটা হাতের মুঠোয় পাওয়া কয়েক মিনিটের ব্যাপার।

লেখক খুন হবার সাত দিন আগে আবেদ আলী মোট ৯৮টি কল করেছে আর রিসিভ করেছে ১২৫টি। সংখ্যাটা একজন ব্যবসায়ির জন্য খুব বেশি কি না বুঝতে পারছে না বেগ। তবে একটা জিনিস দেখে সে অবাকই হলো :

আমেরিকার একটি নাম্বার থেকে আবেদ আলীকে এই সাত দিনে ৫১২টি এসএমএস করা হয়েছে যার জবাবে আবেদ আলী নিজে করেছে ৪৮৮টি!

আমেরিকার ঐ নাম্বারটি ট্র্যাক-ডাউন করে জানা গেছে সেটা সাগুফতা হোসেন মিলি নামের এক মহিলার। জেফরি বুঝতে পারল প্রবাসী কোনো বাংলাদেশিই হবে। বিপত্নীক আবেদ আলী হয়তো ঐ মহিলার সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।

এই সাত দিনে দেশের ভেতরে আবেদ আলী যে নাম্বারে সবচাইতে বেশি ফোন করেছে সেটা আর কেউ নয়-জায়েদ রেহমানের সাবেক স্ত্রী গোলনূর আফরোজ তরফদার।

মোট ৯ বার ফোন করেছে তাকে। আর মহিলা আবেদ আলীকে ফোন করেছে ১২ বার।

ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক ঠেকলো জেফরির কাছে।

জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের পুরো চিত্রটা আরেকবার ভেবে নিলো জেফরি। অনেক অসঙ্গতি আছে এই হত্যাকাণ্ডে :

শয্যাসায়ী অবস্থায় জায়েদ রেহমান নিজের ঘরে খুন হবার ঠিক আগে আবেদ আলীকে একটা মেইল করে গেলেন এমন একটি ল্যাপটপে যেটা ছিল তার নাগালের বাইরে। পাশের ঘরে তখন তার তরুণী স্ত্রী আর প্রেমিক অভিসারে মত্ত। ঠিক সেই সময় অ্যাপার্টমেন্টের নিচে এক অজ্ঞাত তরুণকে পুলিশ সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে তাকে ধরার চেষ্টা করে কিন্তু যুবক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পরবর্তীতে পুলিশ আবারো যখন জায়েদ রেহমানের অ্যাপার্টমেন্টে খোঁজ নিতে যায় তার ঠিক আগে দিয়ে ফজরের আজানের পর পরই অ্যাপার্টমেন্টের আরেক বাসিন্দা হানিফ সাহেবের পেছন পেছন আরেক অজ্ঞাত যুবক অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরে

আসেনি। সেই যুবকের কোনো পরিচয় বের করা যায়নি এখন পর্যন্ত। অবাক করার বিষয় হলো ঐ দিন ভিটা নুভায় কোনো অ্যালোটির ফ্ল্যাটেই গেস্ট ছিল না।

তাহলে সেই যুবক কে?

জেফরি এখন অনেকটা নিশ্চিত লেখক জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের পেছনে যে বা যারা জড়িত তারা অনেক বেশি সতর্ক আর দক্ষ।

পেশাদার কেউ?

সম্ভাবনাটি উড়িয়ে দেয়া যায় না ।

মিসেস রেহমান আর তার প্রেমিক যদি খুন না করে থাকে তাহলে কাজটা আর যে-ই করুক সে এটা করিয়েছে একজন পেশাদার লোককে দিয়ে। তবে এ মুহূর্তে আরো ভালো করে তদন্ত না করে এসব কথা কারো সাথে শেয়ার করা যাবে না। কারণ ঐ ভদ্রমহিলা আর তার প্রেমিক যেভাবে ফেঁসে গেছে তাতে করে এই ব্যাপারটা প্রমাণ করা খুব কঠিন হয়ে উঠবে।

ঘটনা যাই হোক না কেন জেফরি জানে এই কেসে অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলোর উত্তর মিলছে না। শুরুতে অভাবনীয় সাফল্য পেয়ে যাওয়ার কারণেও এই কেসটার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেনি সে। একটা হত্যাকাণ্ডের তদন্ত যেভাবে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে করতে হয় সেভাবেই

তদন্ত করতে হবে। সে এটাও জানে কাজটা খুব একটা সহজ হবে না। তার নিজের ডিপার্টমেন্টই তাকে এখন সহযোগীতা করবে না।

হোমিসাইডে নিজের অফিসে বসে বসে ভাবছে সে। তার সামনে বসে আছে সহকারী জামান।

"আপনি কি এই ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করতে চাইছেন?" জিজ্ঞেস করল জামান।

"হ্যাঁ।"

"তাহলে এখন আমরা কী করবো?" জানতে চাইল সে।

"আমি ভিটা মুভায় গিয়ে আরেকটু দেখে আসতে চাইছি।"

জামান বুঝতে পারল না ভিটা নুভায় গিয়ে কী খুঁজে পাবে সে।

***

জামানকে সঙ্গে নিয়ে ভিটা নুভার সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়াল জেফরি বেগ। ভালো করে অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটি দেখে নিলো সে। আর সব লাক্সারি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের চেয়ে আলাদা কিছু না।

ছয় তলার এই ভবনের নিচ তলার পুরোটাই পার্কিং এরিয়া। প্রতি তলার লিফট আর সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের দু'পাশে দুটো করে মোট চারটি ফ্ল্যাট আছে। তার মানে পাঁচটি তলায় সর্বমোট বিশটি ফ্ল্যাট রয়েছে। জেফরির সহকারী জামান যতোটুকু খোঁজ নিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে মাত্র ষোলো জন অ্যালোটি রয়েছে এখানে। যে চারজন অ্যালোটির দুটো করে ফ্ল্যাট আছে তার মধ্যে স্বয়ং জায়েদ রেহমানও আছেন।

রাস্তার ওপার থেকে পুরো ভবনটি দেখে নিলো জেফরি বেগ। ঢাকা শহরের অন্য অনেক উঁচু ভবনের মতোই ভিটা নুভার ছয়তলার ছাদে একটি মোবাইলফোন কোম্পানির টাওয়ার রয়েছে। এর আগে ব্যাপারটা তার চোখে পড়েনি। অবশ্য এটা চোখে পড়ার মতো কোনো ব্যাপারও নয়।

রাস্তাটা পার হয়ে ভিটা নুভার দিকে এগিয়ে গেল সে, তার পেছন পেছন সহকারী জামান।

নাইটগার্ড আসলামের জায়গায় এখন ডিউটি করছে মহব্বত নামের এক ছেলে। দিনের

বেলায় সে-ই ডিউটি করে। ছেলেটা তাকে দেখেই সালাম দিয়ে এগিয়ে এল কাছে।

নিজের পরিচয় দিয়ে এটা ওটা জানতে চেয়ে আসল কথায় চলে এল বেগ। "ঐদিন দিনের বেলায় তুমিই তো ডিউটিতে ছিলে?"

"জি, স্যার। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমিই ডিউটি দেই" কথাটা বলেই মহব্বত নামের দারোয়ান ছেলেটি গেটের দিকে তাকাল। এইমাত্র এক লোক গেট দিয়ে ঢুকে পড়েছে। "স্যার, একটু দাঁড়ান, আমি আসতাছি..." মহব্বত সেই লোকের কাছে এগিয়ে গেল।

আগত লোকটার দিকে একবার তাকিয়ে জামানের দিকে ফিরল জেফরি। "জামান, এই ভিটা নুভার ফ্লোরপ্ল্যানটা জোগাড় করতে হবে।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

"এই অ্যাপার্টমেন্টের বিল্ডার্সের কাছে গিয়ে চাইবে, বলবে ভেতর এবং বাইরের..." থেমে গেল জেফরি। ঘাড় ঘুড়িয়ে মহব্বত আর ভিজিটরের দিকে তাকাল সে। একটা কথা তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

"ঐ দিন না একজন আইলো...আবার কি হইলো? টাওয়ারে কি প্রবলেম হইছে না কি?" মহব্বত ভিজিটরের আইডিকার্ড চেক করে দেখে জানতে চাইল।

"ঐ দিন একজন এসেছে মানে!?" লোকটা বিস্মিত হলো। "গত মাস থেকে এই জোনটা তো আমিই দেখাশোনা করছি...আমি ছাড়া আবার কে আসবে?"

"আরে আমি নিজে ছিলাম, আপনাগো এক লোক আইছিল-"

"কী যে বলেন না," মেইনটেনান্স ক্রু বলল। "আপনি

"মহব্বত, কি হয়েছে?" তাদের কাছে এগিয়ে এসে জেফরি জানতে চাইল।

জেফরিকে দেখামাত্র মহব্বত আইডি কার্ডটা ফিরিয়ে দিয়ে ভিজিটরকে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে যেতে বলে জেফরির দিকে ফিরে বলল সে, "না, স্যার, কিছু না। টাওয়ারের লোক।"

"ওকে তুমি কী যেন বলছিলে...কয়েক দিন আগে ওদের আরেকজন লোক এসেছিল..."।

"ও, দাঁত বের করে হেসে বলল মহব্বত। কয়েক দিন আগে ওগো আরেকজন আইছিল তো, আবার এখন আরেকজন আইছে, তাই জিজ্ঞাস করছিলাম টাওয়ারে কোনো প্রবলেম হইছে কি না।"

"ঐ দিন মানে কোন্ দিন?" বেগ জানতে চাইল।

"জায়েদ স্যার যে রাইতে খুন হইলেন, ঐদিন সন্ধ্যার একটু আগে..."

"আচ্ছা। তাহলে ও যে তোমাকে বলল কেউ আসেনি?"

"হ, তাই তো কইলো।"

"ঐ দিন টাওয়ারের লোকটা এই লোক ছিল না?"

"না। অন্য আরেকজন আইছিল।"

"ঐ লোকটা কখন এখান থেকে চলে গেছিল?"

'আমি কইবার পারুম না। আমি তো তার একটু বাদেই ডিউটি শ্যাষ কইরা চইলা যাই। এটই কইবার পারবো আসলাম ভাই।"

জেফরি বেগ জামানের দিকে তাকাল। মনে হলো তার সহকারী জামানও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে তথ্যটা জেনে।

"আসলাম এখন কোথায়?" জানতে চাইল জামান।

"ঘরেই আছে," পার্কিংএরিয়ার শেষ প্রান্তে একটা ছোট্ট ঘর দেখিয়ে বলল মহব্বত। "সারা

রাত ডিউটি কইরা ঘুমাইতাছে।”

“ঠিক আছে। ওকে একটু ডেকে আনেনা। ওর সাথে কথা বলবো।”

পাঁচ মিনিট পর আসলাম এসে উপস্থিত হলো। তার চোখে সদ্য ঘুম থেকে জেগে ওঠার স্পষ্ট লক্ষণ।

“টাওয়ারের লোকটি কখন এই ভবন থেকে বের হয়ে গিয়েছিল?” বেগ প্রশ্ন করল আসলামকে।

“টাওয়ারের লোক!? আমি তো কিছু জানি না!” আসলাম বিস্মিত।

জেফরি তাকাল মহব্বতের দিকে। “ও জানে না?”

“আমি তো তারে কই নাই। ডিউটি শ্যাষ কইরা ওরে বুঝাইয়া দিয়া চইলা গেছি,” জবাবে বলল মহব্বত। তারপর আসলামের দিকে তাকিয়ে বলল সে, “আসলাম ভাই, আমার ডিউটি শ্যাষ হইবার একটু আগে টাওয়ারের এক লোক আসছিল...তারে কি আপনি বের হইয়া যাইতে দেহেন নাই?”

“না। এ রকম কাউরে তো দেহি নাই।”

জেফরির গোয়েন্দা মন বলছে কিছু একটা আছে। “আসলাম, তুমি এ রকম কাউকে বের হয়ে যেতে দ্যাখোনি, ঠিক করে বলো?”

“না, স্যার। আমি তো জানিই না টাওয়ারের লোক ঢুকছে।” আসলাম ঘাবড়ে গিয়ে বলল।

এবার মহব্বতের দিকে ফিরল জেফরি। “আচ্ছা, টাওয়ারের যে লোকটি সন্ধ্যার একটু আগে এখানে ঢুকেছিল তাকে কি তুমি চেনো?”

“একেক সময় একেক লোক আসে, চিনমু কেমনে?”

জামানের দিকে তাকাল জেফরি। টাওয়ারের মেইটেনান্স ক্রু লিফট দিয়ে উপরে চলে গেছে।

“জামান, ঐ লোকটাকে ডেকে আনন...”

***

মেইনটেনান্স ক্রুকে ছয়তলার ছাদ থেকে ডেকে এনে জেফরি আর জামান ভালো করে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিশ্চিত হয়েছে বিগত পনেরো দিনে এই প্রথম সেলফোন কোম্পানি থেকে টাওয়ারের মেইনটেনান্স ক্রু ভিটা নুভায় এসেছে। জায়েদ রেহমান যে রাতে খুন হয়েছে সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে তাদের কোনো লোকই এখানে আসেনি।

একটা ক্লু পাওয়া গেল। জায়েদ রেহমান খুন হবার পর ভোরের দিকে ফজরের আজানের পর পর যে অজ্ঞাত যুবক ভিটা নুভা থেকে বের হয়ে গিয়েছিল তার সম্ভাব্য একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে এখন।

মেইনটেনান্স ক্রু'কে জেরা করা শেষ করে জেফরি আর জামান সোজা চলে এল ভিটা নুভার ছয় তলার সিঁড়িঘরের উপর স্থাপিত মোবাইলফোন টাওয়ারের কাছে।

ছয়তলা ছাদ থেকে একটা স্টিলের মই বেয়ে ওটার উপরে উঠতে হয়। ছোট্ট একটা চিলেকোঠার মতো ঘর আর তার ছাদেই স্থাপিত করা হয়েছে লোহার ফ্রেমের তৈরি সেলফোন টাওয়ারটি। এখানে কোনো লোক খুব সহজেই লুকিয়ে থাকতে পারবে। এখন প্রশ্ন, সম্ভাব্য খুনি এখান থেকে জায়েদ রেহমানের ঘরে ঢুকলো কী করে?

ছাদের চারপাশটা ঘুরে দেখল জেফরি। চার ফিট উঁচু দেয়াল দিয়ে পুরো ছাদটি ঘেরা। সেই দেয়ালের উপর রেলিংয়ের মতো মোটা লোহার পাইপ আছে। আজকাল অনেক অ্যাপার্টমেন্টেই এ রকম ডিজাইনের রেলিং থাকে।

দক্ষিণ দিকের বাউন্ডারি দেয়ালের কাছে এসে নিচের দিকে তাকাল সে। জেফরি এখন

যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার নিচেই জায়েদ রেহমানের ঘরটা। সেই ঘরের দক্ষিণমুখী বেলকনিটা দেখতে পাচ্ছে উপর থেকে। তার পাশেই, অল্প দূরে মিসেস রেহমানের ঘরের বেলকনি। একেবারে পাশাপাশি। দুটোর মাঝখানে দূরত্ব বড়জোর তিন ফিট হবে, কিন্তু জেফরির মনোযোগ চলে গেল অন্য দিকে।

ছাদের যে অংশে সে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে লেখকের বেলকনিতে খুব সহজেই নামা যাবে। একটা দড়ি রেলিংয়ে বেধে নিলেই কাজটা করা সম্ভব।

পুরো দৃশ্যটা ভাবলো সে : টাওয়ারের মেইনটেনান্স ক্রু সেজে দারোয়ান বদলির ঠিক আগে দিয়ে অজ্ঞাত এক যুবক ঢুকে পড়ে ভিটা নুভায়। তারপর টাওয়ারের উপর গিয়ে লুকিয়ে থাকে সে। রাত গম্ভীর হলে ছাদের রেলিংয়ে দড়ি লাগিয়ে জায়েদ রেহমানের বেলকনিতে নেমে পড়ে সেই যুবক। লেখককে খুন করে আবার সেই দড়ি বেয়েই উঠে পড়ে ছাদে। ভোর হবার আগপর্যন্ত অপেক্ষা করে। তারপর ফজরের নামাজ পড়তে যাচ্ছে এ রকম একটা ভান করে অ্যালোটি হানিফ সাহেবের পেছন পেছন বেরিয়ে পড়ে ভিটা নুভা থেকে।

অসাধারণ! মনে মনে ভাবলো জেফরি বেগ।

অধ্যায় ৪০

জায়েদ রেহমানের পাঁচ শ পৃষ্ঠার বইটি বিতর্কের ঝড় তুলেছে। এমন সব কথা লেখক স্বীকার করে গেছেন যা সব ধরণের পাঠককেই আগ্রহী করে তুলেছে ব্যাপকভাবে।

শুধু যে নারীঘটিত কেলেংকারীর ঘটনাগুলোই তিনি অকপটে বলে গেছেন তা নয়, নিজের জীবনে এমন কোনো বিষয় নেই যে পাঠককে জানাননি তিনি। এমন কি বিশ্বসাহিত্যের কোন্ লেখকের কোন্ লেখা নকল করেছেন সেসবের বিস্তারিত ফিরিস্তিও দিয়ে গেছেন অবলীলায়।

আর এসব কিছু পড়ে শুধুমাত্র নির্মল প্রকাশনীর সত্ত্বাধিকারী কুদরত সাহেবই নয় বরং অনেক পাঠকের মনেও প্রশ্ন জাগছে, এই বই কি সত্যিই জায়েদ রেহমান লিখেছেন?

নিজের সৃষ্ট বিখ্যাত চরিত্র নীলকণ্ঠ সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা না কি তিনি আশির দশকে জনপ্রিয় আমেরিকান টিভি সিরিজ হাইওয়ে টু হ্যাঁভেন থেকে নিয়েছেন। যেখানে মূল চরিত্রটি বেশ রহস্যময় আর অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, কিছুই করে না, পথে পথে ঘুরে বেড়ায় একটা হ্যাভারসেক নিয়ে। সব সময় একটি পোশাকই পরে থাকে সে : রঙচটা জিন্সপ্যান্ট আর লেদার জ্যাকেট।

এই পথ চলতে গিয়ে বিচিত্র সব মানুষের সাথে তার পরিচয় হয়। সেইসব মানুষের সাথে গড়ে তোলে সখ্যতা, হয়ে ওঠে তাদেরই একজন, তারপর সেইসব মানুষের জীবনে বিশাল কোনো সমস্যার সমাধান অলৌকিক উপায়ে সমাধান করে সবার অগোচরে উধাও হয়ে যায়। শুরু করে আবার নতুন আরেকটি অভিযাত্রা।

ঠিক যেন জায়েদ রেহমানের রহস্যময় চরিত্র নীলকণ্ঠের মতো!

এই চরিত্রটি এ দেশে ভীষণ জনপ্রিয়। এতোটাই জনপ্রিয় যে তরুণদের মধ্যে বিশাল একটি দল নিজেদেরকে রহস্যমানব নীলকণ্ঠ বলে দাবি করে কিংবা সেরকম ভাবতে ভালোবাসে।

সবচাইতে বিস্ময়কর তথ্য হলো লেখক জায়েদ রেহমান তার লেখায় সব সময় দেশপ্রেম আর ন্যায়নীতির কথা বললেও কথা নামের আত্মজীবনীতে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন প্রতি বছর আয়কর হিসেবে তিনি বিরাট রকমের ফাঁকি দিতেন সরকারকে।

বছরে যে লোকের আয় কোটি টাকার উপরে তিনি কি না আয়কর দিতেন মাত্র কয়েক হাজার টাকা। একটা বই থেকে যদি দশ লক্ষ টাকা পেতেন তাহলে সরকারী হিসেবে সেটাকে মাত্র দশ-পনেরো হাজার টাকা। দেখাতেন।

কথা নামক বইয়ের সবচাইতে আকর্ষণীয় দিক অবশ্যই লেখকের নারীঘটিত কাহিনীগুলো। এতো খোলামেলা বর্ণনা রয়েছে যে অনেকের ভুরু কপালে গিয়ে ঠেকছে।

জায়েদ রেহমানের নিজের স্বীকারোক্তিতে যতো নারীর (তার মধ্যে বেশ কয়েকজনকে কিশোরী বলাই সঙ্গত) কথা এসেছে তার খুব কম অংশই জনসাধারণ জানতো। তালিকাটি এতো বড় যে এক জায়গায় লেখক নিজেই। স্বীকার করেছেন অনেকের নামই না কি তিনি ভুলে গেছেন!

অল্প বয়সি মেয়েদের ব্যাপারে বরাবরই তার আগ্রহ ছিল। অনেক মেয়েকে তিনি তার নাটক আর ছবিতে অভিনয় করার আশ্বাস দেখিয়ে নিজের বাগান বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভোগ করেছেন।

পুরো বইটি পড়ে অনেকেই মন্তব্য করেছে এটা জায়েদ রেহমানের আত্মজীবনী নয়, নয় এটা হলো তার আত্মবিধ্বংসী কাজ।

তবে নিজের সুনাম বিনাশ করার পাশাপাশি আরেকজনের ভাবমূর্তিও প্রায় ধ্বংস করে

ফেলেছেন তিনি-তার দ্বিতীয় স্ত্রী বর্ষার।

ছোট মেয়ের বান্ধবী বর্ষার সাথে তার সম্পর্কের খেসারত দিতে গিয়ে লেখককে তার পরিবার আর সন্তানদের পর্যন্ত ত্যাগ করতে হয়েছে অথচ আত্মজীবনীতে সেই মেয়ে সম্পর্কে এমন সব কথা বলেছেন তিনি যা কি না তার নিন্দুকেরা বললই বেশি মানাতো।

হু হু করে বইটি বিক্রি হচ্ছে। কুদরত সাহেব আদালত থেকে কোনো ডিক্রি পাওয়ার আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে এক লক্ষ কপি। ফুলেফেঁপে উঠেছে অবয়ব প্রকাশনীর ব্যবসা। জেফরির সহকারী জামান জানতে পেরেছে। লেখকের প্রথম স্ত্রী, যার নামে বইটির সত্ত্ব দিয়ে গেছেন জায়েদ সাহেব, তিনি ইতিমধ্যেই ষাটলক্ষ টাকা পেয়েছেন রয়্যালটি বাবদ।

টাকার এই অঙ্কের কথা শুনে জেফরির মনে সন্দেহটা আরো বেড়ে গেল। তার আশঙ্কা পেশাদার কাউকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে থাকবে লাভবান হওয়া এইসব লোকজন। কিন্তু ভাবনাটা যতো সহজ প্রমাণ করাটা ততো সহজ হবে না।

আরেকটা বিষয় রয়েছে বইটিতে : লেখক জায়েদ রেহমান তার কিছু শত্রুর কথা ব্যক্ত করেছেন।

পমি নামের এক উঠতি অভিনেত্রী, যাকে লেখক তার একটি ছবিতে নিয়েছিলেন, কিন্তু মেয়েটি ছবির মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে অজ্ঞাত এক কারণে ছবিটা ছেড়ে দেয়। লেখক স্বীকার করেছেন সেই অভিনেত্রীকে তিনি বাজে প্রস্তাব দেয়াতে মেয়েটি ক্ষেপে গিয়ে লেখকের সাথে দুর্ব্যবহার করে। বইতে নিজের আচরণের জন্য জায়েদ রেহমান অবশ্য ক্ষমা চেয়েছে সেই অভিনেত্রীর কাছে।

এ রকম আশঙ্কা তিনি আরো দু'জনের কাছ থেকে করেছেন তার দ্বিতীয় স্ত্রী বর্ষা আর তার গোপন প্রেমিক।

বর্ষার একজন প্রেমিকের কথাও তিনি ইঙ্গিত করেছেন তবে স্পষ্ট করে নাম বলেননি। জীবনের শেষ দিনগুলো এই আশঙ্কাই তিনি করতেন যে, তার খুব কাছের লোকজন তাকে মেরে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্র করছে।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

পুরো দেশ এই বইয়ের আলোচনায় মুখর। অনেকের মনেই প্রশ্ন, জায়েদ রেহমানের কি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল?

আবার অনেকে মনে করছে শেষ দিনগুলোতে এসে লেখক নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ছিলেন। এ কথাটা অবশ্য জায়েদ রেহমান নিজেও তার বইয়ে বার বার বলেছেন।

জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহ পর তার দ্বিতীয় স্ত্রী বর্ষা জামিনে মুক্তি পেয়ে গেল। দু'বছরের এক শিশুসন্তান থাকার কারণে আদালত ভদ্রমহিলাকে জামিন দেন। এজন্যে অবশ্য নির্মল প্রকাশনীর কুদরত সাহেবকে দেশের নাম করা এবং সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক নেয়া এক ব্যারিস্টারের শরণাপন্ন হতে হয়েছে।

তবে মিসেস রেহমানের প্রেমিক আলম শফিককে আদালত জামিন দেয়নি।

খবরটা শুনে জেফরি বেগ একটুও অবাক হলো না। তার ভাবনায় এখন মিসেস রেহমান আর আলম শফিক নেই। লেখক জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডটি নিয়ে সে একেবারে প্রথম থেকে তদন্ত শুরু করতে চাইছে।

ইতিমধ্যেই তার কাছে যে সব তথ্য রয়েছে তাতে করে পুরো মামলাটি নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে তাকে।

তার সহকারী জামান ভিটা নুভায় যে সেলফোন কোম্পানির টাওয়ার আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করে জানতে পেরেছে ঐ দিন তাদের কোনো মেইনটেনান্স কু ভিটা নুভায় যায়নি। মোট তিনজন ক্রু ঐ এলাকার টাওয়ারগুলো দেখাশোনা করে, তাদের কেউই লেখক খুন হবার অন্তত এক সপ্তাহ আগে ভিটা নুভায় যায়নি।

তার মানে দাঁড়াল এক অজ্ঞাত যুবক সুকৌশলে অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে মেইটেনান্স ক্রু সেজে ভিটা নুভায় ঢুকে পড়েছিল। সম্ভবত সেই যুবকই ভোরবেলায় ফজরের আজানের পর পর হানিফ সাহেবের পেছন পেছন অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে বের হয়ে যায়।

অজ্ঞাত সেই যুবক যে পেশাদার একজন সে ব্যাপারে জেফরির মনে কোনো সংশয় নেই। ভিটা নুভায় কখন মোবাইল ফোন কোম্পানির মেইনটেনান্স ক্রু আসে, কখন দারোয়ানদের বদলি হয়, সবই জানতো সে। আর এটা জানার জন্যে দীর্ঘদিন তাকে ভিটা নুভার সব কিছু পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে।

কিন্তু কিভাবে?

এই প্রশ্নের জবাব জানতে আবারো চলে এল ভিটা নুভায়। তবে এবার আর তার সঙ্গে জামান নেই।

ভিটা নুভার গেটের সামনে আসতেই দারোয়ান মহব্বত তাকে দেখে সালাম দিল। ছেলেটা ভয়ে ভয়ে আছে আবার বুঝি জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তাকে। কিন্তু জেফরি তাকে কিছু না বলে ভিটা নুভার চারপাশটা ভালো করে দেখতে শুরু করল।

দুপুর বেলা। রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা। ভিটা নুভা ধানমণ্ডির একটি নিরিবিলি রাস্তার কর্নার প্লটে অবস্থিত। এর দু'পাশ দিয়ে অর্থাৎ দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। পেছনে, উত্তর দিকে ধানমণ্ডি লেক। শুধুমাত্র পূর্ব দিকে আরেকটা অ্যাপার্টমেন্ট ভবন রয়েছে। সেই অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে জায়েদ সাহেবের ফ্ল্যাট এবং ভিটা নুভার প্রধান প্রবেশপথটি দেখা যায় না সুতরাং সেখান থেকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়।

তাহলে?

ভিটা নুভার প্রধান প্রবেশ পথের সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপারে তাকাতেই বিশাল একটি খেলার মাঠ চোখে পড়ল তার। কোনো বাড়িঘর নেই। তবে ওখানেই একটা সম্ভাবনা দেখতে পেল ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ।

রাস্তা পার হয়ে চলে এল ভিটা নুভার ঠিক বিপরীত দিকে ফুটপাতে।

ইন্সপেক্টর এলাহী নেওয়াজ এখান থেকেই আরেক অজ্ঞাত যুবককে সন্দেহজনকভাবে জায়েদ রেহমানের ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছিল। জেফরির মনোযোগ গেল

ফুটপাতের পাশেই ছোট্ট একটি চায়ের টংয়ের দিকে।

টংয়ের দু পাশে দুটো কাঠের বেঞ্চি বসানো। দুটোই ফাঁকা, কোনো খদ্দের নেই। দোকানি অলস ভঙ্গিতে বসে বসে রেডিও শুনছে। বেগকে। আসতে দেখে সম্ভাব্য ক্রেতা ভেবে একটু নড়েচড়ে বসল।

একটা বেঞ্চিতে বসল জেফরি বেগ। "এক কাপ চা দিন, চিনি কম," দোকানিকে বলল সে।

চা বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকটা।

একটু সময় পার হলে বলল, "কতো দিন ধরে আছেন এখানে?"

"এক বছর তো অইবোই," চা বানাতে বানাতে জবাব দিল লোকটা।

"সকাল ক'টা থেকে দোকান খুলেন?"

"আটটার দিকে," কাপে চিনি মিশিয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলল দোকানি। "আর বন্ধ করি...এই ধরেন, রাইত দশটা-এগারোটার দিকে।"

জেফরির দিকে চায়ের কাপটা বাড়িয়ে দিলে সেটা হাতে নিয়ে সে বলল, "এই চা বিক্রি করে আপনার চলে?"

লোকটা মলিন হাসি দিল। "চলে আর কি...গরীব মানুষ...কোনোরকম খায়া-পইড়া বাঁচি।"

"আপনার নাম কি?"

"তালেবর মিয়া।" দোকানি এতোসব প্রশ্ন শুনে অবাক হচ্ছে না। এখানে অনেক ক্রেতাই চা খেতে খেতে এ রকম টুকটাক আলাপ করে তার সাথে। খুব একটা ভিড় না থাকলে তারও কথা বলতে ভালো লাগে।

চায়ে চুমুক দিয়ে জেফরি এমন একটা ভাব করল যেন খুব ভালো স্বাদ পেয়েছে। আপনার চা তো খুব ভালো..."

দোকানির চোখ খুশিতে চক চক করে উঠল। "চ্যাষ্টা করি ভালো কইরা বানাইতে।"

"এই নিরিবিলি এলাকায় কাস্টমার কি খুব একটা আসে?"

"দিনের বেলায় বেশি কাস্টমার আসে না, তয় সন্ধ্যার পর অনেক আসে।" মুচকি একটা হাসি দিয়ে আবার বলতে লাগল সে। "ডাইলখোর পোলাপান..."

তার কথা শুনে হেসে ফেলল জেফরি। "আচ্ছা।"

"এতো চিনি খাইবার পারে এরা...চিনি খাইলে না কি নেশা ধরে।"

"শুধু ডাইলখোররাই আসে?"

"না, অনেকেই আসে...তয় ডাইলখোরের সংখ্যাই বেশি।"

"আচ্ছা, আপনার এখানে নিয়মিত আসতো কিন্তু এক সপ্তাহ ধরে আর আসে না এ রকম কোনো কাস্টমার আছে কি?"

এবার লোকটা জেফরির দিকে চেয়ে রইল। সে বুঝতে পারছে এ লোক খামোখাই তার সাথে আড্ডা জমানোর চেষ্টা করছে না। আপনি কে? এইসব জানতে চাইতাছেন ক্যান?" সন্দেহের সুরে বলল দোকানি।

জেফরি মুচকি হেসে বলল, "কেন জানতে চাইছি তার কারণ আছে। যা জানতে চাইছি বলুন।"

লোকটা জেফরির দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে নিলো। "আপনি কি পুলিশের লোক?" ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল সে।

মুচকি হেসে জেফরি মাথা নেড়ে সায় দিল। "আপনার চা'টা খুব ভালো। আমি এখানে

প্রায়ই আসবো, আপনার চাও খাবো। আপনি আমাকে সাহায্য করলে আপনার লাভ হবে।"

তালেবর মিয়া চুপচাপ শুনে গেল, কিছু বলল না।

"আপনার এখানে কয়েক দিন আগে রোজ রোজ আসতো, এখানে বসে বসে চা খেতো, এখন আর আসে না, সেরকম একজনের কথা জানতে চাইছি আমি।"

"সে কি করছে?" আস্তে করে জানতে চাইল দোকানি। বেগ মুচকি হেসে বলল, "এ রকম একজন তো আসতো, তাই না?"

"তা আসতো...তয় ঐ বাড়িতে লেখক খুন অইবার পর থেইকা আর আসে না," ভিটা নুভার দিকে ইঙ্গিত করে বলল সে।

"আচ্ছা," বলল বেগ। "কতো দিন আগে থেকে আসতো?"

"উমমম...এই ধরেন এক মাস ধইরা..."

"লোকটা দেখতে কেমন?"

"অনেক সুন্দর...আপনার মতোই..."

জেফরি একটু চমকে উঠল। এ নিয়ে দু'জন এ কথা বলল তাকে। বয়স কি রকম হবে?"

"আপনার বয়সিই অইবো...ছোটও অইবার পারে।"

"লোকটা কখন আসতো এখানে?"

"ঠিক নাই। সকাল, বিকাল, রাইত সব সময়ই আসতো।"

"কি করতো?"

"চা খাইতো আর পেপার পড়তো। খুব বেশি কথা কইতো না।"

"ঐ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতো?" ভিটা নুভা দেখিয়ে বলল জেফরি।

"হ।"

"লোকটা কোথায় থাকতো, জানেন?"

"না। মনে হয় নতুন ভাড়া আইছিল...কিন্তু কুন বাড়িতে থাকতো কইবার পারুম না।"

"লোকটাকে যদি আবার দেখেন চিনতে পারবেন?"

"মনে হয় পারুম।"

"তাকে যদি কখনও আবার দেখেন আমাকে জানাবেন।" কথাটা বলেই জেফরি তার একটা ভিজিটিং কার্ড বের করল। "লেখাপড়া জানেন?"

দাঁত বের করে হেসে বলল দোকানি, "হ, জানি। তিন কেলাশ পর্যন্ত পড়ছিলাম।"

"ভালো। ঐ লোকটাকে যখনই দেখতে পাবেন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন। আপনাকে অনেক বখশিস দেবো।"

লোকটার দিকে কার্ডটা বাড়িয়ে দিলে সেটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখে সে বলল, "স্যার, ঐ লেখকের খুনের ব্যাপার,?"

জেফরি একটু ভেবে বলল, "হুমমম। কিন্তু কারোর সাথে এ নিয়ে আলাপ করবেন না। ঠিক আছে, তালেবর মিয়া?"

"ঠিক আছে, স্যার। ঐ লোকটারে দেখলেই আমি আপনারে ফোন কইরা খবর দিমু। আমার নিজের মোবাইল আছে।"

জেফরি একটু অবাক হবার ভান করল। "তাই না কি। তাহলে তো ভালোই হলো। আপনার মোবাইল নাম্বারটা আমাকে দিন।"

দোকানি তাকে তার মোবাইল নাম্বারটা বললে জেফরি সেটা নিজের সেলফোনে রেকর্ড করে রাখতে যাবে অমনি ফোনটা বিপ্ করে উঠল।

ইনকমিং মেসেজের বিপ্। মেসেজটা ওপেন করল সে।

এবার ইংরেজি বর্ণে বাংলা এসএমএস :

কেমন আছো?

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার ভেতর থেকে। বুঝতে পারছে। তারচেয়ে রেবার কষ্টটাও কম নয়। কিন্তু কিছুই করার নেই। তাদের নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেছে। আর সেই নিয়তি মেনে নিতে তাদের দু'জনেরই খুব কষ্ট হচ্ছে।

রেবাকে হারানোটা খুব সহজ কিছু নয়। এই হারানোর ব্যাপারটা ভেতরে ভেতরে তাকে বিপর্যস্ত করে তুলছে।

রেবা এখন কি করছে? খুব জানতে ইচ্ছে করছে জেফরির। নববিবাহিত একটি মেয়ে তার প্রেমিকের জন্য দিনরাত মনোকষ্টে ভুগছে আবার নতুন সংসারে গিয়ে তাকে মানিয়েও চলতে হচ্ছে-জেফরির চেয়ে রেবার কষ্টটা যে আরো বেশি, এটা সে বোঝে।

"স্যার?"

তালেবর মিয়ার কথায় সম্বিত ফিরে পেল বেগ।

"কি?"

"নাম্বারটা নিলেন না যে?"

বুঝতে পারল না বেগ। "কিসের নাম্বার?"

"আমার মোবাইল ফোনের!" অবাক হয়ে বলল তালেবর মিয়া।

"ও," বুঝতে পারল সে। "হ্যাঁ, বলো..."

তালেবর মিয়া তার নাম্বারটা বলে গেল আবার।

অধ্যায় ৪২

মিসেস রেহমান জামিন নিয়ে বের হয়ে এলেও ভিটা নুভার নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ওঠেনি। ওটা এখনও পুলিশ সিজ করে রেখেছে। দু'বছরের শিশু সন্তানকে নিয়ে সোজা মায়ের বাড়িতে উঠেছে বর্ষা।

সাত দিনের দুর্বিষহ স্মৃতি আর সারা দেশের মিডিয়ায় তার সম্পর্কে যে সব মুখরোচক কথাবার্তা প্রচার হচ্ছে তারচেয়েও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে অন্য আরেকটি বিষয় : জায়েদ রেহমানের আত্মজীবনী কথা।

সে কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারছে না এ বই জায়েদ রেহমান লিখেছে। নির্মল প্রকাশনীর কুদরত সাহেব অবয়ব প্রকাশনী থেকে বের হওয়া বইটির এক কপি পাঠিয়ে দিয়েছে তার কাছে। অনেকটুকু পড়ে ফেলার পর মিসেস রেহমান নিশ্চিত বইটি জায়েদ রেহমানের কথা নয়, এটি অন্য কারোর কথা!

এক বছর আগে ওপেনহার্ট সার্জারির পর থেকেই জায়েদ রেহমান একটা আশঙ্কায় ভুগতেন, তিনি বুঝি যেকোনো সময় মারা যাবেন। তারপরই সিদ্ধান্ত নেন আত্মজীবনী লিখবেন। আস্তে আস্তে অন্যান্য কাজের পাশাপাশি তিনি এটা লিখতে শুরু করেন আজ থেকে প্রায় সাত আটমাস আগে-আরেকটা মারাত্মক স্ট্রোকের পর যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

মিসেস রেহমান মাঝেঝমধ্যে ল্যাপটপ থেকে সেই লেখাগুলো পড়ে দেখেছে কিন্তু কথা নামের যে বইটি এখন তার সামনে আছে সেটার সাথে অনেক জায়গারই কোনো মিল নেই। এটাই তাকে বিস্মিত করছে। বইটি যদি বানোয়াট হোতো তাহলে কিছু বিষয়ে মিল আর কিছু বিষয়ে অমিল থাকতো না। প্রথম দিকে লেখক নিজের শৈশব আর লেখালেখির জগতে কিভাবে এলেন এসব বিষয় ঠিকই আছে কিন্তু নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া বিতর্কিত ঘটনাগুলো আর অকপটে স্বীকার করার ব্যাপারটি একদমই বানোয়াট বলে মনে হচ্ছে তার কাছে। জায়েদ রেহমানকে সে ভালো করেই চেনে। নিজের সম্পর্কে এমন কথা কখনই খিতে পারবে না। সব সময় নিজেকে যে লোক নিষ্পপ, রহস্যময় আর সাধুপুরুষদের মতো করে

উপস্থাপন করতে অভ্যস্ত সে এমন কাজ করতে পারে না।

জায়েদ রেহমানকে তো আর তারচেয়ে বেশি কেউ চেনে না।

পরক্ষণেই আরেকজনের কথা মনে পড়ে গেল তার।

না।

তারচেয়ে বেশি চেনে এ রকম আরেকজন আছে।

গ্যাট।

দীর্ঘ সাতাশ বছরের সম্পর্ক সেই মহিলার সাথে। সেদিক থেকে বর্ষার সাথে লেখকের সম্পর্কের বয়স টেনেটুনে পাঁচ বছর। বর্ষার ধারণা জায়েদ রেহমানের প্রথম স্ত্রী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকতে পারে। মহিলা অনেক দিন থেকেই প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত হয়ে ছিল।

জায়েদ রেহমানের সাথে গ্যাটের ডিভোর্সের পর থেকেই মহিলা সব সময় বর্ষার বিরুদ্ধে যা-তা বলে বেড়াতো। কয়েকবার প্রকাশ্যে হুমকিও দিয়েছিল সে।

তাদের দুজনের দ্বন্দ্ব শুরু হয় আজ থেকে চার বছর আগে, যখন জায়েদ রেহমান গ্যাটকে ছেড়ে এই ভিটা নুভায় এসে থাকতে শুরু করেন বর্ষার সাথে। তখনও তাদের বিয়ে কিংবা গ্যাটের সাথে জায়েদ রেহমানের ডিভোর্স হয়নি।

এক দিনের ঘটনা বর্ষা কখনও ভুলবে না। সেই লাঞ্ছনার কথা কখনও ভোলা সম্ভবও নয়।

সন্ধ্যার দিকে প্রচুর মদ পান করে জায়েদ রেহমান লিখতে বসলে বর্ষা ঘরের কী যেন টুকটাক কাজ করছিল। এ সময় কলিংবেলটা বেজে উঠলে কাজের মেয়েটা গিয়ে দরজা খুলে দিতেই গ্যাট চিৎকার করে গালাগালি করতে করতে ঢুকে পড়ে তাদের ফ্ল্যাটে। হৈচৈ শুনে ড্রইংরুমের দিকে পা বাড়াতেই প্রচণ্ডক্ষিপ্ত আর উদভ্রান্তের মতো গ্যাটের মুখোমুখি হয় বর্ষা।

"খানকি! বাপের বয়সি একজনের সাথে ফষ্টিনষ্টি করতে লজ্জা করে না!" বলেই বর্ষার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্যাট।

চড়থাপড় আর কিলঘুষি চালাতে থাকে সমানে। চুল ধরে মাটিতে শুইয়ে ফেলে বর্ষাকে। মহিলার সাথে কোনোভাবেই পেরে ওঠেনি সে। কাজের মেয়েটা এই অবস্থা দেখে দৌড়ে গিয়ে জায়েদ রেহমানকে খবর দিলে তিনিও ছুটে আসেন ড্রইংরুমে কিন্তু মদ্যপ থাকার কারণে গ্যাটের হাত থেকে বর্ষাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হন লেখক। নিজের লুঙ্গির গিট খুলে গেলে অনেকটা অর্ধনগ্ন লেখক অসহায় হয়ে পড়েন, সেই সুযোগে গ্যাট তাকেও বেশ কয়েকটা চড়-লাথি-ঘুষি মেরে বসে।

বর্ষাকে বেদম মারপিট করে মাটিতে ফেলে দিয়ে গ্যাট এরপর যা করল সেটাকে পাগলামি বলাই সঙ্গত।

লুঙ্গি নিয়ে বেসামাল জায়েদ রেহমানকে কষে কয়েকটা চড় মেরে তার লুঙ্গিটা টেনে পুরোপুরি খুলে ফেলে সে। জায়েদ সাহেব কিছুই করতে পারেননি। কাজের মেয়েটা অবস্থা বেগতিক দেখে পাশের ফ্ল্যাটে সাহায্যের জন্যে ছুটে যায়, এই ফাঁকে জায়েদ রেহমানকে পুরোপুরি লুঙ্গিবিহীন করে পাগলের মতো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে গ্যাট।

পাশের ফ্ল্যাট থেকে এক ভদ্রমহিলা ছুটে এসে দেখতে পায় জায়েদ রেহমান ড্রইংরুমে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে একটা সেন্ডো গেঞ্জি থাকলেও নিম্নাঙ্গে কিছুই নেই। লেখকের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে গ্যাট, তার হাতে জায়েদ রেহমানের লুঙ্গি।

"শূয়োরের বাচ্চা! এটাই তোর আসল চেহারা। কেউ না জানুক, আমি জানি তুই কতো বড় খাটাশ!" পাশের ফ্ল্যাট থেকে ছুটে আসা মহিলার দিকে তাকিয়ে উন্মাদের বলতে থাকে গ্যাট, "দেখুন...দেখুন! এই হলো দেশের সবচাইতে জনপ্রিয় লেখকের আসল চেহারা! শূয়োরের বাচ্চা নিজের মেয়ের বান্ধবীকে নিয়ে এই ফ্ল্যাটে ফুর্তি করছে।" তারপর কাছেই কার্পেটের উপর পড়ে থাকা বর্ষার দিকে তাকিয়ে বলে, "আর এই খানকিটা! ওকে আমি নিজের মেয়ের মতো দেখতাম! শুধুমাত্র খ্যাতি আর সহায়-সম্পত্তির জন্য বাপের বয়সি একজনের সাথে লিভটুগেদার করছে?"

প্রচণ্ড ঘৃণায় বর্ষার উপর একদলা থুতু ছুঁড়ে মেরে চিৎকার করে বলতে থাকে সে, "খানকি হবার এতোই যখন শখ, বাজারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক না, মাগি?"

পাশের ফ্ল্যাটের মহিলা ভয়ে ভয়ে তাকে প্রশমিত করার জন্য বলে, "আপা আপনি শান্ত হোন...প্লিজ-"

"আমি শান্ত হবো!" চিৎকার করে বলে গোলনূর আফরোজ তরফদার। "এই বয়সে এসে আমাকে এভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেবার পরও আমি শান্ত হবো! এ রকম একটা বাচ্চা মেয়ের কাছে আমাকে ছোট করার পরও!? আপনি জানেন এটা একজন মেয়ের জন্য কতো বড় অপমান!?"

"গো-গো-গোলনূর, জায়েদ রেহমান কাঁপতে কাঁপতে বলে তার প্রথম। স্ত্রীকে, "প্লিজ... প্লিজ..."

জায়েদ রেহমানের দিকে চট করে ফিরে আরো জোরে চিৎকার করে বলে গ্যাট, "শূয়োরের বাচ্চা! তোর জন্যে আমি কি না করেছি! যখন নুন আনতে পান্তা ফুড়াতো...যখন তোর পকেটে ফুটা পয়সাও থাকতো না...এই আমি...এই আমি তখন তোর পাশে ছিলাম। আর এখন...টাকা কামাতে শুরু করতেই আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খানকি নিয়ে ফুর্তি করতে শুরু করে দিলি??"

"প্লিজ!...প্লিজ!" টলতে টলতে নগ্ন জায়েদ রেহমান তার স্ত্রীকে বলেন। তারপরই ঘটে সেই ঘটনাটি।

গ্যাট নিজের বুক থেকে আচল সরিয়ে এক ঝটকায় ব্লাউজটা টেনে খুলে ফেলে। নিজের স্তন দুটোর দিকে ইঙ্গিত করে পাগলের মতো বলতে থাকে, "এখন আর এগুলো ভালো লাগে না, না? তোর চাই কচি কচি দুদু! এখন আর আমাকে পোষায় না, শূয়োরের বাচ্চা?!"

পাশের ফ্ল্যাটের মহিলা স্তম্ভিত হয়ে দৃশ্যটা দেখতে থাকে।

"ছোটলোকের বাচ্চা! আর কতো ভণ্ডামি করবি?!" বলেই জায়েদ রেহমানের দিকে আরেকটু এগিয়ে যায় সে। "তুই কতো বড় বদমাশ সেটা আমি জানি...অল্পবয়সি মেয়ে দেখলে মাথা ঠিক থাকে না! তোর সারাজীবনের খায়েশ আমি মিটিয়ে দিচ্ছি...!" বলেই এক হাতে লেখকের অণ্ডকোষটা খপ্ করে ধরে ফেলে সে।

"আ-আ...!" এক গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে লেখক জায়েদ রেহমান।

পাশের ফ্ল্যাট থেকে দু'জন শক্তসামর্থ তরুণ ছুটে না এলে সেদিন যে কী ঘটতো কে জানে।

বর্ষার জ্ঞান যখন ফিরে এল দেখতে পেল হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে সে। মোট পাঁচটা সেলাই দিতে হয়েছিল তার মুখে। কপাল আর চিবুকের দু'জায়গায় কেটে গিয়ে খুব রক্তপাত হয়।

বর্ষার তুলনায় লেখক জায়েদ রেহমানের অবস্থা আরো সঙ্গিন হলেও তিনি নিজের বাড়িতেই চিকিত্সা নেন। পুরো ব্যাপারটা ধামাচাপা দেবার জন্যে এ নিয়ে আর পুলিশের কাছে কোনো রিপোর্ট করেননি। একেবারে চেপে যাওয়া হয় ঘটনাটি।

তারপরও এক সাংবাদিক কিভাবে যেন জেনে যায়। এ নিয়ে সে একটি রিপোর্টও তৈরি করে ফেলে তবে তার সেই রিপোর্ট কখনই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। এজন্যে অবশ্য জায়েদ রেহমানকে ছোট্ট একটা চালাকি করতে হয়েছিল।

প্রতিবছর ঈদ সংখ্যায় এ দেশের প্রায় সবগুলো জাতীয় দৈনিকই বিশালাকারের ঈদসংখ্যা প্রকাশ করে থাকে। একজন জনপ্রিয় লেখক হিসেবে জায়েদ রেহমানের উপন্যাস ছাপানো নিয়ে পত্রিকাগুলোর মধ্যে এক ধরণের প্রতিযোগীতা শুরু হয়ে যায় তখন। তবে হাতেগোনা অল্প কয়েকটি পত্রিকাই এই সুযোগটি পেয়ে থাকে।

জায়েদ রেহমান ঐ পত্রিকার সম্পাদককে নিজে ফোন করে আসন্ন ঈদ সংখ্যায় তার পত্রিকার জন্যে একটা ঈদসংখ্যা দেবার প্রস্তাব দিয়ে রিপোর্টটা ছাপানো বন্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

***

মোবাইলফোনের রিং হবার শব্দে অন্যমনস্কতা কাটিয়ে উঠল বর্ষা।

নাম্বারটা অজ্ঞাত।

"হ্যালো?"

"মিসেস রেহমান বলছেন?" ওপাশ থেকে একটা কণ্ঠ জানতে চাইল। বর্ষার কাছে কণ্ঠটা খুব চেনা চেনা লাগছে।

"জি, বলছি।"

"আমি ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ।"

বর্ষা চুপ মেরে গেল। বুঝতে পারছে না কী বলবে। এই লোক তাকে কেন ফোন করেছে?

"হ্যালো...মিসেস রেহমান—"

"জি, বলুন," দ্বিধা কাটিয়ে জবাব দিল বর্ষা।

"কেমন আছেন?" বেশ আন্তরিকতার সাথেই বলল জেফরি।

বর্ষা আবারো অবাক। এই ইনভেস্টিগেটর ভদ্রলোককে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি সে। এমনিতে খুব ভালো ব্যবহার করে তারপরেও সে দ্বিতীয়বার এই লোকের মুখোমুখি হতে চায় না।

"আছি আর কি..." কাটাকাটাভাবে বলল বর্ষা।

"আপনার সাথে একটু দেখা করতে চাই।"

"আমার সাথে!" অবাক হলো সে। "কেন?"

"সেটা দেখা হলেই বলবো।"

একটু ভেবে বলল বর্ষা, "কবে দেখা করবেন?"

"আজই।"

"আজই!..কখন?"

"আপনার যদি কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে আধঘণ্টার মধ্যেই?"

দ্বিধায় পড়ে গেল বর্ষা। ভেবে পাচ্ছে না কী বলবে।

"হ্যালো?" ওপাশে থেকে আবারো তাড়া দিল বেগ।

"ঠিক আছে, আসুন। আমি অবশ্য আমার মায়ের বাড়িতে আছি।"

"আমি জানি। ধন্যবাদ। আধঘণ্টার মধ্যে চলে আসছি।"

ফোনটা রেখেই বর্ষা ভাবনায় পড়ে গেল। এই ইনভেস্টিগেটর তার সাথে আবার দেখা করতে চাচ্ছে কেন?

একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। এভাবে লোকটার সাথে দেখা করা ঠিক হবে না। কী বলতে কি বলে ফেলবে ঠিক নেই।

একটা নাম্বারে ডায়াল করল বর্ষা।

অধ্যায় ৪৩

সহকারী ইনভেস্টিগেটর জামান আহমেদ নিজের ডেস্কে বসে অলস সময় পার করছিল। সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে জায়েদ রেহমানের কেসের কিছু মূল্যবান কাগজপত্র নিয়ে বসল সে। কিছু দিন পরই এসব কাগজপত্র হয় পুলিশকে নয়তো মিসেস রেহমানের জিম্মায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

জায়েদ রেহমান হত্যাকাণ্ডটি প্রথম দিকে তার কাছে এতোটাই সহজ সরল বলে মনে হচ্ছিল যে এসব জিনিস নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে হয়নি। যেখানে আসামী হাতেনাতে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার হয়ে গেছে সেই কেসের আর থাকে কী। শুধুমাত্র কিছু রুটিনমাফিক কাজ করলেই হোতো, কিন্তু তার বস্ জেফরি বেগ এখন নতুন করে তদন্ত শুরু করেছে। জামানের কাছেও এখন মনে হচ্ছে এই কেসটা আসলে খুবই ঘোলাটে। অনেক বিষয় এখনও অস্পষ্ট তাদের কাছে।

জায়েদ রেহমানের ঘর থেকে কিছু কাগজপত্র সিজ করা হয়েছে যার সবগুলোই আছে তার অধীনে। জামান সেগুলো নিয়ে বসল।

তেমন কিছু না : বিদ্যুৎ, ওয়াসা, গ্যাস আর লন্ড্রির বিল, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন, ওষুধ কেনার রশিদ, এ রকম কিছু সাধারণ জিনিস।

জায়েদ রেহমান কোনো ডায়েরি লিখতেন না। তার হাতের লেখার কোনো নমুনা পাওয়া যায়নি ফ্ল্যাটে। এসব মামুলি জিনিস থেকে কু বের করা দুরাশার সামিল। তারপরও কথা থাকে, মামুলি জিনিস থেকেও অনেক সময় বিরাট কিছু পাওয়া যায়। তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দেয়াটা ঠিক না। তবে জামান জানে এসব জিনিস থেকে কিছু পাওয়া অসম্ভব।

কাগজগুলো নাড়তে নাড়তে একটা জায়গায় এসে থেমে গেল সে। গ্যাস আর লন্ড্রির বিলের ফাঁকে ছোট্ট একটা কাগজ আঁটকে আছে। সিজার লিস্ট তৈরি করার সময় এটা তার চোখে পড়েনি। জিনিসটা হাতে নিয়ে দেখল জামান : আইপিএস বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস রিসিপ্ট। তারিখটা দেখে বুঝতে পারল লেখক খুন হবার মাত্র তিন দিন আগের।

সঙ্গে সঙ্গে জামানের মনে পড়ে গেল জায়েদ রেহমানের ঘরে একটি আইপিএস দেখেছিল। তার নিজের ঘরেও এ রকম একটি আইপিএস রয়েছে, সে জানে আইপিএস-এর ব্যাটারিতে প্রতি দুতিন মাস অন্তর অন্তর ডিস্টিল্ড ওয়াটার দিতে হয়। আইপিএস বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানই গ্রাহককে এই সেবা দিয়ে থাকে।

মোবাইল ফোন কোম্পানির টাওয়ারের মেইটেনান্স ক্রু সেজে ভিটা নুভায় এক লোক ঢুকেছিল...কথাটা মনে পড়তেই জামান কৌতূহলী হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

***

মিসেস রেহমান জেফরি বেগকে শীতল অভ্যর্থনা জানাল।

তাকে একটা অপরিসর ড্রইংরুমে নিয়ে গেলে জেফরি দেখতে পেল ওখানে আগে থেকেই বসে আছে নির্মল প্রকাশনীর সত্ত্বাধিকারী কুদরত সাহেব।

এই ভদ্রলোককে সে মোটেও আশা করেনি। বুঝতে পারল মিসেস রেহমান হয়তো একা একা তাকে মোকাবেলা করতে চায়নি তাই ভদ্রলোককে ডেকে এনেছে।

কুশল বিনিময়ের পর জেফরি আসল কথায় চলে এল। "মিসেস রেহমান, আমি আপনার সাথে একান্তে কিছু কথা বলতে চাচ্ছিলাম।"

মহিলা কদরত সাহেবের দিকে তাকাল। "উনি আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আপনি উনার সামনেই বলতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই।"

কুদরত সাহেব দুহাত বুকের কাছে ভাঁজ করে রেখেছে। তার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে

মিসেস রেহমানের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় নেমেছে সে।

আর কিছু বলল না জেফরি। বুঝতে পারছে এই ভদ্রলোককে এখান থেকে খুব সহজে সরানো যাবে না। তবে সে চাইলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভদ্রলোককে এখান থেকে ছুট্টি করে দিতে পারে।

"মি. কুদরত, আপনাকে পেয়ে ভালোই হলো," বলতে শুরু করল জেফরি। "আপনার কাছ থেকেও কিছু বিষয় জেনে নেয়া যাবে।"

কুদরত সাহেব কিছু বলার আগেই মিসেস রেহমান মুখ খুলল। "আমার কাছে কেন এসেছেন সেটা একটু বলবেন কি?"

"এই কেসটার ব্যাপারে কিছু তথ্য পেয়েছি...সেসব নিয়ে আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই।"

"উনি আসলে এই কেস নিয়ে উকিলের উপস্থিতি ছাড়া কারো সাথে আর কিছু বলবেন না," মিসেস রেহমানের হয়ে জবাব দিল কুদরত সাহেব।

মিসেস রেহমানের দিকে তাকাল জেফরি। "এটা অফিশিয়ালি কোনো জিজ্ঞাসাবাদ না।"

"তাহলে...?" অবাক হয়ে মিসেস রেহমান বলল।

"আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার কাছ থেকে কিছু বিষয় জানতে চাইছি। পুরোটাই আনঅফিশিয়ালি। এতে আমার অনেক সাহায্য হবে।"

"আপনার সাহায্যে আসলে আমার তাতে কি! আমি কেন আপনাকে সাহায্য করতে যাবো?" বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল মিসেস রেহমান।

"কারণ আমাকে সাহায্য করলে আপনার লাভ হবে...ক্ষতি হবে না।"

"আপনি কি সব সময় আসামীদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে তদন্ত করেন?"

মুচকি হাসল জেফরি বেগ। "না। সব সময় করি না।"

"তাহলে কখন করেন?"

"যখন আমার মনে হয় ভুল কাউকে আসামী করা হয়েছে তখন...!"

কথাটা শুনে মহিলা ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল তার দিকে। "মানে?"

কুদরত সাহেব কিছু বলতে যাবে অমনি মিসেস রেহমান তাকে হাত তুলে বিরত রাখল। "আপনার মনে হচ্ছে আমাকে ভুল করে আসামী করা হয়েছে?"

"হ্যাঁ।" দৃঢ়ভাবে বলল বেগ।

"তো আপনার এ রকম মনে হবার কারণটা কি জানতে পারি?"

"অবশ্যই পারেন। তবে সে কথা আমি আপনাকে একান্তে বলতে চাই। এটা আপনার ভালোর জন্যেই।"

জেফরির এই কথাতে বেশ কাজ হলো। মিসেস রেহমান কুদরত সাহেবকে বাড়ির ভেতর ডেকে নিয়ে যাবার দশ মিনিট বাদে বিমর্ষ হয়ে চলে গেল অভদ্রলোক।

"এবার বলুন," উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইল মিসেস রেহমান।

"বলছি, তার আগে আপনি বলুন, কথা নামের যে বইটি বের হয়েছে সেটা কি আপনি পড়েছেন?"

"হ্যাঁ, পড়েছি।"

"পড়ে কি মনে হলো?"

একটু চুপ থেকে মহিলা বলল, "ওটা জায়েদ লেখেনি। অন্য কেউ লিখেছে।"

"আপনার কেন এমন মনে হচ্ছে?"

"কারণ কথা নামে ও যে আত্মজীবনীটা লিখতে শুরু করেছিল সেটার প্রায় সবটাই আমি

পড়েছি। এই বইয়ের সাথে তার অনেক অমিল আছে।"

"তার মানে কিছু মিলও আছে?"

একটু ভেবে জবাব দিল মহিলা। "তা আছে, তবে যেসব বিতর্কিত বিষয় এবং জায়েদের অকপট স্বীকারোক্তি হিসেবে লেখা আছে বইটাতে সেগুলোর পুরোটাই বানোয়াট। এ রকম কিছু জায়েদ লেখেনি।"

"ঠিক আছে। আপনি নিশ্চয় জানেন জায়েদ রেহমান খুন হবার আগে অবয়ব প্রকাশনীর আবেদ আলীর কাছে একটা ই-মেইল করেছিলেন, সেই সাথে কথা নামের বইটার পাণ্ডুলিপি?"

"হ্যাঁ।"

"এবার বলুন, খুন হবার রাতে শেষ কখন আপনি জায়েদ সাহেবের ঘরে ঢুকেছিলেন?"

মহিলা মনে করার চেষ্টা করল। "রাত দশটার দিকে হবে।"

"তখন কি আপনি তাকে ল্যাপটপে কাজ করতে দেখেছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"তার সাথে কোনো কথাবার্তা হয়েছিল?"

"তেমন কিছু না। আমি বললাম কি করছো, সে জানাল নতুন একটা বইয়ের কাজ করছে। তারপর ওষুধ খেয়েছে কি না, এখন কেমন লাগছে এইসব কথা বলে গুডনাইট জানিয়ে চলে আসি নিজের ঘরে।"

"আমি যতদূর জানি এরপর হাউজনার্স উনাকে ওষুধ খাইয়ে ল্যাপটপটা বেডের পাশে কফি টেবিলে রেখে তাকে শুইয়ে দিয়ে আসে।"

"আমিও তাই জানি। ওর ঘর থেকে ফিরে এসে হাউজনার্স আমাকে সেটা বলেছে।"

"তার মানে উনি এগারোটার পরই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?"

"তাই তো হবার কথা।"

"কিন্তু আপনি কি জানেন উনি মেইলটা করেছেন রাত ২টার পরে?"

"২টার পরে? এটা কিভাবে সম্ভব?"

"আমারও একই প্রশ্ন, এটা কিভাবে সম্ভব হলো!"

"আপনি কি সন্দেহ করছেন?"

"অবশ্যই কাজটা অন্য কেউ করেছে," বেশ জোর দিয়ে বলল জেফরি।

"অন্য কেউ মানে?"

"আপনি বাদে কেউ।"

"আমি বাদে কেন?"

"কারণ কেউ নিজের পায়ে কুড়াল মারবে না। নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে না।"

মহিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তাহলে আপনি মনে করছেন। কাজটা শফিক করেছে?"

"না।"

জেফরির জবাবটা শুনে মহিলা বেশ অবাক হলো। "তাকে কেন সন্দেহের বাইরে রাখলেন?"

"খুব সহজ। কারণ সে ঐরকম একটা বই আবেদ আলীকে মেইল করবে না। ওখানে আপনার বিরুদ্ধে অনেক কিছু লেখা রয়েছে। এমন কি আপনি অন্য কারো সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন বলেও ইঙ্গিত আছে।"

মহিলা চুপ করে থাকল।

“এ রকম কিছু মি. শফিক কেন করতে যাবে?”

মিসেস রেহমান ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল তার দিকে। এই ইনভেস্টিগেটরকে এখন আর শত্রুভাবাপন্ন বলে মনে হচ্ছে না তার কাছে।

“তাহলে কাজটা করল কে?” মিসেস রেহমান প্রশ্ন করল।

“এমন একজন যেকিনা জায়েদ রেহমান কিংবা আপনার শত্রু। আপনাদের চরম ঘৃণা করে...”

ভদ্রমহিলা আস্তে করে মাথা নেড়ে সায় দিল।

“...আপনাদের উপর চরম প্রতিশোধ নিতে চায়!”

“গ্যাট!” মহিলা চাপা কণ্ঠে বলল।

“আপনি নিশ্চিত?”

দৃঢ়তার সাথে মাথা নেড়ে সায় দিল মিসেস রেহমান। “এই পৃথিবীতে একজনই আছে যে আমাদেরকে চরম ঘৃণা করে...আমাদের সর্বনাশ করতে মরিয়া...আমাদের...” আর বলতে পারল না সে।

“আর কেউ নেই? আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত?”

মাথা দোলাল মহিলা। “এটা গ্যাটের কাজ। সে-ই করিয়েছে।”

জেফরি কিছু বলতে যাবে অমনি তার সেলফোনটা বেজে উঠল। পকেট থেকে বের করে ডিসপ্লেতে দেখতে পেল তার সহকারী জামান ফোন করেছে।

“হ্যাঁ, জামান, বলো...?”

ওপাশ থেকে জামান তাকে কী বলল সেটা মিসেস রেহমান শুনতে না পারলেও দেখতে পেল ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগের অভিব্যক্তিতে বিরাট একটি পরিবর্তন এসেছে। ফোনটা বন্ধ করে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

“মিসেস রেহমান,” গম্ভীর হয়ে বলল সে। “আপনার জন্যে একটা সুসংবাদ আছে।”

অধ্যায় ৪৪

সহকারী ইনভেস্টিগেটর জামান যে খবরটা নিয়ে এসেছে সেটা রীতিমতো অভাবনীয়। এই মূল্যবান তথ্যটি জেফরি বেগকে গোলকধাঁধাতুল্য তদন্ত থেকে বের হবার পথ দেখাচ্ছে।

জায়েদ রেহমানের ঘরে যে আইপিএসটি আছে সেই কোম্পানির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আইপিএস-এর ব্যাটারিতে ডিস্টিলড ওয়াটার যারা ভরে দিয়ে আসে তারা লেখকের খুন হবার এক মাস আগেই শেষবার সার্ভিস দিয়ে এসেছে। জামানের কাছে যে রিসিপ্টটা আছে সেটা নকল। তাদের কোম্পানির রিসিপ্ট কি রকম হয় সেটার একটা নমুনাও তারা দেখিয়েছে তাকে।

হোমিসাইডের নিজের অফিসে বসে আছে জেফরি আর জামান।

"স্যার, জায়েদ সাহেব খুন হবার তিন দিন আগে যে লোক আইপিএস সার্ভিসম্যান পরিচয় দিয়ে ভিটা নুভায় গিয়েছিল সে খুবই পেশাদার একজন হবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল জেফরি। "শুধু পেশাদার না, বলতে পারো খুবই দক্ষ একজন। ভাড়াটে খুনিরা যেরকম হয় এই লোক সেরকম কেউ না।"

"লেখককে খুন করার আগেই তাহলে এই লোক তার ঘরে ঢুকে সব দেখে এসেছিল!"

"হ্যা। আইপিএসটা তো তার ঘরেই।" জেফরি এবার টুকরো টুকরো সব তথ্য জোড়া দিতে লাগল। "লোকটা কয়েক সপ্তাহ ধরে ভিটা নুভার বাইরে একটা চায়ের টঙে বসে বসে রেকি করে গেছে। তারপর নিখুঁত একটি পরিকল্পনা করে সে। এতোটাই নিখুঁত যে সেটা ধরা প্রায় অসম্ভব।"

"কিন্তু স্যার, এ রকম একজন পেশাদার লোককে ভাড়া করল কে?"

খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ইতিমধ্যে জেফরিও এটা ভেবেছে। তার কাছে মনে হয়েছিল ক্যানডিডেটের সংখ্যা দু'জন : আবেদ আলী আর গোলনূর আফরোজ তরফদার। তবে মিসেস রেহমানের সাথে কথা বলার পর তার কাছে মনে হচ্ছে প্রকাশক আবেদ আলীর জড়িত থাকার সম্ভাবনা কিছুটা কম। তার কাছে এ মুহূর্তে প্রধানতম সন্দেহভাজন হলো গ্যাট!

"জায়েদ সাহেবের প্রথম স্ত্রী গোলনূর আফরোজ তরফদার কোথায় থাকে জানো?" জানতে চাইল জেফরি বেগ।

"জানি না তবে সেটা খুব সহজেই জানা যাবে।"

"কিভাবে?"

"আমাদের ডিপার্টমেন্টের কম্পিউটার অ্যানালিস্ট মুরতাজা ঐ মহিলার কেমন জানি আত্মীয় হয়।"

"তাই না কি!"

"জি, স্যার। আমি কি এক্ষুণি তার কাছ থেকে ঠিকানাটা নিয়ে আসবো?"

"হ্যাঁ। মোবাইল ফোনের নাম্বারটাও নিয়ে নিও।"

***

গোলনূর আফরোজ তরফদার যাকে সবাই গ্যাট নামে চেনে কখনই নিজের আলোয় আলোকিত হতে পারেনি, কারণ মাত্র সতেরো বছর বয়স থেকেই জনপ্রিয় লেখক জায়েদ রেহমানের প্রবল আলোয় ম্রিয়মান হয়ে পড়ে সে। এ নিয়ে অবশ্য তার মনে কোনো খেদও ছিল না। নিজের স্বামীর উন্নতি, সমৃদ্ধি তাকে বরং আনন্দই দিতো।

স্বামীর জন্যে মনপ্রাণ ঢেলে সংসার গুছিয়ে রাখতো সে। কোনো বিষয়েই জায়েদ রেহমানকে জড়াতো না লেখালেখির বিঘ্ন হবে বলে। সা সাংসরিক ঝঞ্ঝাট থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখতো। বলতে গেলে নিজের দুই ছেলে মেয়েকে একাই মানুষ করেছে। বিয়ের পর

কতো কষ্ট করেছে সেটা হয়তো আজ অনেকেই ভুলে গেছে, কিন্তু গ্যাট জানে অমানুষিক কষ্ট করেছে এ জীবনে। ছোটখাট একটা চাকরি করতে জায়েদ রেহমান, টানাটানির সংসার। লেখালেখিতে পুরোপুরি মনোযোগ দেবার জন্যে যখন চাকরিটাও ছেড়ে দিল তখন অভাব অনটনে জর্জরিত তারা। লেখালেখি করে প্রতিষ্ঠা পাবার আগে দীর্ঘ দশ বছর অনেক ত্যাগ করতে হয়েছে গ্যাটকে।

কিন্তু একটা সময় তাদের আর্থিক অনটন দূর হয়ে গেল, গাড়ি-বাড়ি সবই হলো তাদের। খ্যাতি আর সচ্ছলতা উপভোগ করতে শুরু করল পরিবারটি। দেশের সবচাইতে জনপ্রিয় লেখকের স্ত্রী হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে গর্বিত বোধ করতে শুরু করল গ্যাট, কিন্তু সেই সুখের সময়টা খুব বেশি দিন দীর্ঘ হলো না।

প্রবল জনপ্রিয় হবার পর জায়েদ রেহমানের ঘাড়ে সিনেমা তৈরির ভুত চেপে বসে। হুটহাট করে দুটো সিনেমাও তৈরি করে ফেলেন তিনি। সেগুলো ব্যবসায়িকভাবে সফল হলে টিভি নাটক আর সিনেমা বানাতে শুরু করেন নিয়মিত, আর এটাই তাকে বদলে দিল আমূল।

চারদিক থেকে কানাঘুষা শোনা যেতে লাগল তার সম্পর্কে। অল্পবয়সি মেয়েদের জড়িয়ে দুয়েকটা রটানাও ছাপা হলো পত্রপত্রিকায়, তারপরেও গ্যাট সেগুলোকে আমলে নেয়নি, মনে করেছে শোবিজ জগতে এ রকম মিথ্যে রটনা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে প্রথম ধাক্কাটা খেলো পমি নামের এক উঠতি অভিনেত্রির সাথে জায়েদ রেহমানের একটি ঘটনায়।

জায়েদ রেহমান তার তৃতীয় চলচ্চিত্রের কাজ শুরু করেছেন তখন। পমি ছিল মূল চরিত্রে। সেন্ট মার্টিনে আউটডোর শুটিংয়ের মাঝপথে পমি ঢাকায় চলে আসে। ছবির বাকি কাজ করতে অস্বীকার করে সে। চারপাশ থেকে গুঞ্জন শোনা যেতে থাকে লেখক জায়েদ রেহমান পমির সাথে এমন বাজে আচরণ করেছেন যার জন্যে মেয়েটা বেঁকে বসেছে।

এ নিয়ে গ্যাটের সাথে জায়েদ রেহমানের তুমুল বাকবিতণ্ডা হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা আর বেশি দূর গড়ায়নি। তবে অনেক দিন পর গ্যাট আসল ঘটনা জানতে পারে, ততো দিনে অবশ্য জায়েদের সাথে তার সেপারেশন শুরু হয়ে গেছে।

কলিংবেলের শব্দে বর্তমানে ফিরে এল গ্যাট। এক ঘণ্টা আগে হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ তাকে ফোন করে জানিয়েছিল তার সাথে একটা বিষয়ে কথা বলতে চায়। ইনভেস্টিগেটরকে ফিরিয়ে দেয়নি সে, কারণ তাতে করে লোকটা সন্দেহ করে বসতে পারতো। খুব সম্ভবত সেই লোকই এখন এসেছে।

***

হোমিসাইডের জামান আহমেদ নিজের ডেস্কে বসে আছে। কিছুক্ষণ আগে তার বস্ জেফরি বেগ চলে গেছে গোলনূর আফরোজ তরফদারের সঙ্গে দেখা করতে। মহিলা অস্বস্তি বোধ করতে পারে তাই জামানকে সঙ্গে নেয়নি। জেফরি বেগ মহিলার সাথে একান্তে কিছু কথা বলতে চায়।

জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি যে এভাবে জটিল হয়ে উঠবে সেটা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি সে। তার বস্ যখন নতুন করে এই কেসটার তদন্ত করতে শুরু করে তখন তার কাছে এটাকে পাগলামি বলেই মনে হয়েছিল।

ডেস্কে থাকা ল্যান্ডফোনটা বেজে উঠলে আনমনেই সেটা হাতে তুলে নিলো জামান।

"সিটি হোমিসাইড থেকে বলছি।"

ওপাশ থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই।

"হ্যালো...কে বলছেন?" জামান তাড়া দিল।

"আমি ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগকে একটু চাচ্ছিলাম।" ফিসফিস করে একটা কণ্ঠ

বলল।

"সরি, উনি এখন অফিসে নেই, বাইরে আছেন..." বলল জামান। "আপনি কে বলছেন?"

"আমি উনাকে একটা তথ্য দিতে চাই। লেখক জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে..."

জামান স্তম্ভিত হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। লোকটার পরিচয় নিয়ে আর মাথা ঘামালো না সে। "আমি সহকারী ইনভেস্টিগেটর জামান বলছি...আপনি আমার কাছে বলতে পারেন।"

নীরবতা নেমে এল ওপাশ থেকে।

"আমি জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের তদন্তে স্যারকে সহায়তা করছি," বলল জামান।

"আমি যে তথ্যটা আপনাকে দেবো সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার আগে আপনাকে কথা দিতে হবে আমার পরিচয় জানার চেষ্টা করবেন না।"

"ঠিক আছে। আপনার পরিচয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাবো না। বলুন, কি বলতে চাচ্ছেন?"

একটু থেমে বলতে শুরু করল ওপাশের লোকটি। "জায়েদ সাহেব যে রাতে খুন হন সে রাতে তার অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে এক ছেলেকে সন্দেহজনকভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল ইন্সপেক্টর এলাহী নেওয়াজ..."

"হুমম...বলুন?"

"...আমি সেই ছেলের পরিচয় জানি!"

নিজের চেয়ারে সোজা হয়ে বসল জামান। "হ্যাঁ, বলুন...?"

"ইন্সপেক্টর কিন্তু সেই ছেলেটাকে গ্রেফতার করেছিল।"

"গ্রেফতার করেছিল??"

"হ্যাঁ।"

"তারপর?" উদগ্রীব হয়ে উঠল জামান।

"মোটা অঙ্কের টাকা খেয়ে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।"

"ছেলেটা কে?"

"বিশিষ্ট শিল্পপতি চৌধুরি ইমরান আহমেদ সিদ্দিকীর একমাত্র সন্তান ইরাম!"

"কি!"

ওপাশের লাইনটা কেটে গেলেও অনেকক্ষণ রিসিভারটা ধরে রাখল জামান।

এ রকম উড়ো ফোনকলকে তারা খুব একটা গুরুত্ব না দিলেও অনেক সময় এভাবেই মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। জামানের কেন জানি মনে হচ্ছে এইমাত্র পাওয়া তথ্যটি সত্যি।

"আপনি এসব কি বলছেন!" জেফরি বেগ যখন গোলনূর আফরোজ তরফদারকে জানাল জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডটির তদন্ত এখন নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে তখন ভদ্রমহিলা অবিশ্বাসে এ কথা বলল।

তারা বসে আছে ড্রইংরুমে। এই বাড়িটা ভদ্রমহিলা পৈতৃকসূত্রে পেয়েছে। জায়েদ রেহমানের সাথে ডিভোর্সের পর থেকে এখানেই এক মেয়ে আর ছেলেকে নিয়ে বসবাস করতে শুরু করে তবে গত বছর একমাত্র মেয়েটি বিয়ে করে দেশের বাইরে চলে গেছে। ছেলে দার্জিলিংয়ের একটি মিশনারি স্কুলে পড়ে। গ্যাট এখন একেবারেই একা।

"আবেদ আলীকে আপনি গত সপ্তাহে অনেকবার ফোন করেছিলেন, তাই না?...কারণটা জানতে পারি কি?"

মহিলা ভুরু কুঁচকে রইল। "আপনারা জানলেন কি করে?"

"আমাদের জন্যে এটা জানা তেমন কঠিন কাজ নয়।"

“আবেদ আলীর সাথে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, তাকে আমি ফোন করতেই পারি।” কাটাকাটাভাবে বলল মহিলা।

“তা পারেন...”

“আপনি কি আমাকে সন্দেহ করছেন?” সরাসরি বলল গ্যাট।

“তা করছি না, তবে কিছু বিষয় পরিস্কার হবার জন্যে আমাকে অনেক কিছু জানতে হবে। সেজন্যেই এসব জানতে চাচ্ছি।” শীতলকণ্ঠে বলল বেগ।

একটু চুপ করে থেকে মহিলা বলল, “পাওনা টাকার জন্যে ফোন দিয়েছিলাম।”

“পাওনা টাকা! কিসের?”

“রয়্যালটির।” ছোট্ট করে বলল মহিলা।

“রয়্যালটি মানে?” বেগ বুঝতে না পেরে বলল।

“জায়েদের অনেক বইয়ের কপিরাইট সত্ত্ব আমার নামে। ওগুলোর প্রায় সবই আবেদ ভাইয়ের ওখান থেকে বের হয়েছে। প্রতি তিনমাস পর পর বইগুলোর রয়্যালটির টাকা আমি তুলে থাকি।”

“আপনি কিন্তু উনাকে অনেকবার ফোন করেছেন?”

“অনেকবার ফোন করে তাকে পাইনি...শুনেছি আজকাল আবেদ ভাই না কি ইন্টারনেট ব্রাউজ করতেই বেশি ব্যস্ত থাকেন। বেশিরভাগ সময় উনার মোবাইল থাকে সাইলেন্স মুডে। এজন্যে অনেকবার ফোন করতে হয়েছিল।

“আচ্ছা।” একটু থেমে জেফরি আবার বলল, “জায়েদ সাহেবের সাথে সম্পর্ক খুবই খারাপ ছিল এ রকম কারোর কথা কি আপনি জানেন?”

“ওর শত্রুর কথা বলছেন?” মহিলা ভুরু উঁচিয়ে জানতে চাইল।

“হ্যাঁ।”

“জায়েদের শত্রু...?” বিড়বিড় করে বলল সে। “আপনার সামনেই বসে আছে। আমি!”

জেফরি বেগ ভিমড়ি খেলেও সেটা প্রকাশ করল না।

“আমি হলাম ওর এক নাম্বার শত্রু?”

“আর দু'নাম্বার শত্রু?” চট করে জিজ্ঞেস করল জেফরি।

মহিলা জেফরির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। “উমমম...পমি!”

“পমি?”

“অভিনেত্রি পমি। চেনেন?”

“চিনি।” এই অভিনেত্রীকে জেফরি তেমন একটা না চিনলেও জায়েদ রেহমানের আত্মজীবনী কথায় তার উল্লেখ রয়েছে বলে নামটা শুনেই চিনতে পারল।

“তাকে ছাড়া তো আর কাউকে দেখছি না।”

“পমি কেন?” জানতে চাইল জেফরি।

“জায়েদ ওকে ধর্ষণ করেছিল!” নির্বিকারভাবে বলল মহিলা।

অধ্যায় ৪৫

ধানমণ্ডি থানার ইন্সপেক্টর এলাহী নেওয়াজকে ডেকে আনা হয়েছে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে। পুলিশ ভদ্রলোক মনে করছে জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে হোমিসাইড হয়তো তাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেবে। পুলিশের অধীনে থাকা হত্যাকাণ্ডের কেসগুলোতে সাহায্য করাই হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের কাজ।

জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডে এলাহীর অবদান অনস্বীকার্য। হোমিসাইডের সবচেয়ে মেধাবী ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগও সেটা জানে। এমনও হতে পারে জেফরি বেগ হয়তো তাকে আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ দেবার জন্যে এখানে ডেকে এনেছে। কারণ তার সহকারী জামান দু'ঘণ্টা আগে তাকে ফোন করে বলেছে হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ তাকে চায়ের দাওয়াত দিয়েছে।

এফবিআই'র ট্রেনিং নেয়া লোক, তাই বোধহয় আমেরিকান স্টাইলে ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছে, মনে মনে ভাবলো ইন্সপেক্টর ।

এলাহী নেওয়াজ একা বসে আছে জেফরি বেগের অফিসে। প্রায় দশ মিনিট হয়ে গেছে এখনও কারোর দেখা নেই। হোমিসাইডের একজন বলেছে ইনভেস্টিগেটর বাইরে আছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। সহকারী জামান অবশ্য ছিল তবে কী একটা কাজে সেও কিছুক্ষণ আগে বাইরে চলে গেছে।

জেফরি বেগের অফিসটা একেবারেই সাদামাটা তবে ডান দিকের দেয়ালে একটা ফ্রেমে এফবিআই'র ট্রেনিংয়ের যে সার্টিফিকেটটা আছে সেটার উপস্থিতি পুরো ঘরটায় এক ধরণের আভিজাত্য এনে দিয়েছে। চেয়ার থেকে উঠে সেই ফ্রেমটার সামনে দাঁড়াল এলাহী নেওয়াজ।

আচ্ছা, তাহলে এফবিআই'র সার্টিফিকেট এমন হয়!

ইংরেজিতে ভীষণ কাঁচা এলাহী নেওয়াজ সার্টিফিকেটের লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করল। না। ইংরেজি বোঝাটা তার কাজ না। তার ভাণ্ডারে খুব কম ইংরেজি শব্দই আছে। নিশ্চয় জেফরি বেগের অনেক প্রশংসা করা হয়েছে এখানে। এলাহী শুনেছে, এফবিআই'তে না কি জেফরি অনেক ভালোভাবে ট্রেনিং শেষ করেছে। এই লোকের সবই ভালো শুধু নামটা তার কাছে কেমন জানি খটকা লাগে। ডেস্কের এক কোণে ছোট্ট একটি ছবির ফ্রেম। এক খৃস্টান ফাদার, কোলে সাত-আট বছরের এক বাচ্চাছেলে। তাহলে খৃস্টান!? মনে মনে ভাবলো ইন্সপেক্টর।

"সরি।" পেছন থেকে একটা আন্তরিকমাখা কণ্ঠ বললে এলাহী নেওয়াজ চমকে উঠেলো। ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে।

"স্যার, স্লামালাইকুম, ইন্সপেক্টর বলল।

"দেরির জন্যে দুঃখিত। কতোক্ষণ আগে এসেছেন?" এলাহী নেওয়াজের সাথে করমর্দন করে নিজের ডেস্কে বসল সে।

"এই তো...দশ-পনেরো মিনিট হবে।"

"বসুন।"

এলাহী নেওয়াজ চেয়ারে বসল।

"চা-টা কিছু দিয়েছে?"

"না। তার কোনো দরকার নেই, স্যার।"

তার কথাটা আমলে না নিয়ে ইন্টারকমে দুকাপ চায়ের জন্যে বলে দিল বেগ।

"তো কেমন চলছে, ইন্সপেক্টর?"

"জি, স্যার, চলছে আর কি। কাজের অনেক চাপ।"

"ধানমণ্ডি থানায় তো খুব বেশি ক্রাইম হয় না। অন্য থানার চেয়ে এখানকার অবস্থা বেশ ভালো।"

"তা ঠিক। তবে ভিআইপিদের সংখ্যা বেশি, কুলিয়ে উঠতে পারি না।"

"জায়েদ সাহেবের কেসের খবর কি?"

এই প্রশ্ন করাতে এলাহী নেওয়াজ একটু উৎসাহ বোধ করল। তার ধারণা এই কেসের জন্য কিছু দিনের মধ্যে সে একটা প্রমোশন পেতে যাচ্ছে। "স্যার, আশা করছি এক মাসের মধ্যে ফাইনাল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট দিতে পারবো।"

"গুড।" একটু চুপ করে থেকে আবার বলল জেফরি, "আপনাদের ওসি তো আলী হোসেন সাহেব, তাই না?"

"জি, স্যার।"

এমন সময় দরজায় নক হলে জেফরি ভেতরে আসার জন্যে বলতেই পিয়ন চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

"প্লিজ, চা নিন," পিয়ন ছেলেটা চলে যাবার পর এলাহী নেওয়াজকে বলল জেফরি। "এই কেসটায় আপনি বেশ ভালো কাজ করেছেন, ইন্সপেক্টর।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার," বিগলিত হয়ে বলল এলাহী।

"আপনার মতো দক্ষ পুলিশ অফিসার খুব কমই আমি দেখেছি।" চায়ে একটা লম্বা চুমুক দিল জেফরি। কিন্তু আমার মাথায় ঢুকছে না এতো বড় বোকামি আপনি কেন করলেন?"

জেফরির মুখ থেকে শেষ কথাটা শুনে চমকে উঠল এলাহী। কানে ভুল শুনছে না তো। প্রশংসা করতে করতে ইনভেস্টিগেটর এ কী বলছে!

"জি স্যার...বুঝলাম না?"

"চৌধুরি ইরাম আহমেদ সিদ্দিকীকে গ্রেফতার করার ঘটনাটি চেপে গেলেন কেন?"

বিষম খেলো যেন। নিজের অভিব্যক্তি লুকাতে পারল না ইন্সপেক্টর। চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল আস্তে করে। কী বলবে বুঝতে পারছে না। তবে সে জানে ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগের কাছে এখন আর কোনো কিছু লুকাতে পারবে না। এই লোক সব জেনেই তাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

তাহলে এজন্যেই ডেকে আনা হয়েছে আমাকে।

"জায়েদ সাহেবের কেসে আপনার ভূমিকায় আমি ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। আপনাকে আমি খুব পছন্দও করি...কিন্তু এতোবড় একটা ভুল আপনি করলেন কি করে মাথায় ঢুকছে না।"

"স্যার, আমার কোনো দোষ নেই...হোমমিনিস্টারের রিকোয়েস্ট ছিল ওটা। উনি তো সি ই এ সিদ্দিকীর ঘনিষ্ঠ লোক। আমি ছেলেটাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাবার পর ওসি সাহেব ফোন করে ছেড়ে দিতে বললেন..."

"হোমমিনিস্টার বছে?" জেফরির সন্দেহ হলো।

"জি, স্যার। আপনি ওসি সাহেবকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।"

"কিন্তু আপনার কি একবারও মনে হলো না জায়েদ সাহেবের খুনের ঘটনায় ঐ ছেলেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ?"

"স্যার...আমার মনে হয়েছিল কিন্তু...ওসি সাহেব বললেন তাই..." মাথা নিচু করে অনুশোচনায় আক্রান্ত হলো এলাহী। সে বুঝতে পারছে প্রমোশনের বদলে এখন ডিমোশন জুটতে পারে তার কপালে।

“ছেলেটা কি গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য দিয়েছিল আপনার কাছে?”

“না, স্যার। পুরোপুরি নেশাগ্রস্ত ছিল। কেন যে ঐ অ্যাপার্টমেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বুঝতে পারছি না। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম ডাকাত দলের সদস্য কিন্তু পরে জানতে পারি তার বাবা হলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ি।”

“আপনি বলছেন ওসি সাহেব হোমমিনিস্টারের কাছ থেকে অর্ডার পেয়ে ছেলেটাকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে আপনাকে বলেছে?”

“জি, স্যার!” জোর দিয়ে বলল ইন্সপেক্টর।

“তাহলে ওরা আপনাকে অতোগুলো টাকা দিল কেন?” কথাটা বলে স্থির চোখে চেয়ে রইল জেফরি।

ঘাবড়ে গেল এলাহী নেওয়াজ। এই লোক এতো কিছু জানল কী করে! টাকা নেয়ার কথাটা অস্বীকার করে আরো বড় কোনো সমস্যায় পড়তে চাইল ইন্সপেক্টর। “স্যার, বিশ্বাস করেন আমি টাকা চাইনি। সিদ্দিকী সাহেব থানায় এলে আমি সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলেকে তার হাতে তুলে দেই। কোনো টাকা দাবি করিনি। হোমমিনিস্টারের লোকের কাছে টাকা চাইবো এতো বড় আহাম্মক আমি নই–”

“তাহলে?”

“সিদ্দিকী সাহেবের উকিল পরে আমাকে এ টাকাটা দিয়ে গেছে। আমি নিতে চাইনি, বলতে পারেন জোর করেই দিয়ে গেছে।”

জেফরি জানে কথাটা সত্যি। একটু চুপ থেকে বলল সে, “তারপরও আমি বলবো আপনি একটা আহাম্মক।” ।

ইন্সপেক্টর আতঙ্কভরা চোখে তাকাল তার দিকে।

“কারণ আপনি ভেবেছেন কথাটা কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না। ভুলে গেছেন আপনার অনেক সহকর্মী আছে, হয়তো এ ব্যাপারটা তারা ভালো চোখে দেখেনি।”

এলাহী বুঝতে পারছে এই ঘটনাটা কে ফাঁস করেছে। সাব-ইন্সপেক্টর সমীর দাস ছাড়া আর কেউ এ কাজ করার সাহস দেখাবে না। তাকে কিছু টাকা দিয়ে দিলে আজ আর এ রকম বিপদে পড়তো না সে। একটু লোভ সংবরণ করলে কেউ ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটা জানতে পারতো না।

“মি. এলাহী, চৌধুরি ইরাম আহমেদ সিদ্দিকী এখন কোথায় আছে জানেন?” গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ।

“জানি, স্যার, “ আস্তে করে বলল সে।

“গুড,” বলল জেফরি। “যা হবার হয়েছে, এখন আমি চাইবো আপনি আমাকে পুরোপুরি সহযোগীতা করবেন।”

আশার আলো দেখতে পেল ইন্সপেক্টর। “জি, স্যার। অবশ্যই করবো।”

“ইরাম সিদ্দিকী এখন কোথায় আছে, বলুন?”

অধ্যায় ৪৬

অভিনেত্রী পমিকে জায়েদ রেহমান ধর্ষণ করেছেন।

কথাটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে জেফরি বেগের। তবে জায়েদ সাহেবের সাবেক স্ত্রী গ্যাট যেভাবে বলল তাতে অবিশ্বাস করারও উপায় নেই। এটাও তো ঠিক কথা নামের আত্মজীবনীতেও লেখক এ রকম একটা ঘটনার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

"আপনি কি অভিনেত্রী পমিকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন?" জেফরির কাছ থেকে সব শুনে প্রশ্ন করল জামান।

"আপাতত সেরকম কোনো ইচ্ছে আমার নেই।" একটু চুপ থেকে আবার বলতে লাগল জেফরি, "এভাবে একের পর একজনকে সন্দেহ করে তদন্তকাজ তো এগোচ্ছে না, বরং আরো বেশি জটিল হয়ে উঠছে।"

"তাহলে...?"

"আমাদের এখন মনোযোগ দিতে হবে ঐ যুবকের উপর। সে কে সেটা খুঁজে বের করলে জানা যেতো কার হয়ে কাজটা করেছে। আমি এখন আসল কালপ্রিটকে না খুঁজে বরং নিজ হাতে যে হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে তার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী।"

"কিন্তু তাকে খুঁজে বের করাটা কি খুব সহজ হবে, স্যার?"

"মোটেই না।" নিজের ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়াল সে। তার ছোট্ট পরিসরের অফিসের ভেতর পায়চারী করতে লাগল। "আমাদের খুনি শুধু খুনই করেনি...খুনটা সে করেছে এমন এক সময় যখন লেখকের স্ত্রী পাশের ঘরে তার প্রেমিকের সাথে গোপন অভিসারে লিপ্ত। এই দিনটি, মুহূর্তটি খুব বিচক্ষণতার সাথেই বেছে নিয়েছে সে। তারপর লেখকের কম্পিউটার থেকে বানোয়াট একটি পাণ্ডুলিপি মেইল করে পুরো ব্যাপারটি গোলকধাঁধার মতো করে ফেলেছে। আর এসবই করা হয়েছে লেখকের ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে।"

"শুধুমাত্র পেশাদার করো পক্ষেই এ কাজ করা সম্ভব।" জামান মন্তব্য করল। "আপনার কাছ থেকে সব শুনে আমার মনে হচ্ছে অভিনেত্রী পমিও এ কাজ করতে পারে।"

"কেন এ রকম মনে হচ্ছে?" জেফরি একটু বাজিয়ে দেখতে চাইল তার সহকারীকে।

"কারণ লেখক জায়েদ রেহমান কেবল খুনই হননি সেই সাথে তার ভাবমূর্তিও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার মানসম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। পমি যদি লেখকের হাতে ধর্ষিত হয়ে থাকে তাহলে সে এ রকমভাবেই প্রতিশোধ নিতে চাইবে।"

"অবশ্য আমার কাছে মনে হচ্ছে কাজটা করতে পারে সম্ভাব্য তিনজন : গ্যাট, আবেদ আলী এবং পমি। তবে আবেদ আলী আর গ্যাটের ব্যাপারে আমার সন্দেহ একটু বেশি। পমির ব্যাপারটা আমার কাছে খুব দুর্বল মনে হচ্ছে। ভুলে যেও না আবেদ আলী আর গ্যাট এ ঘটনায় বেশ লাভবান হয়েছে।"

"আপনি কি আলম শফিক আর মিসেস রেহমানকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ রাখছেন?"

"এতো কিছু জানার পর মনে হচ্ছে না কাজটা তারা করেছে।"

"তাহলে সি ই এ সিদ্দিকী সাহেবের ছেলের কানেকশানটা কোথায়?"

"ভালো প্রশ্ন করেছে। এদের তিনজনের যেকোনো একজনের সাথে যদি তার কানেকশান বের করা যায় তাহলে অনেক সহজ হয়ে যাবে কেসটা।"

জামান এবার বুঝতে পারছে তার বস কিভাবে এগোতে চাচ্ছে। "তাহলে আপনি কি এখন তাকে খুঁজে বের করতে চাইছেন?"

"হ্যাঁ, তা-ই চাইছি, তবে ছেলেটাকে সিদ্দিকী সাহেব বোম্বের এক রিহ্যাবে পাঠিয়ে

দিয়েছে। যতোদূর জানতে পেরেছি ছয় মাসের আগে সে দেশে ফিরবে না।”

“আপনি কি তাহলে ছয়মাস অপেক্ষা করবেন?” জানতে চাইল জামান।

“না।”

“তাহলে?”

“দেখি কি করা যায়। মুখে এ কথা বললেও হঠাৎ করেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে।

***

সি ই এ সিদ্দিকী নিজের বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের হেডঅফিসে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। কয়েক দিনের জন্যে দেশের বাইরে গেলে এমনই হয়-একগাদা কাজ জমে থাকে। এই ব্যস্ততার মাঝেও নিজের একমাত্র সন্তান ইরামের সাথে ফোনে কথা বলতে ভুলে যাননি। লাঞ্চের পর একটু সময় বিশ্রাম নেন তিনি, সেই সময়টাতে ছেলের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলেছেন। তার সাথে কথা বলার পর থেকেই তিনি বেশ রিলাক্স মুডে আছেন।

ট্রিটমেন্টটা বোধহয় ভালোই চলছে, কারণ তার ছেলে আজ বেশ গুছিয়ে কথা বলেছে। তার কাছে মনে হচ্ছে ওখানে কয়েকটা মাস থাকলে ইরাম পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে।

এমন সময় ইন্টারকমটা বেজে উঠলে তিনি সেটা তুলে নিলেন। তার পারসোনাল সেক্রেটারি তাকে জানাল সিটি হোমিসাইড থেকে ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ নামের এক লোক তার সাথে দেখা করতে চাইছে।

মাইগড!

কি বলবেন বুঝতে না পেরে সিদ্দিকী সাহেব সেক্রেটারিকে বলে দিলেন ইনভেস্টিগেটরকে দশ মিনিট অপেক্ষা করতে। তিনি জরুরি একটা কাজ করছেন।

ইন্টারকমটা রেখেই সঙ্গে সঙ্গে অমূল্য বাবুকে ফোন করে জানালেন ব্যাপারটা।

“আপনি তার সাথে দেখা করেন। সমস্যা নেই। বরং না দেখা করলেই লোকটা উল্টাপাল্টা ভাবতে শুরু করবে।”

“আপনার কি মনে হয় সে ইরামের ব্যাপারটা জেনে গেছে?” উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন তিনি।

একটু চুপ করে থেকে বাবু বলল, “...খুব সম্ভবত ইরামের গ্রেফতারের ব্যাপারটা জেনে গেছে। এর বেশি জানার কথা নয়। আপনি একদম স্বাভাবিকভাবে কথা বলবেন।”

“আপনি থাকলে অনেক সুবিধা হোতো...”

“তা ঠিক। আপনি কথা বলতে শুরু করুন...আমি দেখি কতো জলদি আসতে পারি।”

“তহলে তাকে আমি ভেতরে আসতে বলে দেই?”

“অবশ্যই।”

“আপনি কিন্তু দেরি করবেন না।”

“একদম চিন্তা করবেন না...আমি আসছি।”

ফোনটা নামিয়ে রেখে সিদ্দিকী সাহেব কিছুক্ষণ চুপ মেরে রইলেন। নিজেকে ধাতস্থ করে নিচ্ছেন তিনি। পাঁচ মিনিট পর ইন্টারকমটা তুলে সেক্রেটারিকে বলে দিলেন ইনভেস্টিগেটরকে ভেতরে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল দেবদূতের মতো দেখতে এক যুবক। সিদ্দিকী সাহেবের দিকে হাত বাড়িয়ে বেশ মার্জিতভাবে বলল সে, “আমি সিটি হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ।”

কোনো কথা না বলে হাত মেলালেন সিদ্দিকী সাহেব, তারপর চেয়ারে বসার ইশারা করলেন ভিজিটরকে।

"থ্যাঙ্কস," সিদ্দিকী সাহেবের বিশাল ডেস্কের বিপরীতে একটা চেয়ারে বসে বলল বেগ।

"তো কি মনে করে আমার এখানে আসা?" ভাববাচ্যে জানতে চাইলেন সি ই এ সিদ্দিকী।

"আমি লেখক জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছি। সেই বিষয়ে

একটু কথা বলতে এসেছি।"

একটু অবাক হলেন সিদ্দিকী সাহেব। "আচ্ছা। বলুন কি জন্যে এসেছেন...আমার হাতে অবশ্য খুব বেশি সময় নেই।"

"আমি বেশি সময় নেবো না। ব্যাপারটা আপনার ছেলে ইরামকে নিয়ে..."

"বলে যান," আস্তে করে বললেন তিনি।

"আমি জানতে পেরেছি জায়েদ রেহমান যে রাতে খুন হলেন সে রাতে ইরাম পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিল।" একটু থেমে সিদ্দিকী সাহেবের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করল জেফরি। ভদ্রলোক নির্বিকার। "আপনি নিজে থানায় গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনেন..."

ভদ্রলোক কিছুই বললেন না।

"আমি কি ঠিক বলেছি?" প্রশ্ন রাখল জেফরি।

"আপনি আসলে কি জানতে চাইছেন, ইনভেস্টিগেটর?" ভরাট কণ্ঠে বললেন তিনি।

"আমার ধারণা আপনার ছেলে জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানে।"

নিজের চেয়ারে সোজা হয়ে বসেলেন। "আপনি মনে করছেন ঐ লেখকের হত্যাকাণ্ডে আমার ছেলে জড়িত?"

এভাবে সরাসরি বলাতে জেফরি একটু ভিমড়ি খেলো। "না। আমি তা বলছি না। সম্ভবত হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানে।"

"লেখক খুন হবার রাতে সে তার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল...এই তো?"

"জি।"

"আপনি আমার ছেলে সম্পর্কে কতোটুকু জানেন?"

"খুব বেশি কিছু জানি না। শুধু জানি আপনার ছেলে বোধহয় মাদকাক্ত–"

"বোধহয় না, সে বেশ ভালোভাবেই মাদকাসক্ত।"

নিজের ছেলে সম্পর্কে এভাবে স্পষ্ট কথা বলাতে জেফরি আবারো অবাক হলো। শত কোটি টাকার মালিকেরা কি এভাবেই কথা বলে! মনে মনে বলল জেফরি।

"আর কি জানেন?" জেফরিকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনি জানতে চাইলেন।

"আমি আসলে তার সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না।"

"আপনি জানতে চাচ্ছেন সেই রাতে আমার ছেলে কেন জায়েদ রেহমানের বাড়ির সামনে গিয়েছিল, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় দিল জেফরি।

"আমার ছেলে লেখক জায়েদ রেহমানের অন্ধভক্ত। লেখক জায়েদ রেহমান রেহমানও সেটা জানতেন। এমনকি তিনি ইরামকে একটি বইও উৎসর্গ করেছিলেন। বলতে পারেন লেখক জায়েদ রেহমানের সবচাইতে বড় ভক্তের নাম হলো চৌধুরি ইরাম আহমেদ সিদ্দিকী।"

জেফরি এটা জানতো না। কথাটা শুনে খুব অবাকই হলো সে। "তা বুঝলাম কিন্তু—"

সিদ্দিকী সাহেবের অফিসের দরজা খুলে এক লোক ঢুকে পড়ল বিনা। অনুমতিতে।

মেদহীন শরীরের এক পঞ্চাশোর্ধ লোক। কিছু না বলে সোজা জেফরির পাশের চেয়ারে এসে বসে পড়ল সে। সিদ্দিকী সাহেবের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালে তিনি বললেন, "ইনি

হলেন অমূল্য বাবু। আমার...খুবই কাছের একজন। আপনি উনার সামনে বলতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই।"

সিদ্দিকী সাহেবের আশ্বাস পেয়ে জেফরি আবার বলতে লাগল, "অতো রাতে আপনার ছেলে তার বাড়ির সামনে কেন গেল...আর আপনিই বা তাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে এনে সেদিনই বোম্বের এক রিহ্যাবে পাঠিয়ে দিলেন কেন?"

মুচকি হেসে অমূল্য বাবুর দিকে তাকালেন সিদ্দিকী সাহেব।

"কারণ পরদিন তাকে বোম্বের রিহ্যাবে পাঠিয়ে দেয়া হবে সেজন্যে..." পাশ থেকে অমূল্য বাবু নামের লোকটি বললে জেফরি তার দিকে তাকাল। "..বাড়ি থেকে পালিয়ে লেখক জায়েদ রেহমানের সাথে হয়তো দেখা করার উদ্দেশ্যে সেখানে গেছিল।"

মাথা নেড়ে কথাটার সাথে সায় দিলেন সিদ্দিকী সাহেব।

জেফরি কিছু বলল না। স্থির চোখে চেয়ে রইল অমূল্য বাবু নামের লোকটির দিকে।

"কি ভাবছেন, ইনভেস্টিগেটর সাহেব?" জানতে চাইলেন সিদ্দিকী সাহেব।

"বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আপনি কেন ধানমণ্ডি থানার ইন্সপেক্টর এলাহী নেওয়াজকে অতোগুলো টাকা দিতে গেলেন?"

কিছুক্ষণ চুপ মেরে অমূল্য বাবুর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "খুব সহজ...পুলিশ যাতে আমার ছেলেকে হ্যারাজমেন্ট না করে। খামোখা তাকে নিয়ে টানাটানি না করে।"

"কিন্তু আপনি তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ লোক, আপনি কেন সামান্য একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরকে অতোগুলো টাকা দেবেন?"

সিদ্দিকী সাহেব আর অমূল্য বাবু নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে নিলেন।

"পুলিশের মুখ বন্ধ করার জন্যে টাকা ছাড়া আর কিছু আছে!" অমূল্য বাবু বলল। "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ লোক বললেই এরা মুখ বন্ধ রাখবে ভেবেছেন?"

"এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন ওদের মুখ বন্ধ রাখা কতোটা কঠিন।" সিদ্দিকী সাহেব বললেন।

মাথা নেড়ে সায় দিল জেফরি বেগ। চৌধুরি ইরাম আহমেদ সিদ্দিকী আরেকটা কানাগলি! গোলকধাঁধার আরেকটা কানাগলিতে গিয়ে ঢুকে পড়েছে সে।

"ইনভেস্টিগেটর?" জেফরির অন্যমনস্কতা ভাঙার জন্যে বললেন সিদ্দিকী সাহেব। "আমার একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আপনার যদি আর কিছু না জানার থাকে তাহলে..."

"ওহ্ সরি," কথাটা বলেই চট করে উঠে পড়ল জেফরি। "আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। হোপ ইউ ডোন্ট মাইন্ড।"

"নট অ্যাট অল," বললেন তিনি। "আশা করি আপনি এখন পুরো বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন।"

"অবশ্যই। তাহলে আমি আর আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করবো না। আসি।" কথাটা বলে সিদ্দিকী সাহেবের সাথে হাত মিলিয়ে দ্রুত বের হয়ে গেল জেফরি বেগ।

অধ্যায় ৪৭

হোমিসাইডের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ তার প্রিয়পাত্র জেফরি বেগের উপর না রেগে পারল না।

সিদ্দিকী সাহেব যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ লোক সেটা জেনেও কোন্ আক্কেলে তার অফিসে গেল সে!

যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিদ্দিকী সাহেবের ছেলেকে থানা থেকে ছেড়ে দিতে বলেও থাকেন সেটা নিয়ে এতো বেশি ভাবার কী আছে? বড়লোকের নেশাখোর ছেলে তার প্রিয় লেখকের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল আর জেফরি সন্দেহ করতে শুরু করে দিল এই ছেলে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত!

এতোটা স্টুপিডিটি জেফরির কাছে থেকে সে আশা করেনি। অন্তত সিদ্দিকী সাহেবের অফিসে যাবার আগে তাকে জানানো উচিত ছিল।

"তুমি যদি আমাকে ওখানে যাবার আগে জানাতে তাহলে আমি তোমাকে যেতে বারণ করতাম," তার সামনে বসে থাকা জেফরি বেগের উদ্দেশ্যে বলল ফারুক আহমেদ। সিদ্দিকী সাহেবের ওখান থেকে জেফরি চলে আসার পর পরই বেচারা মহাপরিচালক চাপের মধ্যে পড়ে গেছে। "ভদ্রলোক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে নালিশ করেছেন।"

জেফরিও বুঝতে পারছে এভাবে হুট করে সি ই এ সিদ্দিকী সাহেবের অফিসে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। এই কেসে ইরামকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল সে। এখন দেখা যাচ্ছে নিতান্তই কাকতালীয় একটি ব্যাপার। সবচাইতে বড় কথা ইরাম হলো লেখক জায়েদ রেহমানের একজন অন্ধভক্ত। ভালো করে খোঁজখবর না নিয়েই তার ব্যাপারে কিছু জানতে চাওয়াটা একদম ভুল হয়ে গেছে।

"আমি মন্ত্রী সাহেবকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি। আপাতত উনাকে ঠাণ্ডা করা গেছে কিন্তু এ ব্যাপারটা নিয়ে আর কিছু করলে পরিস্থিতি খুব খারাপ হবে।"

"আমি কিন্তু বলিনি উনার ছেলেকে সন্দেহ করছি। বলেছি তার ছেলে হয়তো এই খুনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানে।"

"সেটা ঠিক আছে...কিন্তু উনি পুলিশকে ঘুষ দিয়েছেন এ কথা বলতে গেলে কেন?"

কিছু বলল না জেফরি বেগ।

"যাইহোক, এই কেসের চিন্তা বাদ দাও। যা করার করেছে, এখন বাকিটা পুলিশ সামলাক।"

"কিন্তু-"

হাত তুলে কথার মাঝখানে তাকে বাধা দিয়ে বলল ফারুক আহমেদ। "ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি তোমাকে খুব স্নেহ করি বলে তোমার কথা মতো এই কেসটা আবার তদন্ত করতে দিয়েছি। কিন্তু তুমি ভুলে গেছো তোমাকে বলেছিলাম এটা হবে আনঅফিশিয়ালি...কোনো কিছু করার আগে আমাকে জানাতেও বলেছিলাম।"

চুপ করে থাকল জেফরি। হঠাৎ বিপ করে উঠল তার মোবাইল ফোনটা। আরেকটা এসএমএস! মোবাইলটা বের করে দেখল না। উঠে দাঁড়াল সে। "স্যার, আমি তাহলে আসি..."

"ঠিক আছে, যাও। এই ফালতু কেসটা নিয়ে খামোখা মাথা ঘামানোর দরকার নেই।"

মহাপরিচালকের রুম থেকে বের হয়ে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে দেখল জেফরি বেগ।

আই কানট ফরগেট ইউ

রেবার উপর তার কোনো রাগ নেই বরং এখন মেয়েটার জন্যে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। তার খুব ইচ্ছে করছে রেবাকে একটা মেসেজ করতে কিন্তু কী এক সংকোচে করতে পারছে না। আমিও তোমাকে ভুলতে পারছি না। এক মুহূর্তের জন্যেও না।

"হাই।"

একটা মিষ্টি কণ্ঠ বলে উঠলে মোবাইলের ডিসপ্লে থেকে চোখ তুলে তাকাল জেফরি। এডলিন।

সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা পকেটে রেখে দিল সে। "কেমন আছেন?"

"ভালো। ক্যান্টিনে যচ্ছিলেন?" এডলিন জানতে চাইল। আশেপাশে কেউ না থাকেল এই মেয়ে তাকে স্যার সম্বোধন করে না। এখনও তাই করছে।

"না।"

মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে, জেফরি কিছু বলছে না। মেয়েটাও কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না। অস্বস্তিকর একটি অবস্থা। অবশেষে এডলিন বলল, "আমি ক্যান্টিনে যাচ্ছি।"

জেফরি বুঝতে পারছে না কি বলবে। এডলিন তার চোখের দিকে তাকাল কিছু একটা শোনার আশায়। কিন্তু জেফরি কোনো কথা না বললে বিব্রত হয়ে চলে গেল এডলিন।

নিজের অফিসের দিকে পা বাড়াল জেফরি বেগ। অফিসের দরজার কাছে আসতেই মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। এবার আর কোনো মেসেজ নয়, ইনকামিং কলের রিং। অন্যমনস্কভাবেই ফোনটা বের করে কলটা রিসিভ করল সে।

"স্যার, ঐ লোকরে তো দ্যাকছি..." বেশ উত্তেজিত হয়ে একটা কণ্ঠ বলল তাকে।

"কোন্ লোক?" বুঝতে না পেরে বলল সে।

"ঐ যে আমার দোকানে আসতো...চা খাইতো?"

"আপনি কে বলছেন!?" এখনও চিনতে পারছে না জেফরি।

"আমি, স্যার...তালেবর মিয়া...ঐ যে আমার চা খাইয়া কইলেন খুব ভালা চা হইছে?"

...চা? চট করে মনে পড়ে গেল তার। "ও, হাঁ, মনে পড়েছে।"

"স্যার, আপনে বলছিলেন না ঐ লোকটারে দেখলে আপনারে খবর দিতে?"

"হ্যা!" জেফরি নড়ে চড়ে উঠল।

"তারে আমি দ্যাকছি, স্যার।"

"কি??"

অধ্যায় ৪৮

ভিটা নুভার সামনের রাস্তা। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া দুটো ছেলে-মেয়ে পাশাপাশি কথা বলতে বলতে হেঁটে যাচ্ছে।

আচমকা তাদের সামনে একটা প্রাইভেট কার ব্রেক কষলে ছেলে-মেয়ে দুটো ভড়কে গেলেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গাড়ি থেকে নেমে এল পঞ্চাশোর্ধ এক জাঁদরেল লোক।

হন হন করে এগিয়ে এসে খপ করে মেয়েটির হাত ধরে ফেললে ছেলেটা হাত তুলে তাকে বাধা দিতেই বয়স্ক লোকটি ঠাস্ করে ছেলেটার গালে চড় বসিয়ে দিল...

কাট!

একটা কণ্ঠ শোনা যেতেই কেঁপে উঠল পুরো দৃশ্যটা..তারপর বিশৃঙ্খলা ।

আলম শফিককে দেখা গেল হাতে একটা ক্লিপবোর্ড নিয়ে ছেলেমেয়ে দু'জন আর বয়স্ক লোকের কাছে এগিয়ে যেতে।

এখানেই দৃশ্যটা শেষ।

"চড় মারার ঠিক আগ মুহূর্তের দৃশ্যটায় যাও," পাশে বসে থাকা জামানকে বলল জেফরি বেগ।

তারা বসে আছে জেফরির অফিসে। প্রায় দশ মিনিট ধরে একটা ডিভিডি কম্পিউটারে ঢুকিয়ে ছোট্ট একটি দৃশ্য বার বার দেখছে।

একটু আগে মিসেস রেহমানের সাথে দেখা করে এই ডিভিডিটা নিয়ে এসেছে জামান।

ভিটা নুভার বিপরীত দিকে রাস্তার পাশে ফুটপাতে চায়ের দোকানি তালেবর মিয়া কিছুক্ষণ আগে ফোন করে যখন জানাল সে সম্ভাব্য খুনিকে দেখেছে কথাটা শুনে জেফরির মনে হয়েছিল খুনি বুঝি তার চায়ের দোকানেই এসেছিল। কিন্তু এটা তো অসম্ভব! পেশাদার একজন খুনি এ রকম বোকামি করবে না।

তবে তার এই ভাবনার স্থায়ীত্ব ছিল খুবই অল্প সময়ের জন্যে। এরপর তালেবর মিয়া যা বলল সেটা আরো বিস্ময়কর।

গতকাল রাতে এক টিভি চ্যানেলে সিদ্ধান্ত নামের একটি টেলিফিল্ম প্রচারিত হয়েছে। সেখানে একটি দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছিল ভিটা নুভার সামনে। সেই দৃশ্যে কয়েক সেকেন্ডের জন্য তালেবর মিয়ার চায়ের দোকান দেখা গেছে...আর সেই সাথে দেখা গেছে ওখানে বসে থাকা সম্ভাব্য সেই খুনিকে!

এক মনে চা খেতে খেতে পত্রিকা পড়ছে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের একটি দৃশ্য।

তালেবর মিয়ার কথার সূত্র ধরে জেফরি নিজে ঐ টিভি চ্যানেলে যোগাযোগ করে জানতে পেরেছে কাকতালীয়ভাবেই টেলিফিল্মটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বি.জে এন্টারটেইনমেন্ট, যার সত্ত্বাধিকারী প্রয়াত লেখক জায়েদ রেহমান এবং মিসেস রেহমান।

ঐ চ্যানেলে জেফরির কলেজ জীবনের এক বন্ধু বেশ উঁচুপদে চাকরি করে, জেফরি যখন তাকে সব খুলে বলল তখন সেই বন্ধুই তাকে জানাল টেলিফিল্মটিতে ঐ দৃশ্য মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য আছে, আর সেখানে লোকটার শুধুমাত্র এক পাশই দেখা গেছে, ভালো হয় নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে তাদের কাছ থেকে টেলিফিল্মের ফুটেজ সংগ্রহ করলে। রাশ ফুটেজে নিশ্চয় আরো ভালোভাবে দেখা যাবে লোকটাকে।

বন্ধুর কথা মতোই মিসেস রেহমানকে ফোন করে সেই টেলিফিল্মের ফুটেজ চায় জেফরি, তবে ভদ্রমহিলাকে পুরো ব্যাপারটি খুলে বলেনি সে।

মহিলা একটু অবাক হলেও তার অনুরোধ রক্ষা করেছে।

জামান ফুটেজের একটি জায়গা স্থির করে রাখলে জেফরি একটু কাছে এগিয়ে ভালো করে দেখল। "হ্যাঁ, ঠিক এই অ্যাঙ্গেল থেকেই পুরো চেহারাটা দেখা যাচ্ছে।"

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া দুটো ছেলেমেয়ে পাশাপাশি হাঁটছে। তাদের পেছনে ফুটপাতে একটা চায়ের দোকান ফ্রেমে ঢুকে পড়েছে। এটা তালেবর মিয়ার দোকান। সেখানে একজনই ক্রেতা পত্রিকা হাতে আপন মনে চা খাচ্ছে। ঠিক এই দৃশ্যটায় এসে যুবক মুখ তুলে ক্যামেরার দিকে তাকিয়েছিল।

দেবদূতের মতো চেহারার এক যুবক।

সম্ভাব্য খুনি!

এই সেই যুবক যে কি না ভিটা নুভার সামনে দিনের পর দিন তালেবর মিয়ার চায়ের দোকানে বসে পুরো অ্যাপার্টমেন্টটি পর্যবেক্ষণ করে গেছে। এই যুবকই মোবাইলফোনের টাওয়ারের মেইনটেনান্স ক্রু সেজে ঢুকেছিল, পরে ভোর বেলা জায়েদ রেহমানের খুন হবার পর ফজরের নামাজ পড়তে যাওয়ার ভান করে ভিটা নুভা থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

জেফরি নিশ্চিত এই সেই পেশাদার খুনি...লেখক জায়েদ রেহমানকে যে খুন করেছে।

বার বার চেহারাটা দেখে গেল সে। তার সহকারী জামান বাকরুদ্ধ হয়ে আছে। এভাবে এতো দ্রুত সম্ভাব্য খুনিকে নিজের চোখে দেখতে পাওয়াটা বিস্ময়করই বটে।

"ঠিক এই ফ্রেম থেকেই স্টিলছবি নেবে," জামানকে বলে গেল জেফরি বেগ। "জুম করে আরো কাছে আনা যাবে না?"

"যাবে," পর্দার দিকে চেয়েই বলল জামান।

"ডিপার্টমেন্টের কাউকে কিছু বোলো না।"

পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে জামান তার দিকে তাকাল।

"আপাতত ব্যাপারটা তোমার আর আমার মধ্যেই রাখবে।"

"ফারুক স্যারকে জানাবেন না?"

"এখন না।"

"ছবিটার কয়টি প্রিন্ট করবো, স্যার?"

একটু ভেবে বলল জেফরি, "দুটো।"

"এরপর কি করবেন?"

"আমাদের আবারো ভিটা নুভায় যেতে হবে।"

***

এক ঘণ্টা পর ভিডিও ফুটেজ থেকে দুটো ছবি প্রিন্ট করে জামানকে সঙ্গে নিয়ে ভিটা নুভায় চলে এসেছে ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ। নাইটগার্ড আসলাম আর দারোয়ান মহব্বত দাঁড়িয়ে আছে তাদের সামনে।

জেফরি প্রথমে মহব্বতকে ছবিটা দেখাল। "দ্যাখো তো, এই লোকটাকে চিনতে পারো কি না?"

ছবিটা হতে নিয়ে ভালো করে দেখে নিলো মহব্বত। "হ, স্যার। এইটা তো টাওয়ারের ঐ লোকটাই মনে হইতাছে!"

"গুড।" এরপর আসলামকে দেখালে ছবিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে। "হানিফ সাহেবের পেছন পেছন যে লোকটাকে তুমি বের হয়ে যেতে দেখেছো...এই লোকটা কি সেই লোক?"

মাথা নেড়ে সায় দিল সে। "হ।"

দারোয়ান দুজনকে বিদায় করে দিয়ে জেফরি আর জামান ভিটা নুভা থেকে বের হয়ে তালেবর মিয়ার চায়ের দোকানে চলে এল।

চা খেতে খেতে কথা বলতে শুরু করল জেফরি।

"শুটিং যেদিন হয় সেদিনের কথা কি তোমার মনে আছে, তালেবর?"

"হ, স্যার। বেশি দিন আগের ঘটনা তো না। এই বাড়ির সামনে শুটিং হইতাছিল। রাস্তাটা এক্কেবারে নিরিবিলি আছিল ঐ দিন। আমি দোকান থেইকা বইসা বইসা তামশা দেখতাছিলাম...এমন সময় ঐ লোকটা আইলো। সেও বইসা বইসা তামশা দেখতে থাকল। তারপর আস্থা উইঠা চায়ের বিল দিয়া চইলা গেল।"

চায়ে চুমুক দিয়ে বলল জেফরি, "লোকটা কোন দিক থেকে তোমার এখানে আসতো... চলে যেতো কোন্ দিকে?"

"উমমম..আসতো ঐদিক থেইকা," রাস্তার পশ্চিম দিকে নির্দেশ করে বলল। "আবার ঐদিকেই চইলা যাইতো, স্যার।"

মাথা নেড়ে সায় দিল জেফরি। "কখনও কি দিনে দু'তিনবার আসতো?"

"তা আসতো...মাজেমইদ্যে।"

"সব সময় কি একাই আসতো?"

"হ।"

"সিগারেট খেতো?"

"হ, খাইতো।"

"পরনের জামাকাপড় কি খুব ফিটফাট থাকতো?"

"সব সময়ই ফিটফাট থাকতো, স্যার।"

"কোন্ পত্রিকা পড়তো?"

"ইত্তেফাক।"

"গুড।" জেফরি চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালে তার সাথে সাথে জামানও উঠে দাঁড়াল। চায়ের বিল দেবার সময় বলল, "তুমি অনেক বুদ্ধিমান একটা লোক। অনেক উপকার করেছে।"

আনন্দে বিগলিত হয়ে উঠল তালেবর।

তালেবর মিয়াকে ধন্যবাদ দিয়ে চায়ের দামসহ কিছু বখশিস দিয়ে দিল সে। লোকটা অবশ্য প্রথমে টাকা নিতে না চাইলেও জেফরি জোর করলে আর না করল না।

"আজ আসি। পরে দেখা হবে।"

তালেবর মিয়ার ওখান থেকে সোজা পশ্চিম দিক ধরে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে জেফরি বেগ আর জামান।

"আমার ধারণা সে আশেপাশেই কোথাও থাকতো," বলল জেফরি।

"আমারও তাই মনে হচ্ছে, স্যার।"

"আশেপাশে লন্ড্রি আর সিগারেটের দোকান দেখলে তাদের কাছে ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে।"

জামান সামনের দিকে তাকাল। "এই জায়গাটা আমি চিনি, স্যার। সামনেই একটা সিগারেটের দোকান আছে। আর বা দিকে মোড় নিলেই একটা লন্ড্রির দোকান।"

সিগারেটের দোকানিকে ছবিটা দেখালে চিনতে পারল না।

"সিগারেট বোধহয় তালেবরের কাছ থেকেই কিনতো," জেফরি বলল।

আরো সামনে এগিয়ে বায়ে মোড় নিতেই হাতের ডানে একটা লন্ড্রির দোকান দেখা গেল।

একটা ছবি নিয়ে জামানই এগিয়ে গেল কথা বলার জন্য, জেফরি আর দোকানের ভেতর ঢুকলো না।

বয়স্ক এক লোক বসে আছে দোকানে। জামান তার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার পর ছবিটা দেখালে লোকটা মাথা নেড়ে সায় দিল। দোকানের বাইরে থেকে জেফরি দৃশ্যটা দেখে এগিয়ে গেল সেদিকে।

"স্যার, ইনি বলছেন এই লোককে চেনেন," জেফরিকে দোকানের ভেতর ঢুকতে দেখে জামান বলল। "তবে কোন্ বাড়িতে থাকেন জানেন না। খুব সম্ভবত আশেপাশেই থাকেন।"

আশেপাশের অনেকগুলো বাড়ির দারোয়ানকে ছবিটা দেখাল তারা, কেউ চিনতে পারল না।

এভাবে খুঁজে যে পাওয়া যাবে না সেটা জেফরিও জানে। ডিপার্টমেন্টের সাহায্য ছাড়া এ রকম একজন লোককে ট্র্যাকডাউন করা প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। কিন্তু এ মুহূর্তে ডিপার্টমেন্টকে এ ব্যাপারে কিছু জানাতে চাচ্ছে না সে।

চট করেই একটা নাম তার মাথায় এসে পড়ল।

সিদ্ধান্ত নিলো হোমিসাইডের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদকে সব খুলে বলার আগে আরেকজনের সাথে এ নিয়ে কথা বলবে।

অধ্যায় ৪৯

ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক দিলান মামুদ সারাটা দিন ডক্টর জেডের সাথে ছিল। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সংক্রান্ত এক সমস্যা নিয়ে ডক্টর খুব ব্যস্ত আছেন। এই রহস্যময় পণ্ডিতব্যক্তির সাথে যখনই থাকে মোবাইল ফোন বন্ধ করে রাখে সে। আজও তাই করেছে।

অবশেষে অনেক রাতে বাড়ি ফিরে এলে বন্ধ থাকা মোবাইলফোনটা চালু করতেই দেখতে পেল একটা মেসেজ জমে আছে ইনবক্সে।

জেফরি বেগ!

মেসেজটা ওপেন করল সে।

ইংরেজিতে লিখেছে। বাংলা করলে অর্থ দাঁড়ায় :

কল করে পাইনি। মেইল চেক করে দেখুন। জরুরি।

দিলানের ইচ্ছে হলো কলব্যাক করার কিন্তু মেইলে কি আছে সেটা জানতে কৌতূহলী হয়ে উঠল সে।

মেইলটা খুব সংক্ষিপ্ত। সাথে একটা ইমেজ অ্যাটাচ করা আছে।

এই ছবির লোকটিকে যদি চিনে থাকেন আমাকে জানান। খুব জরুরি।

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটাচ করা ছবিটা ওপেন করে দেখল সে। তার চোখের কোনো পলক পড়ল না। মাইগড!

কম্পিউটারের ঘড়ির দিকে তাকাল। ১২:০৫

এতো রাতে কি ফোন করা ঠিক হবে? ভাবলো দিলান মামুদ। তবে এটাও তো ঠিক ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ তার মতোই অবিবাহিত। অবশেষে ফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল করল সে।

***

জেফরি বেগের চোখে ঘুম নেই। এক সপ্তাহ ধরেই তার ঘুম ভালো হচ্ছে না। চোখের নিচটা কালচে হতে শুরু করেছে। রেবার বিয়ে হবার খবরটা শোনার পর থেকেই ঘুমে ব্যাঘাত হচ্ছে। একা থাকে, নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুতে গেলেই নানান কথা মনে পড়ে। পুরনো সেসব স্মৃতি আরো দীর্ঘ করে তোলে নিঃসঙ্গ রাতটাকে।

তবে আজকে রেবার জন্য নয়, জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডটি নিয়ে ভেবে যাচ্ছে সে। বিরাট অগ্রগতি হয়েছে আজ। সম্ভাব্য খুনির ছবি এখন তার হাতে। জেফরি নিশ্চিত এই খুনি পেশাদার কেউ।

একজন পেশাদার খুনি দীর্ঘদিন ধরে লেখকের অ্যাপার্টমেন্ট পর্যবেক্ষণ করে গেছে... তারপর প্রথমে আইপিএস সার্ভিসম্যান সেজে জায়েদ রেহমানের ঘরে ঢুকে দেখে এসেছে... অবশেষে ভিটা নুভার ছয় তলার উপর মোবাইলফোন কোম্পানির টাওয়ারের মেইনটেনান্স ক্রু সেজে দারোয়ান বদলি হবার ঠিক আগে সেখানে ঢুকে পড়েছে। খুব সম্ভবত টাওয়ারের উপরেই লুকিয়ে ছিল সে...তারপর রাত গম্ভীর হলে সেখান থেকে নেমে জায়েদ রেহমানের ঘরে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু কিভাবে?

এটা এখনও জেফরি জানে না। তবে খুনি খুন করার পর আবার নিজের জায়গায় ফিরে যায়। অপেক্ষা করতে থাকে মোক্ষম সময়ের জন্যে...আর সেই মোক্ষম সময়টি হলো ভোরবেলা...ফজরের আজানের পর পর!

তাকে চমকে দিয়ে মোবাইল ফোনটা বাজতে শুরু করল এ সময়। ফোনটা তুলে নিলো সে।

দিলান মামুদ!

আজ সারা দিনে অনেকবার চেষ্টা করেও তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি। তার মোবাইলফোন বন্ধ ছিল। শেষে খুনির ছবিটা তাকে মেইল করে দিয়েছে।

"হ্যালো?" জেফরি বলল।

"ছবিটা কোত্থেকে পেলেন?" সময় নষ্ট না করে সরাসরি জানতে চাইল দিলান মামুদ। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

"লম্বা কাহিনী...আপনি তাকে চেনেন??"

"হ্যাঁ।"

বিছানা থেকে উঠে বসল জেফরি। "কে সে!?"

"আগে আমাকে বলেন আপনি তাকে খুঁজছেন কেন?"

"জায়েদ রেহমানের কেসে-"

"জায়েদ রেহমানের খুন...?" তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল দিলান।

"হ্যাঁ।"

"মিসেস রেহমান আর তার ঐ প্রেমিক না খুনটা করেছে!?"

"এর মাঝখানে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে...পরে আপনাকে সব বলবো। এখন বলুন এই লোকটা কে?"

"ভয়ঙ্কর এক খুনি। একেবারে প্রফেশনাল। খুবই বিপজ্জনক লোক..."

"আমিও তাই ধারণা করেছিলাম। লোকটার নাম কি? কোথায় থাকে?"

"বাস্টার্ড!" আস্তে করে বলল দিলান মামুদ।

"কী!?

"ওর নাম। এটা যে আসল নাম না সেটা জানি, কিন্তু অল্প যে কয়েক জন মানুষ তাকে চেনে এ নামেই চেনে।"

"থাকে কোথায়?" আবারো জানতে চাইল জেফরি ।

"সেটা আমি জানি না...তবে তার ব্যাপারে খুব সাবধানে এগোবেন। খুবই বিপজ্জনক লোক।"

"পেশাদার খুনি, বিপজ্জনক তো হবেই," বলল জেফরি।

"আমি আপনাকে নিয়ে আশঙ্কা করছি। সে আপনার পেছনে লাগতে পারে।"

"আমার পেছনে!?"

"হ্যাঁ সে যদি জানতে পারে আপনি তাকে খুঁজছেন তাহলে আপনার জন্য সেটা ভালো হবে না।"

"এটা সে কি করে জানবে?"

"সে জানবে। যেভাবেই হোক জেনে যাবে এটা।" একটু থেমে আবার বলল, "আপনি খুব সাবধানে থাকবেন।"

দিলান মামুদের সাথে ফোনে কথা বলার পর জেফরি একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। এভাবে আনঅফিশিয়ালি তদন্ত করাটা খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়।

অধ্যায় ৫০

হোমিসাইডের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ চুপ মেরে আছে। মনোযোগ দিয়ে জেফরির কথা শুনে গেলেও কোনো মন্তব্য করেনি এখন পর্যন্ত।

“স্যার, আমাদের হাতে এখন অনেকগুলো প্রমাণ আছে। এমন কি খুনির ছবি পর্যন্ত! এই লোকটিই জায়েদ রেহমানকে খুন করেছে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।”

ফারুক সাহেবের সামনে টেবিলের উপর পেশাদার সেই খুনির ছবি রাখা আছে।

“তাহলে মিসেস রেহমান আর আলম শফিক? তারা কি কোনোভাবেই এর সাথে জড়িত নয়?” বলল মহাপরিচালক।

“না।” বেশ দৃঢ়তার সাথে বলল জেফরি।

“ধরে নিলাম পেশাদার খুনিই কাজটা করেছে কিন্তু তাকে ভাড়া করেছে কে? মিসেস রেহমান আর তার প্রেমিক কি তাকে ভাড়া করতে পারে না?”

মাথা দোলাল বেগ। “স্যার, এই খুনি, টেবিলের উপর ছবিটায় টোকা মেরে বলল সে, “দীর্ঘদিন ধরে ভিটা নুভার সামনে বসে পর্যবেক্ষণ করেছে। মিসেস রেহমান আর আলম শফিক তাকে ভাড়া করলে তাকে এভাবে রেকি করতে হতো না, কারণ সব তথ্য সে তাদের কাছ থেকেই পেতো।”

মাথা নেড়ে সায় দিল ফারুক সাহেব। “তাহলে তাকে ভাড়া করেছে কে?”

খুবই সঙ্গত প্রশ্ন, মনে মনে ভাবলো জেফরি। “সেটা খুঁজে বের করতে হলে তদন্তটি আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।” একটু থেমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল সে। “এই খুনিকে যদি ধরা যায় কিংবা আমাদের কাছে থাকা সন্দেহভাজনদের কারোর সাথে যদি এর কোনো রকম কানেকশান বের করা যায় তাহলে খুব সহজেই সেই প্রশ্নের জবাব জানা যাবে।”

চুপ মেরে রইল ফারুক সাহেব তবে তার চোখমুখ দেখে জেফরি ইতিবাচক কিছু আশা করছে। “এভাবে আনঅফিশিয়ালি তদন্ত চালিয়ে গেলে খুনিকে ধরা যাবে না। এ রকম একটা ছবি হাতে থাকার পরও যদি আমরা ব্যাপকভাবে ম্যানহান্ট শুরু করতে না পারি তাহলে কিছুই করতে পারবো না।”

“তাহলে তুমি চাচ্ছো এই খুনিকে খুঁজে বের করতে?” ধীরকণ্ঠে বলল ফারুক আহমেদ।

“জি স্যার। এই খুনিকে খুঁজে বের করতে পারলেই আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো।”

“কিভাবে কাজটা করতে চাও?”

“স্যার, সমস্ত থানায় এর ছবি দিয়ে এর সম্পর্কে খোঁজ নেবার জন্যে একটি টিম গঠন করে ব্যাপক অভিযান চালাতে হবে। আমার ধারণা খুব সহজেই তাকে ধরা সম্ভব হবে।”

চুপ করে রইল ফারুক সাহেব। অনেকক্ষণ পর বলল, “ঠিক আছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়কে এটা জানাতে হবে। জায়েদ রেহমানের হত্যা মামলাটি তারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মামলার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছে। এরইমধ্যে ফাইনাল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট তৈরি হবার পথে। তাদেরকে না জানিয়ে তো এই কেসটা পুণঃতদন্ত করতে পারবো না।”

কথাটা শুনে জেফরি খুশি হলো। তার বসূকে তাহলে বোঝানো গেছে।

“ধন্যবাদ, স্যার।”

এমন সময় তার ফোনটা বিপ্ করে উঠলে জেফরি বুঝতে পারল রেবা আরেকটা মেসেজ পাঠিয়েছে।

ফারুক সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল নিজের অফিসে। ওপেন করল

মেসেজটা।

তোমার সাথে দেখা করতে চাই।

অসম্ভব! রেবার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে? মোবাইলটা পকেটে রেখে দিল সে। এ রকম একেকটা এসএমএস তাকে অস্থির করে তোলে ভেতরে ভেতরে। মাথা থেকে রেবার চিন্তাটা কিছুক্ষনের জন্য ঝেড়ে ফেলতে জায়েদ রেহমানের কেসটা নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিল সে। নিজের ডেস্কে বসে সহকারী জামানকে ফোন করে তার রুমে চলে আসতে বলল। একা একা থাকলেই রেবার চিন্তা মাথায় এসে পড়ে, সামনে একজন থাকলে চিন্তাটা সহজে আসবে না।

দশ মিনিট পর জামান আর জেফরি ডুবে গেল জায়েদ সাহেবের কেসটা নিয়ে। জামানকে জেফরি জানাল ফারুক সাহেব তদন্ত পুণরায় করার ব্যাপারে রাজি হয়েছে। এখন পুর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করতে হবে। খুনিকে ধরার অভিযান চলতে থাকবে পাশাপশি কে হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা সেটা খুঁজে বের করার জন্য তাদেরকে কাজ করে যেতে হবে।

"আমরা কি সন্দেহভাজন হিসেবে গ্যাট আর আবেদ আলীকে নিয়েই কাজ করবো?" জানতে চাইল জামান।

"গ্যাট, আবেদ, আলী আর অভিনেত্রী পমি। আমরা এখন এই তিনজনের উপর কাজ করবো। আমার ধারণা এদের মধ্যেই কেউ খুনের মূল হোতা। এ পর্যন্ত আমরা গ্যাট আর আবেদ আলীর ব্যাপারে কিছু জানতে পারলেও পমির ব্যাপারে কিছু জানি না।"

"আমি কি তার ব্যাপারে খোঁজখবর নেবো, স্যার?"

"না। আমি নিজে তার সাথে একবার দেখা করতে চাই।"

অধ্যায় ৫১

আধো-আলো-অন্ধকার একটি ঘর। মৃদু ভলিউমে চলছে টিভি। ঘরের একমাত্র লোকটি লাগেজ গোছগাছ করছে। নেবার মতো খুব বেশি কিছু নেই। প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় আর কিছু আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র। লোকটা এর আগে কখনই এতোটা ঝামেলায় পড়েনি। হুট করে তাকে জায়গা বদল করতে হচ্ছে। দরকার পড়লে দেশও ছাড়তে হতে পারে। এই প্রথম তার ছবি কোনো গোয়েন্দার হাতে চলে গেছে। ব্যাপারটা তার জন্যে ভয়ানক খারাপ খবর। জেফরি বেগ নামের গোয়েন্দা লোকটি কিভাবে তার ছবি জোগাড় করতে পারল এখনও সেটা ভেবে পাচ্ছে না।

এটা কি করে সম্ভব হলো?

এই জীবনে কখনই এতোটা অস্থির হয়নি সে। তার কাছে খবর আছে সেই গোয়েন্দা আরেকজনকে সাথে নিয়ে তার ছবি দেখিয়ে লোকজনকে জিজ্ঞেস করেছে তাকে কেউ চেনে কি না। আরো জানতে পেরেছে, জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের পুণঃতদন্ত হবে।

এই জেফরি বেগ লোকটা তার জন্যে চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। মনে মনে তার প্রশংসা না করে পারল না। পুরো পরিকল্পনা নতুন করে সাজিয়ে নিতে হবে এখন। তবে সবার আগে এই জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

***

অভিনেত্রী পমি প্রথমে কোনোভাবেই রাজি ছিল না দেখা করার জন্য। জেফরি তাকে অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করিয়েছে। হোমিসাইডের সাথে সহযোগীতা না করলে জায়েদ রেহমানের খুনের ব্যাপারে তাকেও সন্দেহ করা হতে পারে এ রকম একটি প্রচ্ছন্ন আভাস দিলে এই তরুণী নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে।

এবারও সঙ্গে করে জামানকে নিয়ে আসেনি। গ্যাটের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তার সাথে জায়েদ রেহমান যা করেছে সেটা দু'জন পুরুষের সামনে বলতে অস্বস্তি বোধ করবে পমি। এখান থেকে পমিকে বিদায় দিয়ে সে চলে যাবে ভিটা নুভায়, জামানকে বলে দিয়েছে সে যেন ওখানে চলে যায়।

নিজের বাড়িতে দেখা না করে একটা রেস্তোরাঁয় বসেছে পমি। এই অভিজাত রেস্তোরাঁয় যে সে খুব নিয়মিত আসে সেটা বুঝতে পারল জেফরি বেগ। তার মতো একজন উঠতি অভিনেত্রী এ শহরের যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারে না। ব্যাপারটা জেফরিও বোঝে। নিজের বাড়িতে জেফরিকে আসতে না বলার একটাই কারণ, তার মধ্যবয়সি ধনাঢ্য স্বামী। ভদ্রলোককে গত বছর বিয়ে করেছে সে। বয়সে তারচেয়ে বিশ বছরের বড়। জেফরির সাথে তার কথাবার্তা স্বামীর কাছে যেন প্রকাশ না পায় সেজন্যেই পমি এই জায়গাটা বেছে নিয়েছে।

"বলুন, আমার কাছ থেকে কী জানতে চান?" পমির কণ্ঠে অধৈর্য।

"জায়েদ রেহমানকে কতো দিন ধরে চেনেন?" বলল জেফরি।

"উমমম...তিন-চার বছর হবে।"

"আপনি তো উনার সাথে কাজ করেছেন, তাই না?"

"হ্যাঁ। এটা সবাই জানে, মি. বেগ। আপনি নিশ্চয় এসব কথা জানার জন্য আসেননি। আসল কথায় আসুন। আমাকে বাড়ি যেতে হবে।"

ঠিক আছে, মনে মনে বলল জেফরি। "আপনি জায়েদ রেহমারে একটি ছবিতে কাজ করেছিলেন কিন্তু সেটা শেষ করেননি, কেন?"

দেখতে দারুণ সুন্দরি পমি চেয়ে রইল ইনভেস্টিগেটরের দিকে। "কাজ করতে সমস্যা

হচ্ছিল। ছবি সাইন করার সময় উনি আমার চরিত্রটা যেরকম বলেছিলেন পরে দেখি সেটা তেমন না, তাই কাজটা আর করিনি।”

জেফরির ঠোঁটে মুচকি হাসি। “উনার এতোগুলো টিভি নাটকে কাজ করেছেন অথচ এ রকম সামান্য একটি কারণে মাঝপথে এসে ছবিটা ছেড়ে দিলেন?”

“আমি মনে করেছি কাজটা করা ঠিক হবে না তাই ছেড়ে দিয়েছি, এতে সমস্যার কি আছে!?”

“তাহলে এরপর তার সাথে আপনি আর সম্পর্ক রাখলেন না কেন?”

“রাখিনি কারণ...কারণ, উনি আমার সাথে বাজে ব্যবহার করেছিলেন।”

মাথা নেড়ে সায় দিল জেফরি। “আচ্ছা। এবার আমাকে বলুন, মানুষ হিসেবে জায়েদ রেহমান কেমন ছিলেন?”

অবাক হলো পমি। “এটা জানা কি আপনার তদন্তের জন্যে খুবই দরকার?”

“হ্যাঁ।”

একটু ভেবে বলল পমি, “ইবলিশ! আস্ত একটা ইবলিশ তবে সাধুপুরুষের মুখোশ পরে থাকতো সব সময়। আসল জায়েদ রেহমানকে খুব কম মানুষই চেনে।”

“সেই অল্প মানুষের মধ্যে আপনিও আছেন,” চট করে বলল জেফরি।

পমি কিছু বলল না, একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।

“মিসেস জায়েদ, মানে গোলনূর আফরোজ তরফদারের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?”

এই প্রশ্নটি শুনে আবারো অবাক হলো পমি। “খুবই ভালো। উনাকে আমি বড়বোনের মতো দেখতাম। আমাকে তুই করে সম্বোধন করতেন। তবে এখন আর যোগাযোগ নেই।”

কথাটা কিভাবে বলবে ভেবে পেল না সে। একটু ইতস্তত করে বলল, “জায়েদ রেহমান যে ধর্ষণ করেছিলেন সে ব্যাপারে জানতে চাইছি।”

একটু চমকে উঠল পমি। পরক্ষণেই মুখটা তিক্ততায় ভরে উঠল। “আপা তাহলে আপনাকে বলে দিয়েছে...”

“হ্যাঁ। না বলার তো কোনো কারণ নেই।”

“জানার আর কী আছে। এসব জঘন্য ঘটনার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। একজন বিকৃত মানসিকতার লোক ছিল সে। আই হেইট হিম।”

জেফরি বুঝতে পারছে জায়েদ রেহমানকে এতোটা ঘৃণা করার সঙ্গত কারণ রয়েছে মেয়েটির। তার নিজেরও এসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। কোনো মেয়েকে তার ধষর্ণের কথা জিজ্ঞেস করা মানে তাকে পুণরায় ধর্ষণ করার শামিল।

“আপনি জায়েদ রেহমানের বিরুদ্ধে মামলা করলেন না কেন?”

“আমি মামলা করবো??” চোখেমুখে সুতীব্র বিস্ময় পমির। “আমি কেন তার বিরুদ্ধে মামলা করতে যাবো!?”

“কারণ উনি আপনাকে ধর্ষণ করেছেন...”

“হোয়াট!?” সীমাহীন বিস্ময়ে ফেটে পড়ল অভিনেত্রী পমি। “আপনি এসব কী বলছেন!?”

***

জেফরি আসার অনেক আগেই জামান চলে এসেছে ভিটা নুভায় তবে সেখানে

ঢুকে এর আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। ইচ্ছে করেই একটু আগেভাগে এসেছে খুনির ছবিটা নিয়ে লোকজনকে জিজ্ঞেস করবে বলে। ঢাকা শহরের এই অংশটা সহকারী ইনভেস্টিগেটর জামানের খুব চেনা। ছাত্র জীবনে এখানেই তারা পাঁচ বন্ধু একটা বাড়ি ভাড়া

নিয়ে থাকতো। তার ধারণা লন্ড্রির দোকানদারের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে এখানকার কেউ না কেউ খুনির ছবি দেখে তাকে শনাক্ত করতে পারবেই।

ভিটা নুভা থেকে একটু দূরে আরো কিছু বাড়ির দারোয়ান, মুদি দোকানিকে খুনির ছবিটা দেখিয়ে জানতে চাইল লোকটাকে তারা কখনও দেখেছে কি না। কেউ দেখেনি।

হাঁটতে হাঁটতে একটা ফাঁকা রাস্তা য়এসে পড়ল সে। হাতঘড়িতে সময় দেখে বুঝতে পারল ভিটা নুভায় ফিরে যেতে হবে। অনেক দূল এসে পড়েছে, হাঁটতে আর ভালো লাগছে না। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে একটা রিক্সার জন্য।

"স্যার?"

একটা ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠ শুনে ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেল তার পেছনে এক ভিক্ষুক।

"এই গরীবৃরে দুইডা পয়সা দেন...স্যার।"

লোকটার এক পা নেই। বসে আছে জামানের পেছনে ফুটপাত ঘেষা একটি বড় গাছের নিচে পুরনো নষ্ট হয়ে যাওয়া ফোমের টুকরোর উপর। দেখে বোঝা যাচ্ছে এখানেই লোকটা প্রতিদিন বসে।

পকেট থেকে দু'টাকার একটি কয়েন বের করে ভিক্ষুকটার হাতে তুলে দিল সে। খুশিতে হলুদ রঙের দাঁত বের করে হাসল লোকটা।

জামান আবার রাস্তার দিকে তাকাল। না। কোনো রিক্সা দেখা যাচ্ছে না।

"স্যার কি রিস্কা খুঁজতাছেন?" পেছন থেকে ভিক্ষুক বলল।

"হুমম..."

"এই সময় এইহানে রিস্কা পাইবেন না...সামনে বায়ে গিয়া একটু আগে বাড়লে পাইবেন।"

আরেকটু হেঁটে সামনে যাবো? এমন সময় চট করেই তার মাথায় একটা ভাবনা চলে এল। এই ভিক্ষুকটি কি প্রতিদিন এখানেই বসে?

"তুমি কি রোজ রোজ এখানে বসেই ভিক্ষা করো?" জানতে চাইল জামান।

"হ, স্যার।"

"কতো দিন ধরে এখানে ভিক্ষা করছো?"

"দুই মাস তো অইবোই..."

একটু ভেবে পকেট থেকে খুনির একটি ছবি বের করে হাতে নিয়ে নিলো সে। "তাহলে তো তুমি এখানকার অনেককেই চেনো।"

ময়লা দাঁত বের করে হাসল আবার। "সবাইরে না, স্যার...যারা রেগুলার ভিক্ষা দেয় খালি তাগোরে চিনি।"

জামান মুচকি হাসল। লোকটার কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সে। "এই ছবিটা একটু দ্যাখো তো," খুনির ছবিটা ভিক্ষুকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল সে।

ভুরু কুঁচকে ছবির দিকে তাকাল ভিক্ষুক।

"আমার এক পুরনো বন্ধু...শুনেছি এখানেই থাকে কিন্তু তার ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলেছি, তাই বাসাটা খুঁজে পাচ্ছি না।"

লোকটার ময়লা দাঁত দেখা গেল আবার। "হেরে তো আমি চিনি,.."

জামানের গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেল। "তাই না কি!"

"হ। দ্যাখা অইলেই আমারে পাঁচ টাকা দেয়।"

"কোথায় থাকে সে?"

রাস্তার পুব দিকে দেখিয়ে বলল ভিক্ষুক, "ঐ যে লাল বাড়িটা আছে ...ঐ বাড়িতে।"

কিছুক্ষণ আগে এই বাড়িটা অতিক্রম করে এসেছে জামান। গেটে কোনো দারোয়ান

দেখতে পায়নি তখন।

"আজকে তাকে দেখেছো?" জামান উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"আধা ঘণ্টা আগেই তো বাড়ির ভিতর ঢুকতে দ্যাখলাম...এহনও মনে হয় বাড়িতেই আছে।"

অধ্যায় ৫২

অভিনেত্রী পমির কাছ থেকে যা জানতে পেরেছে সেটা একেবারেই লোমহর্ষক একটি ব্যাপার। ভয়ঙ্কর এই তথ্যটা তার চোখের সামনে সমস্ত রহস্য উন্মোচন করে দিয়েছে।

রেস্তোরাঁ থেকে বের হয়ে পমিকে বিদায় দিয়ে ফুটপাত ধরে হাঁটছে আর ভাবছে ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ। জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের গোলকধাঁধা থেকে বের হবার পথটা খুঁজে পেয়েছে সে। পুরো এপিসোডটা

এখন তার কাছে পরিস্কার।

এমন সময় তার মোবাইল ফোনটার রিং বেজে উঠল।

তার সহকারী জামান।

"হ্যাঁ, জামান...ফোন করে ভালো করেছে। একটা দারুণ খবর আছে?"

"স্যার! আমি এখন খুনির বাড়ির সামনে। সে বাড়ির ভেতরেই আছে! আপনি এক্ষুণি চলে আসুন!" এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলল জামান।

"কি!?" জেফরি টের পেল তার শরীরের সমস্ত পশম দাঁড়িয়ে গেছে।

"ধানমণ্ডিতে...ভিটা নুভার কাছেই...এক্ষুণি চলে আসুন, স্যার!"

***

ভিটা নুভা থেকে এক ব্লক দূরে ধানমণ্ডির এক নিরিবিলি রাস্তার পাশে লাল রঙের ডুপ্লেক্স বাড়িটি অবস্থিত। প্রথম দিকে এখানে যেসব বাড়িঘর তৈরি করা হয়েছিল এই বাড়িটা সেরকমই একটি বাড়ি। দশ কাঠার বাড়িটার সামনে বিশাল একটি লন, তারপরই পুরনো দোতলা ভবনটি অবস্থিত।

দশ-পনেরো বছর আগেও এই এলাকায় এ রকম বাড়ি ছিল শত শত। তবে ডেভেলপারদের আধিপত্যে এখন অবস্থা একেবারে পাল্টে গেছে। বিরল হয়ে উঠেছে সামনে বিশাল লনবিশিষ্ট এ রকম দোতলার বাড়িগুলো।

লালমাটিয়ার একটি রেস্তোরাঁয় বসেছিল পমির সাথে কথা বলার জন্য, সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে ধানমণ্ডির দিকেই যাচ্ছিল, ফলে এখানে আসতে বড়জোর দশ মিনিট লেগেছে তার। অবশ্য রিক্সা করে আসার সময় ফোনে পুরো ব্যাপারটা শুনে নিয়েছে জামানের কাছ থেকে।

তার সহকারী জামান লাল বাড়িটার মেইন গেটের সামনে প্রবল উত্তেজনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জেফরিকে আসতে দেখেই তার কাছে ছুটে গেল।

"স্যার...এই বাড়িটাতেই আছে!" লাল রঙের বাড়িটা দেখিয়ে বলল জামান।

বাড়িটার দিকে তাকাল জেফরি। মেইনগেটটা বেশ পুরনো, মলিন, রঙ উঠে গেছে। "কোনো দারোয়ান নেই?"

"না, স্যার। আশেপাশে জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছি এই বাড়িতে অনেক দিন থেকে কেউ থাকে না। ডেভেলপারকে না কি দিয়ে দেয়া হয়েছে। কয়েক দিন পরই ভেঙে ফেলা হবে।"

একটু ভেবে জেফরি বলল, "চলো।"

জামান একটু অবাক হলো। "আমরা দুজনেই যাবো?"

"হুঁ্যা। চিন্তার কিছু নেই, আমার সাথে গান আছে।"

"আমার সাথেও আছে, স্যার," বলল জামান।

"গুড। তাহলে সময় নষ্ট না করে চলো...ও যদি টের পেয়ে যায় অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে। একবার ফসূকে গেলে ওকে আর ধরা সম্ভব হবে না।"

জামানও বুঝতে পারছে সেটা। আর কোনো কথা না বলে তারা লাল বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল নিঃশব্দে।

মেইনগেটটা ভেতর থেকে বন্ধ। কোনো কলিংবেল নেই। জেফরি ইশারা করলে জামান গেটটার উপর উঠে টপকে গিয়ে খুলে ফেলল সেটা। বাড়ির ভেতর ঢুকেই নিজেদের অস্ত্র হাতে তুলে নিলো দুজনে।

বিশাল লনটা ফাঁকা। আগাছা জন্মে আছে। উপর তলা থেকে ভেসে আসছে টিভি চলার মৃদু শব্দ। জেফরি পা টিপে টিপে লনটা পেরিয়ে দোতলা বাড়ির সদর দরজার কাছে চলে এল, তার পেছনে জামান।

জেফরি বেগ কাঠের দরজাটা আস্তে করে ধাক্কা দিতেই খুলে গেল সেটা। ভেতর থেকে আঁটকানো ছিল না। একটু অবাকই হলো সে। ভেতরে ঢুকে পড়ল তারা দু'জন। ভেতরে সব জানালা বন্ধ, দিনের বেলা হলেও আলো খুব কম। বিশাল ড্রইংরুমটা দেখে মনে হয় না কেউ ব্যবহার করে। পরিত্যাক্ত।

টিভির শব্দটা আসছে উপর তলা থেকে, জামানকে ব্যাকআপ দেবার ইশারা করে জেফরি বেগ ড্রইংরুমের শেষমাথায় থাকা সিঁড়িটা দিয়ে উপরে উঠে গেল নিঃশব্দে।

দোতলার ল্যান্ডিংয়ে উঠে টিভির শব্দটা কোত্থেকে আসছে বোঝার চেষ্টা করল বেগ। বাম দিকের দুটো ঘর, সেগুলোর দরজায় বড় একটা তালা দেখা যাচ্ছে। তবে ডান দিকের একটা ঘরের খোলা দরজা দিয়ে মৃদু আলো দেখতে পেল সে।

দরজা খোলা!

টিভির আওয়াজ সেই ঘর থেকেই আসছে। জেফরি বেগ টের পেল তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে। দিলান মামুদ তাকে বলে দিয়েছে লোকটা ভয়ঙ্কর...খুবই বিপজ্জনক। জেফরিও জানে পেশাদার এক খুনিকে মোকাবেলা করতে যাচ্ছে তারা।

পিস্তলটার লক খুলে দু'হাতে ধরে আস্তে আস্তে পা টিপে এগোতে লাগল জেফরি। জামান সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ব্যাকআপ হিসেবে।

দরজার কাছে এসে দেয়ালের সাথে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল সে। খুব দ্রুত করতে হবে কাজটা। ঘরের ভেতর থেকে টিভির শব্দটা এখন আরো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। এক ঝটকায় ঢুকে পড়ল দরজা দিয়ে। হাতের পিস্তলটা সামনের দিকে তাক করা।

ফাঁকা।

ঘরে কেউ নেই। অসম্ভব!

শুধু একটা টিভি চলছে। অ্যানিমেল প্লানেট।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে জেফরির কাছে মনে হলো সে একটা ফাঁদে পড়ে গেছে। কথাটা ভাবতেই তার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেল।

"স্যার?"

জামানের কণ্ঠটা শোনা গেল সিঁড়ির ল্যান্ডিং থেকে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জামানের দিকে তাকিয়ে দু'পাশে মাথা নাড়তেই হঠাৎ করে একটা গন্ধ নাকে টের পেল জেফরি, ব্যাপারটা ধরতে দু'তিন সেকেন্ডের বেশি লাগল না। হাত তুলে জামানকে ল্যান্ডিংয়ে থাকার ইশারা করে করিডোরের শেষ মাথায় রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল সে।

রান্নাঘরটাও ফাঁকা। এখানে গন্ধটা আরো প্রকট। বন্ধ জানালার সামনে গ্যাসের চুলা, সেদিকে তাকাতেই জেফরির হৃদস্পন্দনটা থেমে গেল।

"জামান!" চিৎকার দিয়ে রান্নাঘর থেকে ল্যান্ডিংয়ের দিকে দৌড়ে গেল সে। "জলদি! নিচে নামো!"

জেফরির এমন আচরণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও বিপদের গন্ধ আঁচ করতে পেরে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নামতে লাগল জামান।

জেফরি সিঁড়ির ল্যান্ডিং থেকে চার ধাপ নিচে পা রাখতেই ঘটনাটা ঘটলো।

***

লাগেজ গুছিয়ে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল সেরে নেয়। তারপর নিজের প্রিয় কালো রঙের প্যান্ট আর ব্লেজার পরে লাগেজটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হবার সময়ই সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের জানালা দিয়ে দেখতে পায় বাড়ির মেইনগেটের সামনে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

জেফরি বেগ!

এতো দ্রুত তার বাড়ির সন্ধান পেয়ে যাবে ভাবতেই পারেনি। আবারো অবাক হয় সে। এ রকম পরিস্থিতিতেও তার মাথাটা দারুণভাবে কাজ করল। ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল করলে তার মধ্যে স্থিরতা চলে আসে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে নিজের ঘরে ফিরে যায় দ্রুত। টিভিটা ছেড়ে দিয়ে ঘরের দরজা খোলা রেখেই পাশের রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেয়াশলাই বের করে প্রচণ্ড দ্রুততায় একটি ভয়ঙ্কর ডিভাইস তৈরি করে ফেলে অল্প সময়ের মধ্যেই।

একটা সিগারেট ধরিয়ে দু'একটা টান দিয়ে দেয়াশলাই থেকে সবগুলো কাঠি বের করে মেলে রাখে গ্যাসের চুলার পাশে, তারপর সিগারেটটা এমনভাবে দেয়াশলাইয়ের কাঠিগুলোর উপর রেখে দেয় যাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা জ্বলতে জ্বলতে কাঠিগুলোর বারুদ স্পর্শ করে। এরপর গ্যাসের চুলাটা ছেড়ে দিয়ে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে ঢুকে পড়ে পাশের একটা বাথরুমে।

এই বাড়ির রান্নাঘর আর বাথরুমটা সিঁড়ির ল্যান্ডিং থেকে দেখা যায় না। পুরনো ডুপ্লেক্স বাড়ি। একটু বেশি রক্ষণশীল। সে জানে অন্য কারো পক্ষে এই বাড়িতে ঢুকে কমন বাথরুম আর রান্নাঘরটি খুঁজে বের করতে কিছুটা সময় লেগে যাবে। তার দরকার মাত্র চার-পাঁচ মিনিট।

রান্নাঘরের জানালার মাত্র তিন ফিট নিচেই গাড়ি রাখার একটি গ্যারাজ রয়েছে। এই বাড়ির চারপাশ ঘিরে থাকা বাউন্ডারি দেয়ালটা চলে গেছে সেই গ্যারাজটা ঘেষে। দেয়ালটার ওপাশে আছে সরু একটি গলি। তার হিসেবটা খুব সহজ। এ মুহূর্তে এরচেয়ে সহজে এ বাড়ি থেকে বের হওয়া প্রায় অসম্ভব।

বাথরুমের ভেতর অপেক্ষা করছে সে। আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি।

কিছুটা সময় অতিক্রান্ত হবার পরই সে শুনতে পেল কেউ একজন চিৎকার করে বলছে, "জামান! জলদি নিচে নামো!"

তারপরই সেটা ঘটলো।

কানে তালা লাগার মতো বিকট একটি বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পুরো বাড়িটা। বাথরুমের নিরাপদ চারদেয়ালের মধ্যেও বিস্ফোরণের আঁচ টের পেল সে, সেইসাথে দুজন মানুষের আর্ত চিৎকার। সিঁড়ি থেকে এসেছে সেটা। একটু দম নিয়ে বাথরুম থেকে বের হতেই দেখতে পেল ধুয়ায় চারপাশ অন্ধকার হয়ে আছে। রান্নাঘরে উঁকি মারল, ঘরটা দেখে মনে হচ্ছে। বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে সেখানে।

দেয়াশলাইয়ের কাঠির বারুদে সিগারেটের আগুন লাগতেই চার-পাঁচ মিনিট ধরে চুলা থেকে নির্গত গ্যাসে বিস্ফোরণ ঘটেছে। বোমার মতো শক্তিশালী সেই বিস্ফোরণে উড়ে গেছে ঘরের দরজা জানালা।

দম বন্ধ করে রান্নাঘরে ঢুকে ভাঙা জানালা দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল গ্যারাজের টিনের ছাদের উপর। শব্দটা খুব জোরে হলো বলে একটু চিন্তায় পড়ে গেল সে। দ্রুত সেখান থেকে লাফ দিয়ে নিচের গলিতে নেমে এমনভাবে হাঁটতে শুরু করল যেন কোনো কিছু হয়নি।

অনেক দূর যাবার পর মুচকি হেসে পেছনে ফিরে বাড়িটা এক নজর দেখেই আবার হাঁটতে লাগল সে।

***

একটু আগে বিস্ফোরণের শব্দে সিঁড়ি থেকে হুরমুর করে জেফরি আর জামান ছিটকে পড়ে যায় নিচের ল্যান্ডিংয়ে। পিস্তলটা আরেকটু হলে হাত থেকে ছিটকে পড়ে যেতো। তাদের কানে তালা লাগার জোগাড় হয়। ধাতস্থ হতে আধ-মিনিটের মতো লেগে যায়।

মেঝে থেকে উঠে বসল জেফরি। একেবারে অক্ষত আছে। বিস্ফোরণের শকওয়েভে বেসামাল হয়ে পড়েছে শুধু। তবে তার সহকারী জামান বোধহয় ডান পায়ে ব্যথা পেয়েছে। ডান পায়ের গোড়ালী ধরে কোঁকাচ্ছে সে।

ঠিক তখনই ধপাস করে কোনো কিছু পড়ার শব্দ শুনতে পেল জেফরি বেগ। কিছু একটা আঁচ করতে পেরে উঠে দাঁড়াল সে। জামানের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি এখানেই থাকো, আমি উপরে যাচ্ছি..."

এক হাতে পিস্তল নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে রান্নাঘরের দরজার সামনে আসতেই দেখতে পেল সেটার দরজা জানালা বিস্ফোরণে উড়ে গেছে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘরটায় ঢুকে ভাঙা জানালা দিয়ে নিচে তাকাতেই বুঝে ফেলল কি হয়েছে।

সে-ও ঠিক খুনির মতো লাফিয়ে নাএল গ্যারাজের টিনের ছাদে। সেখান থেকে দ্রুত লাফ দিয়ে গলিতে নামতেই দৌড়াতে শুরু করল। সে জানে, খুনি তার থেকে একটু এগিয়ে আছে।

গলিটা একশ' গজের মতো এগিয়ে গিয়েই ডানদিকে বাঁক নিয়ে মিশে গেছে মেইনরোডের সাথে। জেফরি দৌড়ে চলে এল সেখানে। মেইনরোডে অসংখ্য যানবাহন আর মানুষজনের মধ্যে খুঁজে বেড়াল তার দুচোখ। পিস্তলটা কারোর নজরে পড়ার আগেই কোমরে গুঁজে রাখল। একবার ডানে আরেকবার বামে তাকাল সে। বুঝতে পারছে না কোন্ দিকে গেছে খুনি।

কয়েক মুহূর্ত পরই সেটা তার চোখে পড়ল।

ডানদিকের রাস্তার ফুটপাতে, তার থেকে বেশ দূরে, কালো ব্লেজার আর প্যান্ট পরা এক লোক। হাতে মাঝারি আকৃতির একটি লাগেজ। মানুষের ভিড়ে এতো দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করতে পারতো না যদি না সে পেছন ফিরে তাকাতো।

জেফরি দ্রুত এগিয়ে গেল। তার হাঁটার গতি অনেকটা দৌড়ের মতোই। খুনিও বুঝে গেছে জেফরি তার পিছু নিয়েছে, তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো হাঁটার গতি একদম স্বাভাবিক রেখেছে সে। ধীরস্থির। কোনো তাড়াহুড়া নেই তার মধ্যে।

আশ্চর্য!

দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য জেফরি বেগ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এখন তার থেকে মাত্র একশ' গজ দূরে আছে। কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে হাতে নেবে কি না বুঝতে পারল না। এতো মানুষের ভিড়ে এভাবে পিস্তল হাতে...না। সিদ্ধান্ত নিতে পারল না সে। সম্ভবত খুনিও সেটা বুঝে গেছে!

আচমকা ডানদিকের একটা গলিতে ঢুকে পড়ল সে। একেবারে চোখের পলকে। জেফরিও দৌড়ে ছুটে গেল। গলিতে ঢুকতেই দেখে সুনসান। জনমানুষের কোনো চিহ্ন

নেই।

অসম্ভব।

ম্যাজিকের মতো উধাও হয়ে গেছে খুনি। এভাবে তার চোখের সামনে থেকে হাওয়া হয়ে যাবে একদমই বুঝতে পারেনি জেফরি। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

তার মোবাইল ফোনে ইনকামিং মেসেজের বিপ হলে পকেট থেকে সেটা বের করে দেখল। ইংরেজিতে লিখেছে, বাংলা করলে অর্থ দাঁড়ায় :

আমাকে অনুসরণ করবে না। ফিরে যাও।

জেফরি ভেবেছিল রেবার মেসেজ...কিন্তু খুনির কাছ থেকে এ রকম একটি মেসেজ পেয়ে তার বুকটা ধক করে উঠল। তার মোবাইল ফোনের নাম্বার পর্যন্ত আছে লোকটার কাছে! আশেপাশেই কোথাও ঘাপটি মের আছে ভয়ঙ্কর সেই খুনি!

চারদিকটা চকিত দেখে নিলো সে। গলির দু-পাশে সারি সারি বাড়ি আর অ্যাপার্টমেন্ট। জনমানুষের চিহ্ন নেই। সতর্ক হয়ে উঠল। একেবারে বিশুদ্ধ গোলকধাঁধা!

চট করে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ইনকামিং মেসেজটা যে নাম্বার থেকে এসেছে সেই নাম্বারে রিটার্ন কল করল সে।

যা ভেবেছিল তাই।

দূর থেকে একটা মোবাইল ফোনের রিং হবার শব্দ শুনতে পেল ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ। তার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেল। কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে যেখান থেকে শব্দটা আসছে সেদিকে ছুটে গেল সতর্কভাবে।

একটু সামনে, ডানদিকের দুটো বাড়ির মাঝখানে, সরু আরেকটা গলি চলে গেছে, সেই গলি থেকে আসছে শব্দটা। গলিতে ঢুকতেই রিংটা থেমে গেল, কয়েক মুহূর্তের জন্য ভড়কে গেল জেফরি কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল রিং হতে হতে স্বাভাবিকভাবেই সেটা থেমে গেছে। আবারো ডায়াল করল সেই নাম্বারে।

এবার তার খুব কাছ থেকে রিং হবার শব্দ শুনতে পেল সে। আস্তে আস্তে গলির আরো ভেতরে ঢুকে পড়ল জেফরি। গলির শেষ মাথায় ডানদিকের বাউন্ডারি দেয়ালের উপর একটা মোবাইল ফোন রাখা আছে, সেটা থেকে আওয়াজটা আসছে।

বুঝতে পারল, দেয়ালের উপর থেকে মোবাইল ফোনটা নিয়ে দৌড়ে গলিটা পেরিয়ে আরেকটা বড় রাস্তায় এসে পড়ল সে। প্রথমে ডানে, তারপর বায়ে তাকাল। খুনির কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করে তাকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। এতে করে বাড়তি কিছুটা সময় পেয়ে উধাও হয়ে গেছে খুনি।

এমন বোকামির জন্য মনে মনে নিজেকে ভৎর্সনা করল জেফরি বেগ।

অধ্যায় ৫৩

খুনিকে ধরতে ব্যর্থ হলেও জেফরি বেগ জানে লেখক জায়েদ রেহমানকে কে হত্যা করিয়েছে, তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কেন করিয়েছে সেটাও জেনে গেছে সে। পুরো ঘটনাটিই বেশ জটিল। একটা নিখুঁত পরিকল্পনা। দক্ষ এক খুনি। গোলকধাঁধাতুল্য এই হত্যারহস্য অবশেষে উন্মোচিত হয়েছে তার কাছে।

সহকারী জামান পায়ে একটু চোট পেলেও সেটা মারাত্মক কিছু না-তার ডান পায়ের গোড়ালী মচকে গেছে।

জামানকে এখন পর্যন্ত কিছুই বলেনি। হোমিসাইডে ফিরে এসে, বেশ কিছু তথ্যও জোগাড় করে ফেলেছে সে। ধানমণ্ডির ঐ লাল রঙের বাড়িটা যে রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানের তার পরিচয় এবং মালিকের নামও জেনেছে জেফরি। সবগুলো তথ্য একটা বিষয়কেই দৃঢ় করে তুলেছে : জায়েদ রেহমানের আসল খুনি। তবে যে মোবাইলফোন দিয়ে খুনি তাকে ধোঁকা দিয়েছে সেটা আনরেজিস্টার্ড একটি সিমের। তার ধারণা খুনির কাছে একাধিক ফোন থাকে সব সময়।

সিদ্ধান্ত নিলো পুরো ব্যাপারটা হোমিসাইডের মহাপরিচালককে অবগত করতে হবে।

***

সব শুনে ফারুকসাহেব চুপ মেরে গেল। এই নীরবতা দীর্ঘস্থায়ী হলো কয়েক মিনিট। তার সামনে বসে আছে তার প্রিয়পাত্র জেফরি বেগ। অবশেষে মুখ খুলল হোমিসাইড প্রধান।

"অবিশ্বাস্য!" কথাটা বলেই আবার চুপ মেরে গেল। পুরো কেসটা তো একেবারে ওলটপালট হয়ে যাবে। কাউকেই বিশ্বাস করানো যাবে না।"

"কিন্তু আমাদের হাতে প্রমাণ আছে, স্যার। আমরা এটা প্রমাণ করতে পিরবো," বলল জেফরি।

"প্রমাণ?" ফারুক আহমেদ অবাক হয়ে বলল। "কোথায় প্রমাণ? এগুলো কি আদালতে টিকবে? খুনি যদি ধরা পড়তো...পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি দিতো তাহলে ব্যাপারটা ভেবে দেখা যেতো।"

"কিন্তু স্যার, অভিনেত্রী পমি যে কাহিনীটা আমাকে বলেছে, সেটাকে কী বলবেন?"

"একজন অভিনেত্রী কী বলল না বলল সেটা আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে না...অবশ্য ঐ অভিনেত্রী যদি শেষ পর্যন্ত আদালতে গিয়ে এসব কথা বলে

জেফরিও জানে কথাটা সত্যি। পমি তার সাথেই দেখা করেছে গোপনে, যাতে করে তার স্বামী জানতে না পারে। সে আদালতে গিয়ে এসব কথা বলবে সেটা আশা করা হবে বোকামি।

"শোনো, জেফ...আমি বুঝতে পারছি তোমার অবস্থাটা। তোমার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে তুমি যাদেরকে দায়ি করছে তাদেরকে কোনো দিনই আদালতে দোষি প্রমাণ করা যাবে না।"

"কিন্তু আরেকটু তদন্ত করলে আমি নিশ্চিত সেটা প্রমাণ করা যাবে। আমার হাতে অনেকগুলো প্রমাণ আছে, সেগুলো নিয়ে কাজ করলে-"

"তোমার হাতে আসলে শক্ত কোনো প্রমাণই নেই, জেফ," তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল মহাপরিচালক, "যেগুলো আছে সেগুলো এক ফুঙ্কারে হাওয়া হয়ে যাবে। ঐ দারোয়ান আর নাইটগার্ড? চায়ের দোকানি? ঘুষখোর এক পুলিশ ইন্সপেক্টর? আর ঐ পমি না ফমি নামের এক অভিনেত্রী?" মাথা দোলাল ফারুকসাহেব। "এদের কথায় কিংবা সাক্ষিতে

কিছুই প্রমাণ করা যাবে না।"

"তাহলে আমি যা জানতে পেরেছি তার কি কোনোই মূল্য নেই?" হতাশ হয়ে বলল জেফরি।

"তুমি একটি কাহিনী জানতে পেরেছে। অবিশ্বাস্য একটি কাহিনী। জায়েদ রেহমানের হত্যার তদন্তে যেসব অসঙ্গতি তোমার কাছে ধরা পড়েছিল এই কাহিনীটা সে-সব দূর করতে সাহায্য করছে। তোমার কাছে এখন পুরো বিষয়টা পরিস্কার...কিন্তু এটা তুমি প্রমাণ করতে পারবে না।"

"খুনি যে বাড়িতে ছিল সেটার ব্যাপারে কি বলবেন?"

মাথা দোলাল হোমিসাইড প্রধান। "ডেভেলপাররা বলবে বাড়িটা পরিত্যক্ত ছিল...খুনি হয়তো সেই সুযোগই নিয়েছে।"

"স্যার, আপনি যদি আমাকে সুযোগ দেন তো আমি প্রমাণ করতে পারবো..."

"কি রকম সুযোগ?"

"সি ই এ সিদ্দিকীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দিন আমাকে।"

"অসম্ভব!" সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিল হোমিসাইড প্রধান। "শুধুমাত্র সন্দেহের উপর ভিত্তি করে এ রকম একজন ধনাঢ্য শিল্পপতি-ব্যবসায়িকে খুনের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ!? মাইগড! তুমি বুঝতে পারছো না?"

"তাহলে তো আমরা এ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে পারবো না, স্যার।"

"তুমি ভুলে গেছো, এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে। আমার ধারণা আগামী মাসের মধ্যেই ফাইনাল ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট দেয়া হবে।"

"স্যার, আমরা তো জানি ওরা এই খুনটা করেনি!" জেফরি বলল।

"ঠিক আছে, সেটা আদালত আর ওদের উকিলের উপরেই ছেড়ে দাও। এ ব্যাপারে আমরা এখন কিছু করতে পারবো না," বলল ফারুক আহমেদ। "কিছু করার নেই।"

"আমি যদি ঐ খুনিকে ধরতে পারি কিংবা সিদ্দিকীসাহেবের বিরুদ্ধে শক্ত কোনো প্রমাণ পাই তাহলে কি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দেবেন?"

"যদি কিছু পাও তখন দেখা যাবে।" একটু থেমে আবার বলল সে, "তবে ঐ খুনি শুধু ধরা পড়লেই হবে না, তাকে স্বীকারোক্তিও দিতে হবে। আমি জানি, এ রকম কিছু ঘটবে না।"

হতাশ হয়ে ফারুকসাহেবের দিকে চেয়ে রইল জেফরি।

"রিয়েলিটি...মাইবয়," একটু থেমে আবার বলল, "বাড়ি যাও। বিশ্রাম নাও, জেফ।"

অন্যমনস্ক হয়ে উঠে চলে গেল সে। যাবার আগে হোমিসাইড প্রধানকে কিছুই বলল না।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ফারুক আহমেদের ভেতর থেকে।

অধ্যায় ৫৪

সন্ধ্যার একটু আগে, সি ই এ সিদ্দিকী নিজের অফিস থেকে বের হবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন মাত্র অমনি ইন্টারকমে তার প্রাইভেট সেক্রেটারি জানাল ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

আশ্চর্য! এই লোকটা তার সাথে বার বার দেখা করতে চাইছে কেন?

অমূল্যবাবুও কাছে নেই। একটু চুপ করে থেকে সেক্রেটারিকে বলে দিলেন ইনভেস্টিগেটরকে তার অফিসে পাঠিয়ে দিতে, তারপর নিজের ডেস্কের নিচে একটা গোপন সুইচ টিপে দিলেন তিনি।

"আসুন," দরজা খুলে অফিসে ঢুকতেই জেফরির উদ্দেশ্যে বললেন সি ই এ সিদ্দিকী। "বসুন, প্লিজ।"

একটা চেয়ারে বসল ইনভেস্টিগেটর। "ধন্যবাদ।"

"আবার কি মনে করে, মি. বেগ?" সিদ্দিকীসাহেব জানতে চাইলেন।

"আপনার সাথে দেখা করার কোনো পরিকল্পনা আমার ছিল না কিন্তু পরিস্থিতি বাধ্য করেছে।"

ভুরু তুলে চেয়ে রইলেন তিনি। "যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন, আমি জাস্ট বের হচ্ছিলাম।"

মাথা নেড়ে সায় দিল জেফরি বেগ। পকেট থেকে খুনির ছবিটা বের করে ডেস্কের উপর রাখল। সি ই এ সিদ্দিকী ছবিটার দিকে তাকালেন কিন্তু তার অভিব্যক্তি দেখে বোঝার উপায় নেই লোকটাকে তিনি চিনতে পেরেছেন কি না। ভাবলেশহীন। নির্বিকার।

"চিনতে পেরেছেন?"

মাথা নাড়লেন তিনি। মুখে কিছু বললেন না।

"এই লোক লেখক জায়েদ রেহমানকে খুন করেছে," সিদ্দিকীসাহেবের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলল জেফরি।

এখনও কোনো অভিব্যক্তি নেই। "তাই না কি," নির্লপ্তভাবে বললেন। "কিন্তু আমার কাছে কেন এসেছেন সেটা বলুন।"

"বলছি," একটু থেমে বলতে লাগল সে, "এই লোকটা পেশাদার খুনি। নিজের কাজে বেশ প্রতিভাবান। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে এই লোকই লেখক জায়েদ রেহমানকে খুন করেছে...তবে কাজটা সে করেছে আরেকজনের হয়ে।"

"ইনভেস্টিগেটর...আপনার যা বলার সংক্ষেপে বলুন। কে কাকে খুন করেছে সেটা আমাকে শুনিয়ে লাভ নেই। আসল কথায় আসুন।" বেশ দৃঢ়ভাবে বললেন তিনি।

"মি. সিদ্দিকী, এই পেশাদার ভাড়াটে খুনিকে দিয়ে লেখক জায়েদ রেহমানকে আপনিই খুন করিয়েছেন!"

সিদ্দিকীসাহেব নিষ্পলক চোখে জেফরির দিকে চেয়ে রইলেন। "আমি!?"

মাথা নেড়ে সায় দিল জেফরি। "হ্যাঁ।"

"আমি তাকে খুন করতে যাবো কেন?"

"পমি আমাকে সব বলেছে।" কথাটা শুনে এই প্রথম সিদ্দিকীসাহেব একটু চমকে উঠলেন। "এখন আমি সব জানি।"

সি ই এ সিদ্দিকী চুপ মেরে রইলেন।

"আপনার ছেলে ইরাম অল্পবয়স থেকেই লেখক জায়েদ রেহমানের অন্ধভক্ত। তার সাথে লেখকের বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। জায়েদ সাহেব তাকে একটা বইও উৎসর্গ করেছিলেন। লেখকের খুব ঘনিষ্ঠ ছিল ইরাম।" একটু থেমে সিদ্দিকীসাহেবের দিকে ভালো করে তাকাল

জেফরি। কয়েক বছর আগে...লেখক জায়েদ রেহমান তার একটি ছবির শুটিং ইউনিট নিয়ে সেন্ট মার্টিনে যান, সঙ্গে ছিল ইরাম।”

“আমার কাছে বলেছিল বন্ধুদের সাথে সেন্ট মার্টিনে যাচ্ছে...” অন্যমনস্ক হয়ে বললেন সিদ্দিকীসাহেব।

“এক রাতে...ছবির নায়িকা পমি স্ক্রিপ্টের ব্যাপারে একটু আলোচনা করার জন্য জায়েদ রেহমানের রুমে ঢুকতেই ভয়ঙ্কর একটি দৃশ্য দেখতে পায়।”

সিদ্দিকীসাহেব দুচোখ বন্ধ করে ফেললেন।

লেখক জায়েদ রেহমান যে ইরামকে নেশাগ্রস্ত করে বলাকার করছিলেন সেটা আর মুখে বলল না জেফরি।

“পমি এটা মেনে নিতে পারেনি। ঐ রাতেই এ নিয়ে জায়েদ রেহমানের সাথে তার তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়। পর দিন সকালেই ইউনিট ছেড়ে চলে আসে সে। সেই ছবিতে আর কাজ করেনি।”

চোখ খুললেন সিদ্দিকীসাহেব। তার দুচোখ লাল টকটকে।

“জায়েদ রেহমানের মতো জনপ্রিয় লেখকের বিরুদ্ধে এসব বলে কোনো লাভ হবে না বরং তার নিজেরই ক্ষতি হবে, এটা বুঝতে পেরে পমি সেদিনের ঘটনাটি আর কাউকে বলেনি। বিনিময়ে জায়েদ রেহমানও তার বিরুদ্ধে মাঝপথে ছবির কাজ ছেড়ে দেয়ার জন্য কোনো মামলা বা ক্ষতিপূরণের দাবি করেননি। বিশাল অঙ্কের টাকা লোকসান মেনে নেন তিনি।” একটু থামল জেফরি।

সিদ্দিকীসাহেবের দৃষ্টিতে শূন্যতা। যেন অন্য কোথাও হারিয়ে গেছেন।

“জায়েদ রেহমানের সাথে তার প্রথম স্ত্রীর ডিভোর্সের পর কথা প্রসঙ্গে পমি মহিলাকে জানায়, লেখক একজন ধর্ষণকারী। জঘন্য সেই ঘটনাটি পুরোপুরি খুলে বলেনি সে, ফলে গোলনূর আফরোজ তরফদার ধরে নেয় জায়েদসাহেব পমিকেই ধর্ষণ করেছেন। মহিলাকে দোষ দেয়া যায় না...ধর্ষণ বলতে আমরা সাধারণত পুরুষ কর্তৃক নারীকে ধর্ষণ করাই বুঝি।”

সিদ্দিকীসাহেব এবার জেফরির দিকে তাকালেন।

“আপনি অবশ্য এই ব্যাপারটার কিছুই জানতেন না। কিন্তু ঘটনাচক্রে পমি আপনাকে পুরো ঘটনাটি বলে দেয়।”

“হ্যাঁ...ঐ দিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে,” সিদ্দিকীসাহেব বললেন।

“আপনার বন্ধু মির্জা আদিলকে বিয়ে করার পর পরই পমি নিয়মিত ঢাকা ক্লাবে আসতে শুরু করে,” বলতে লাগল জেফরি, “এক দিন লেখক জায়েদ রেহমানও অন্য একজন মেম্বারের গেস্ট হয়ে ক্লাবে এলেন। আপনার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো... আপনারা তিনজনে বসে একটু ড্রিঙ্ক করলেন। লেখক অবশ্য জানতেন না আপনিই ইরামের বাবা। এমন সময় পমি এসে হাজির হয় সেখানে...কিছুটা মাতাল ছিল সে।”

আলতো করে মাথা নাড়লেন সিদ্দিকীসাহেব তবে তার দৃষ্টি এখনও শূন্যে ।

“ক্লাবে জায়েদ রেহমানকে দেখেই পমি বিগড়ে যায়। জায়েদ রেহমানকে গালিগালাজ করতে শুরু করে সে। মাতাল ছিল বলে কোনো হুশ ছিল না তার। আপনি তাকে ধমক দিলে সে রেগেমেগে বলে দেয় ইরামের সাথে জায়েদসাহেব কি জঘন্য কাজটা করেছিল সেন্ট মার্টিনে।”

মাথা নিচু করে রাখলেন সি ই এ সিদ্দিকী।

“জীবনে এতোটা বিস্মিত হননি আপনি...এতোটা ক্ষুব্ধও হননি কখনও। জায়েদসাহেবের সাথে আপনার তুমুল ঝগড়া বেধে যায়। হাতাহাতির পর্যায়ে চলে গেলে অন্যেরা এসে

আপনাদেরকে থামায়। সেদিনই আপনি সবার সামনে বলেছিলেন, জায়েদ রেহমানকে এর মাশুল দিতে হবে।"

মুখে তিক্ত হাসি দেখা গেল সিদ্দিকীসাহেবের। "হ্যাঁ, তা বলেছিলাম।"

"ক্লাব থেকে ফিরেই জায়েদসাহেব স্ট্রোক করে বসেন। কয়েক দিন পর তার ওপেনহার্ট সার্জারি করা হয়...এর কয়েক মাস পর আরেকটা স্ট্রোকে উনি প্যারালাইজ্‌ড হয়ে যান।" জেফরি বেগ একটু থেমে আবার বলতে লাগল, "তারপর যখন জানতে পারলেন লেখক জায়েদ রেহমান আত্মজীবনী লেখার কাজে হাত দিয়েছেন তখন আর দেরি করলেন না। আত্মজীবনীর কাজ শেষ হবার আগেই পেশাদার এক খুনিকে দিয়ে খুনটা করালেন...খুবই নিখুঁতভাবে। ফেঁসে গেল মিসেস রেহমান আর তার প্রেমিক।"

"সবই তো জানেন দেখছি..." বললেন সিদ্দিকীসাহেব।

জেফরি বেগ আরো বলতে লাগল, "অমূল্যবাবুর এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় নির্মল প্রকাশনীতে কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কাজ করে। তার কাছ থেকেই জায়েদসাহেবের আত্মজীবনী লেখার কথাটা জানতে পারে অমূল্যবাবু...সে আপনাকে সব জানালে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়।"

"কিন্তু আপনি কোনো কিছুই প্রমাণ করতে পারবেন না," দৃঢ়তার সাথে বললেন ইরামের বাবা।

জেফরি এ ব্যাপারে কিছু বলল না। "অবয়ব প্রকাশনী থেকে জায়েদ রেহমানের যে আত্মজীবনীটা প্রকাশিত হয়েছে খুব সম্ভবত সেটা আপনার ঐ অমূল্যবাবুর লেখা...আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, ভদ্রলোক এক সময় লেখালেখি করতেন। বলা যায় ব্যর্থ লেখক।"

সিদ্দিকীসাহেবের ঠোঁটে মুচকি হাসি। "এখন তো আর সেটা বলার কোনো উপায় নেই। বইটা দারুণ বিক্রি হচ্ছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জেফরি বলল, "তবে আপনার ছেলে ইরাম কেন ঐদিন রাতে ভিটা ভার সামনে গিয়েছিল সেটা এখনও জানি না।"

"আপনার খুব জানতে ইচ্ছে করছে?" গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সিদ্দিকীসাহেব।

অবাক হলো ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ।

"ঠিক কি কারণে ইরাম ঐ দিন ওখানে গিয়েছিল জানি না। তবে প্রায়ই সে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। আমার ধারণা, সম্ভবত সে-ও লেখককে খুন করতে চায়!"

অবাক হলো জেফরি। "কী বলেন!"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন তিনি। "আমার ছেলে এলএসডি'র মতো মারাত্মক এক ড্রাগে আসক্ত। ঐ ঘটনার পর থেকে সে কিছুটা অস্বাভাবিকও হয়ে পড়ে। আপনি অনেক কিছু জানলেও এটা জানেন না, লেখক জায়েদ রেহমানের এক বইতেই এলএসডি সম্পর্কে ভুল ধারণা পায় ইরাম। আমি অবশ্য কিছু দিন আগে জানতে পেরেছি কথাটা।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল জেফরি বেগ।

"এই ড্রাগ নিলে না কি মায়ের জরায়ুতে থাকার স্মৃতি মনে পড়ে যায়-লেখকের এমন কথায় বিশ্বাস করে ওটাতে আসক্ত হয়ে পড়েছিল সে। জন্মের পর পরই ওর মা মারা যায় সুতরাং মায়ের ব্যাপারে ওর সব সময়ই একটা ফ্যাসিনেশন কাজ করে। কোত্থেকে এসব ড্রাগ জোগাড় করে বুঝি না। খুব সম্ভবত ওর একটি সার্কেল আছে। অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু অ্যাডিকশন থেকে ফেরাতে পারিনি। ইদানিং ড্রাগ নেবার পরই জায়েদ রেহমানকে খুন করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। সব সময়ই চোখে চোখে রাখি কিন্তু আমার ছেলেটা সবাইকে

ফাঁকি দিয়ে বার বার পালিয়ে যায়। কাকতালীয়ভাবে ঐদিনও একই কাজ করেছিল।” সিদ্দিকীসাহেব থামলেন।

“আপনি জায়েদ রেহমানের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে তাকে খুন করেছেন... বানোয়াট একটি আত্মজীবনী তার নামে ছেড়ে দিয়ে তার মানসম্মান ধুলোয় মিটিয়ে দিয়েছেন।”

“হ্যাঁ,” বললেন সিদ্দিকীসাহেব। এছাড়া আমার কিছু করার ছিল না। আমি তো আদালতে গিয়ে বলতে পারবো না, আমার ছেলের সাথে কী করেছে ঐ বিকৃত মানসিকতার লোকটি। তাই আমি আমার মতো করেই প্রতিশোধ নিয়েছি। আমার ছেলেকে বলাকার করার প্রতিশোধ...আমার ছেলেকে নেশায় আসক্ত করানোর প্রতিশোধ!”

“একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে হত্যা করে প্রতিশোধ নিলেন!”

“হ্যাঁ, নিলাম...কারণ ঐ জঘন্য লোকটি ভণ্ড আর মিথ্যায় পরিপূর্ণ একটি আত্মজীবনী লিখছিল। নিজেকে একজন সাধুপুরুষ হিসেবে অমর করতে চেয়েছিল...চেয়েছিল নিজের সমস্ত নোংরা সত্যগুলোকে আড়াল করতে। আমি তা হতে দিইনি!” একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, “আপনার সাথে যদি কেউ অন্যায় করে আপনি তার প্রতিশোধ নেবেন... এটাই স্বাভাবিক।”

“তাহলে আইন-আদালত কি করবে?” প্রশ্ন রাখল জেফরি।

“তাদের যা করার তারা করবে, আমার যা করার আমি করেছি। আমি আদালতে যেতে পারবো না বলে তো তাকে ছেড়ে দিতে পারি না।” একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন তিনি। “আপনি ব্যাপারটা যেভাবে দেখছেন আমি সেভাবে দেখছি না, এই হলো পার্থক্য।”

“আপনি কিভাবে দেখছেন!?” অবাক হয়ে জানতে চাইল জেফরি।

“অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়াটাকে আমি স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে করি। প্রতিশোধ এই মহাবিশ্বেরই অংশ। আপনি নিউটনের থার্ড ল সম্পর্কে নিশ্চয় জানেন-প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি বিপরীত এবং সমান। প্রতিক্রিয়া আছেদ্যাটস ইট! আপনি যা করবেন তার পাল্টা প্রতিক্রিয়া থাকতে হবে। প্রতিশোধ ছাড়া পৃথিবীটা একবার চিন্তা করে দেখুন, মি. বেগ...ওয়ান ফাইন মর্নিং আপনি ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেলেন কোনো রকম প্রতিশোধ নেই। অন্যায় বেড়ে যাবে হু হু করে! কেউ অন্যায়-অত্যাচার করতে ভয় পাবে না। আমরা প্রতিশোধের ভয়ে অনেক অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকি। আই ফর আই! চোখের বদলে চোখ-এটাই জগতের নিয়ম। সেই প্রাচীনকাল থেকেই এটা চলে এসেছে।” উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি, নিজেকে একটু ধাতস্থ করে আবার বলতে লাগলেন, “মি. বেগ, আপনি নিশ্চয় জানেন, অন্যায়ের প্রতিশোধের জন্যে গ্রিকদের একজন দেবি পর্যন্ত রয়েছে... নেমেসিস! আমার ছেলের সাথে যে অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিশোধ আমি নিয়েছি।”

“কিন্তু আপনার এই প্রতিশোধের কারণে নির্দোষ দু-জন মানুষ ফেঁসে যাচ্ছে সেটা কি আপনি জানেন না?”

“জানি। এ-ও জানি, তাদেরকে নিয়ে আপনার খুব চিন্তা হচ্ছে।”

“আমি তো মনে করি যেকোনো বিবেকবান মানুষেরই তা-ই হওয়া উচিত।” কথাটা বেশ ঝাঁঝের সাথে বলল জেফরি বেগ।

“এ নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। কিছু দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।”

অবাক হলো ইনভেস্টিগেটর। “ঠিক হয়ে যাবে! কিভাবে? আপনি নিজের দোষ স্বীকার করে নেবেন!?”

দু-পাশে মাথা দোলালেন সিদ্দিকীসাহেব। “ছেলেমানুষী কথাবার্তা বলবেন না। একটু

অপেক্ষা করে দেখুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আপনি নিজেকে খুব ক্ষমতাবান ভাবেন, তাই না? ভাবেন টাকা দিয়ে সব করা সম্ভব?"

"টাকা দিয়ে অনেক কিছুই করা সম্ভব, মি. বেগ।"

"আচ্ছা! তাহলে আমাকে বলুন, এই দু-জন নির্দোষ মানুষ কিভাবে রক্ষা পাবে?"

"মনে করুন কয়েক দিন পর জেলে থাকা এক ডাকাত নিজে থেকে পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি দিল, সে কৌশলে জায়েদ রেহমানের ফ্ল্যাটে ঢুকে ডাকাতি করতে গিয়ে তাকে খুন করে ফেলেছে!"

জেফরি চেয়ে রইল, কিছু বলল না।

"ভাবছেন অসম্ভব?" মাথা দোলালেন তিনি। "টাকা দিয়ে সব না হলেও এ কাজটা করা যাবে।"

বাঁকাহাসি হাসল জেফরি বেগ।

"আমার কতো টাকা আছে সেটা আমি নিজেও জানি না, মি. বেগ। সম্ভবত হাজার কোটি টাকা। এতো টাকা থাকার পরও তুচ্ছ এক লেখক আমার অল্পবয়সি ছেলের সাথে জঘন্য একটা কাজ করল আর আমি কি না বসে বসে আদর্শের বাণী আওড়াবো!" দু-পাশে দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লেন তিনি। "না। এভাবে পৃথিবীটা চলে না। তুমি আমার নিষ্পাপ ছেলেকে বলাকার করেছে আমি তোমার সারা জীবনের অর্জিত মানসম্মানকে বলাকার করে দিলাম!"

"আপনার কাজ আপনি করেছেন, এবার আমার কাজ আমাকে করতে দিন।" উঠে দাঁড়াল জেফরি বেগ। "আপনার প্রতি, আপনার ছেলের প্রতি আমার যথেষ্ট সমবেদনা রয়েছে, তারপরও হত্যাকাণ্ডকে কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এর অবশ্যই বিচার হওয়া উচিত, আর আমি সেই চেষ্টাই করবো।"

"গুডলাক, মি. বেগ।" কথাটা নির্বিকারভাবে বললেন সি ই এ সিদ্দিকী।

"এরপর এখানে যখন আসবো আপনি বুঝতে পারবেন, টাকা আর ক্ষমতা দিয়ে সব কিছু করা যায় না।" কথাটা বলেই দরজার দিকে পা বাড়াল সে।

"আর আপনি এখান থেকে ফিরে গিয়ে বুঝতে পারবেন, ইটস অ্যা ওয়াইল্ড ওয়ার্ল্ড, মি. বেগ...অ্যান্ড ফানি টু!" সি ই এ সিদ্দিকী তার ডেস্কের নিচে সুইচটা আবারো টিপে দিলেন।

মুচকি হেসে জেফরি বেগ দরজা খুলে বের হতেই শুনতে পেল পেছন থেকে সিদ্দিকীসাহেব বলছেন, "এপ্রিল ফুল!"

কথাটার কোনো মানে বুঝল না ইনভেস্টিগেটর।

***

নিজের অফিসে এসে লেদার জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে আনলো জেফরি বেগ।

সি ই এ সিদ্দিকীর সাথে তার সমস্ত কথাবার্তা রেকর্ড করেছে সে। এছাড়া তার আর কোনো উপায়ও ছিল না। এমন কোনো শক্তিশালী ক্লু তার হাতে নেই যা দিয়ে ক্ষমতাধর সিদ্দিকীসাহেবকে অভিযুক্ত করা যাবে। সিম অফ না করে রাখলে রেকর্ডিংয়ের মাঝপথে কেউ কল করে বসতে পারে সেজন্যে ভদ্রলোকের অফিসে ঢোকার আগেই সিম অফ মোডে রেখে রেকর্ডিং করেছিল।

দীর্ঘ সংলাপে জেফরি ইচ্ছে করেই পুরো হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি বিস্তারিত বলে গেছে। তার ফাঁদে পা দিয়ে ভদ্রলোকও এমন অনেক কথা বলে ফেলেছেন যা তার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়াবে।

মি. সিদ্দিকী, আপনি অনেক টাকার মালিক হতে পারেন, হতে পারেন অনেক ক্ষমতাধর

ব্যক্তি স্তু অতোটা স্মার্ট হয়ে উঠতে পারেননি! মনে মনে বলল সে।

রেকর্ডিং অপশনে গিয়ে কিছুক্ষণ আগে রেকর্ড হওয়া অডিও ফাইলটি প্লে করে ফোনসেটটা কানের কাছে তুলে ধরল ইনভেস্টিগেটর।

ঘর্‌ঘর্‌... ঘর্‌ঘর্‌... ঘর্‌ঘর্‌...

অবাক হয়ে ফোনটা চোখের সামনে এনে দেখল ফাইলের ডিউরেশন মাত্র ৮ সেকেন্ড!

ঘর্‌ঘর্‌... ঘর্‌ঘর্‌... ঘর্‌ঘর্‌...

এটা কি করে সম্ভব!?

সিদ্দিকীসাহেবের শেষ কথাটার মানে বুঝতে পারল জেফরি বেগ।

জ্যামার! ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বিকল করে দেবার জন্যে বিভিন্ন ধরণের জ্যামার রয়েছে। কিছু জ্যামার আছে শুধুমাত্র শব্দধারণকে বাধা দিয়ে থাকে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর পাশাপাশি বড় বড় অনেক ব্যবসায়িও এ ধরণের জিনিস ব্যবহার করে থাকে ব্ল্যাকমেইলের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্যে। সি ই এ সিদ্দিকীর অফিসরুমে যে এ রকম একটি ডিভাইস আছে সে-ব্যাপারে জেফরি বেগ একদম নিশ্চিত।

শুধুমাত্র সিদ্দিকীসাহেবের শেষ কথাটাই রেকর্ড হয়েছে।

এপ্রিল ফুল!?

অধ্যায় ৫৫

রেবার ইয়েলো ক্যাবটা এসে থামল দোতলা একটি বাড়ির সামনে। রাত দশটা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। একটা শাল গায়ে জড়িয়ে আস্তে করে গাড়ি থেকে নেমে দোতলা বাড়িটার দিকে পা বাড়াল সে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার যে ফ্ল্যাটের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সেই ফ্ল্যাটের একটি ডুপ্লিকেট চাবি আছে তার কাছে। অনেক দিন পর আজকে আবার এখানে এসেছে রেবা।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে জেফরির মোবাইলে ফোন করে গেলেও তাকে পায়নি। তার ফোন বন্ধ। অজানা আশঙ্কায় রেবার বুক কেঁপে উঠলেও নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছে, জেফ হয়তো জরুরি কোনো কাজে ব্যস্ত আছে। রেবা জানে, ইন্টেরোগেশনের সময় মোবাইলফোন বন্ধ রাখে সে।

অনেক বার ফোন করেও যখন পেল না তখন আর এখানে না এসে উপায় রইল না তার।

ভেতরে ঢুকে সুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়ে দিল সে।

জেফরির এই দুই রুমের ফ্ল্যাটে অনেক দিন পর এল। এই কয়েক মাসেই জায়গাটা একটু অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে তার কাছে। এলএল হয়ে আছে ফ্ল্যাটটা। জেফরি যে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এটা যেন তারই বহিপ্রকাশ। এমনিতে সে খুব গোছানো একজন মানুষ।

এমন সময় দরজার নবে চাবি ঘোরানোর শব্দ শুনে রেবা ছুটে গেল সেদিকে। জেফরি তাহলে এসে পড়েছে।

দরজাটা খুলতেই দেখতে পেল এক আগন্তুক দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। রেবার চেয়ে তার বিস্ময় কোনো অংশেই কম নয়।

***

ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ খুবই নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে বেড়ে ওঠা একজন মানুষ। ফাদার জেফরি হোবার্টের কাছ থেকে মা-বাবার স্নেহ পেলেও কঠিন শাসনের মধ্যে থাকতে হয়েছে তাকে। সিগারেট কিংবা মদের প্রতি কখনই তার আকর্ষণ ছিল না, তবে বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে বছরে দু-একবার পানাহার করে। ভার্জিনিয়ায় ট্রেনিং নেবার সময়ও খুব একটা ছুঁয়ে দেখেনি মদ নামক জিনিসটা। তবে আজকে তার মানসিক অবস্থা খুব খারাপ। এ রকম ব্যর্থ একটি দিন তার জীবনে আর কখনও আসেনি।

বেশ কয়েক দিন ধরে তার মনমেজাজ ভালো নেই। ভেতরে ভেতরে একটা অস্থিরতা চলছে। যে মেয়ের সাথে দীর্ঘ পাঁচ বছরের সম্পর্ক তার কাবিন হয়ে গেছে কয়েক দিন আগে। এরপর জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি তাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। নিজেকে একজন ব্যর্থ মানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না।

খুনিকে হাতের নাগালে পেয়েও ধরতে পারেনি। ধূর্ত খুনি তাকে বোকা বানিয়ে সটকে পড়েছে। এরপর তাকে আরেকবার বোকা বানিয়ে এপ্রিল ফুল উপহার দিয়েছেন সি ই এ সিদ্দিকী।

আর সব দিনের মতো হোমিসাইড থেকে সোজা নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে গেল না, একটা বারে গিয়ে আকণ্ঠ পান করল সে। অনেক রাত পর্যন্ত থাকার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়নি। বারে বসে পান করতে করতেই তার মনে পড়ে যায় মোবাইল ফোনটা বন্ধ করে রেখেছে। সিদ্দিকীসাহেবের কথা রেকর্ড করার জন্যে সিম অফ করে রেখেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা বের করে সিম অন করতেই তিন-চারটা এসএমএস এসে জড়ো হলো। সবগুলোই রেবার।

প্রথমটা সন্ধ্যার দিকে। শেষ মেসেজটা প্রায় এক ঘণ্টা আগের।

তোমাকে কল করে পাচ্ছি না। দেখা করতে চাই। জরুরি।

রেবা আমার সাথে দেখা করতে চাইছে! বিস্মিত হলো জেফরি বেগ।

আমি তোমার কাছে আসছি।

আমার কাছে!

তোমার ফ্ল্যাটে যাচ্ছি। জলদি আসো। প্লিজ।

কি!

সঙ্গে সঙ্গে রেবার মোবাইলে কল করল কিন্তু তার ফোন বন্ধ। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল জেফরি বেগ। বার থেকে বের হয়ে একটা ট্যাক্সি ক্যাব নিয়ে রওনা হলো নিজের ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে। তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। রেবা কেন তার ফ্ল্যাটে আসতে চাইবে! তার ফোনই বা কেন বন্ধ! মদের নেশায় মাথাটা ঠিকমতো কাজ করছে না। অস্থির হয়ে উঠল সে। বার বার ক্যাবের ড্রাইভারকে জোরে চালানোর জন্যে তাগাদা দিল পেছনের সিট থেকে।

বাড়ির সামনে আসতেই দ্রুত ভাড়া মিটিয়ে নিজের ফ্ল্যাটের দিকে টলতে টলতে পা বাড়াল সে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় একবার হোঁচটও খেলো। ফ্ল্যাটের দরজায় দরজায় নক করলেও কোনো সাড়া শব্দ পেল না। রেবা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। অগত্যা পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

বেডরুমে বাতি জ্বলছে। সে-দিকে পা বাড়াল জেফরি। দরজার কাছে। আসতেই এমন একটা দৃশ্য দেখতে পেল যা কখনই চিন্তা করেনি।

মাইই গড!

***

বেডরুমে বিছানার প্রান্তে বসে আছে রেবা। চোখেমুখে তীব্র আতঙ্ক। তার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে দেবদূতের মতো চেহারার সেই খুনি-জায়েদ রেহমানের হত্যাকারী।

কিন্তু জেফরি নড়তে পারল না। তার পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেছে, কারণ খুনির হাতে যে পিস্তলটি রয়েছে সেটা রেবার মাথার পেছনে তা করা।

এই জীবনে নিজেকে এতোটা অসহায় আর কখনই লাগেনি। বেডরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল বেশ কিছুটা সময়। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোলো না।

"জেফ!" অস্ফুটস্বরে বলল রেবা। ভয়ে কাঁপছে সে।

তার পেছনে থাকা খুনির চেহারা একদম নির্বিকার। "পিস্তলটা বিছানার উপর রাখুন," আস্তে করে বলল সে।

কটের ভেতরে হাত দিয়ে শোল্ডার হোলস্টার থেকে নাইন মিলিমিটারের পিস্তলটা বের করে বিছানার উপর রেখে দিল।

খুনি এবার অন্য হাত দিয়ে কয়েক পা পেছনে চলে যাবার ইশারা করল জেফরিকে।

"মি. জেফরি বেগ, বসুন," বিছানার অন্যপ্রান্তের দিকে ইশারা করে বলল খুনি।

তার কথামতো জেফরি বসে পড়ল। রেবাকে আশ্বস্ত করে বলল সে, "ভয় পেয়ো না।"

"এই নোক কে...জেফ?" কাঁপা কাঁপা গলায় বলল রেবা।

"তোমাকে পরে সব বলবো। এখন কোনো কথা বোলো না।"

খুনি তাদের কথাবার্তায় কোনো বাধা না দিয়ে মুচকি হাসল কেবল। পিস্তলটা এখনও রেবার দিকেই তাক্ করে রেখেছে।

"আ-আমাদেরকে মেরে ফেলবে...?"

"না। রেবা," বলল জেফরি।

“ব্যস্...এবার চুপ! আর কোনো কথা নয়,” রেবার উদ্দেশ্যে বলল খুনি।

“তুমি কি চাও?” প্রশ্ন করল জেফরি বেগ।

খুনির ঠোঁটে বাঁকাহাসি। “আমি কারো কাছ থেকে কিছু চাই না...দরকার পড়লে নিজেই নিয়ে নিই।”

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল জেফরির বুক থেকে। “তুমি আমাকে খুন করতে চাও তো... ঠিক আছে, ওকে ছেড়ে দাও।” জেফরির কথা শুনে রেবার চোখ দুটো বিস্ফারিত হবার জোগাড় হলো। “ওকে কিছু কোরো না।”

***

জেফরির সাথে কথা বলার পর পরই সিদ্দিকীসাহেব নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছেন, আজ আর ক্লাবে যাননি।

ড্রইংরুমে বসে আছে অমূল্য বাবু। কিছুক্ষণ আগে এসেছে সে। সিদ্দিকী সাহেবের কাছ থেকে সব শুনে বাবু বলল, “এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনাকে আর না ভাবলেও চলবে। ঐ ইনভেস্টিগেটর ভদ্রলোক কিছুই করতে পারবে না। সব ক্লিয়ার করে ফেলা হয়েছে। তবে আমার আশঙ্কা বাস্টার্ড হয়তো তাকে ছেড়ে দেবে না। কিছু আলামত রয়ে গেছে তার কাছে।”

“মানে?” সিদ্দিকীসাহেব অবাক হয়ে জানতে চাইলেন। “ঐ ইনভেস্টিগেটরকে বাস্টার্ড... মাই গড! আমি আর কোনো খুনখারাবি চাই না, বাবু। যথেষ্ট হয়েছে।”

“আমরা তো আর ওকে খুন করতে বলিনি, বাস্টার্ড তার প্রয়োজনে যা করার করবে, আমাদের কিছু করার নেই।”

দু-পাশে মাথা দোলালেন সিদ্দিকীসাহেব। “আমি চাই না ঐ জেফরি বেগ লোকটার কোনো ক্ষতি হোক। বাস্টার্ডকে যেভাবে পারেন থামান।”

অমূল্যবাবুর কপালে ভাঁজ পড়ে গেল, তবে মুখে কিছু বলল না।

“কী?” সিদ্দিকীসাহেব উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইলেন।

“ভাবছি দেরি হয়ে গেল কি না...”

“মাই গড...কী বলেন! ওকে এক্ষুণি বলে দিন। জলদি!”

***

খুনি সম্পর্কে আমাদের মনে যে ধরণের ছবি গেঁথে আছে এই বাস্টার্ড নামের খুনির সাথে তার কোনো মিলই নেই। নিষ্পাপ চেহারার এক যুবক। দেখলে মনে হবে বয়স বাড়লেও চেহারাটা রয়ে গেছে ফুটফুটে শিশুর মতোই। আর এটাই ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মুহূর্তে জেফরির অবস্থা খুবই নাজুক। মদের প্রভাবে মাথাটাও ঠিকমতো কাজ করছে না। সে একা থাকলে যেটুকু সুবিধা পেতো এখন রেবার উপস্থিতিতে একেবারে বেকায়দায় পড়ে গেছে। পুরোপুরি অসহায় হয়ে পড়েছে সে।

এমন সময় ফোনের রিং বেজে উঠলে তারা দুজনেই চমক উঠল।

না। জেফরির নয়, খুনির ফোনটা বাজছে।

বাস্টার্ড অবাক হয়ে জেফরির পিস্তলটা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে নিজের কোমরে গুঁজে পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করল। কলটা রিসিভ করলেও কিছু বলল না সে। কানে চেপে রেখে কিছুক্ষণ শুনে গেল ওপাশের কথা।

“আপনাদের সাথে আমার ডিল শেষ হয়ে গেছে...” জেফরির দিকে তাকাল খুনি। “আমার সামনেই আছে...আমি খুন করার জন্য টাকা নেই জীবন বাঁচানোর জন্য না।”

জেফরি বুঝতে পারছে ফোনটা সম্ভবত সিদ্দিকীসাহেব করেছেন।

“...বুঝতে পারছেন না...আমার নিজের প্রটেকশনের জন্য করতে হচ্ছে এটা...তাই!...হ্যাঁ...ঠিক আছে!”

জেফরি টের পেল তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে। মদের প্রভাবে যেটুকু ঝিমুনি ভাব চলে এসেছিল সেটাও উধাও হয়ে গেছে এখন। কিছু একটা করতেই হবে। এক্ষুণি!

ফোনে কথা বলতে গিয়ে খুনির হাতে থাকা পিস্তলটি রেবার মাথার পেছন থেকে একটু সরে গেল। সেটা এখন ছাদের দিকে তাক করা। স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া। ব্যাপারটা খুনির অগোচরেই হয়েছে। এক্ষুণি! মনে মনে নিজেকে আবারো তাড়া দিল জেফরি বেগ।

ঠিক তখনই ঘটলো ব্যাপারটা।

আচমকা চারপাশ ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল।

***

অমূল্যবাবু ফোনটা কানে ধরে রেখেছে, কিছু বলছে না। তার চোখমুখ দেখে সিদ্দিকীসাহেব চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

“কি হয়েছে!?”

কানে ফোন ধরে রেখেই বাবু বলল, “গুলির শব্দ!”

“কি?”

“ধস্তাধস্তির শব্দও পাচ্ছি।”

সিদ্দিকীসাহেব অস্থির হয়ে ঘরে পায়চারী করতে লাগলেন।

অমূল্যবাবু ফোনটা এখনও কানে ধরে শুনে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর চোখমুখ কুঁচকে ফেলল সে।

“কি হয়েছে?” পায়চারী থামিয়ে জানতে চাইলেন সি ই এ সিদ্দিকী।

“আরেকটা গুলি!”

***

জেফরি খুনির দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত থেকে পিস্তলটা নিতে উদ্যত হবার আগেই এটা ঘটলো। মুহূর্তেই বুঝে গেল সে, তবে ফোনে কথা বলতে থাকার কারণে বুঝতে দেরি করে ফেলল খুনি।

লোডশেডিং!

ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া খুনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই জেফরি বেগ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার লক্ষ্য ছিল একটাই-খুনির পিস্তল ধরে থাকা হাতটি।

মোবাইল ফোনটা চালু থাকার কারণে অন্ধকারেও খুনির মুখের দিকটা ডিসপ্লের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, ফলে জেফরির নিশানা ব্যর্থ হয়নি।

আর্তচিৎকার দিয়ে ওঠে রেবা। তাকে উদ্দেশ্যে করে জেফরি কেবল একটা কথাই বলতে পেরেছিল—”রেবা! ঘর থেকে বেরিয়ে যাও!”

খুনির পিস্তল ধরা হাতটির কব্জি বামহাতে শক্ত করে ধরে ডানহাতে সজোরে ঘুষি চালায় মাথার বামদিকে। তারা দুজনেই বিছানা থেকে হুরমুর করে মেঝেতে পড়ে গেলে পিস্তল থেকে একটা গুলি বের হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

জেফরি বুঝতে পারে রেবা এখনও বিছানার উপরে, প্রাণপণে চিৎকার দিচ্ছে।

“রেবা! ঘর থেকে বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও!”

জেফরির ফ্ল্যাটে অনেকবার এসেছে রেবা, সবকিছুই তার চেনা। ফলে গাঢ় অন্ধকারেও সেখান থেকে বের হতে কোনো অসুবিধা হয়নি। সিঁড়ি দিয়ে যখন নিচে নামছে ঠিক তখনই দ্বিতীয় গুলির শব্দটা শুনতে পায়। থমকে যায় সে। বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে তার। বুঝতে

পারে না কী করবে। দুচোখ ঠেলে পানি বের হতে শুরু করে। দৌড়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে মেইন রোডে এসে পড়ে। জীবনে এ রকম পরিস্থিতিতে পড়েনি। প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে ছিল কিন্তু গুলির শব্দটা তাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে।

এমনিতেই জায়গাটা নিরিবিলি, লোডশেডিং চলছে বলে একেবারে ভুতুরে লাগছে, তার উপর পরপর দুটো গুলির শব্দে আশেপাশের লোকজন ভয় পেয়ে বন্ধ করে দিতে শুরু করেছে নিজেদের ঘরের দরজা। অনেকে হয়তো ভাবছে ডাকাত পড়েছে।

রাস্তাটা পার হয়ে জেফরির ফ্ল্যাটের দিকে তাকাল সে। বাইরে থেকে ঘুটঘুঁটে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না।

***

ওদিকে অন্ধকারে দু-জন মানুষ নিজেদের সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়ে যাচ্ছে একে অন্যকে ঘায়েল করার জন্য।

এখনও পর্যন্ত খুনির হাত থেকে পিস্তলটা ছাড়াতে পারেনি জেফরি বেগ । এক হাতে খুনির পিস্তল ধরা হাতের কব্জি শক্ত করে ধরে অন্য হাতে ঘুষি মেরেছিল প্রচণ্ড জোরে তারপরও হাত থেকে পিস্তলটা ছাড়াতে পারেনি। পর পর দুটো গুলি বের হয়ে গেছে অস্ত্র থেকে। দুটোই আঘাত হেনেছে ছাদে।

তারা দুজন এখন মেঝেতে ধস্তাধস্তি করছে। জেফরি প্রথমে খুনির উপরে থাকলেও দুটো গুলির শব্দে একটু চমকে যেতেই সেই সুবিধাটুকু নিয়ে নিলো খুনি। খপ করে জেফরির গলা চেপে ধরল, এতোটাই জোরে যে জেফরির মনে হলো তার গলাটা বুঝি ছিঁড়েই ফেলবে।

দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। যেভাবেই হোক হাতটা ছাড়াতে হবে নইলে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে তার সমস্ত শক্তি। কিন্তু খুনির যে হাতে পিস্তলটা আছে সেটা কোনোভাবেই ছাড়া যাবে না, ছাড়লেই গুলি করে বসবে। আবার যে হাতটা দিয়ে তার গলা ধরে রেখেছে সেটাও একহাতে ছাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না।

জেফরি দ্রুত ভাবতে লাগল। এফবিআই'তে যে কমব্যাট ট্রেনিং নিয়েছিল তার সবগুলো কৌশলই ভেবে দেখল সে।

হাঁটু দিয়ে খুনির তলপেটে একটা আঘাত করলেও কোনো কাজ হলো না, উল্টো খুনি তার গলাটা আরো জোরে চেপে ধরল।

জেফরি বেগ টের পেল তার সমস্ত শক্তি দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে আসছে তার হাত-পা।

ঠিক তখনই একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেল তার।

আমার পিস্তলটা!

ডানহাতে খুনির কোমরে গুঁজে থাকা পিস্তলটা এক ঝটকায় হাতে নিয়েই গুলি চালিয়ে বসল জেফরি বেগ ।

একটু আগে সেটা বিছানা থেকে তুলে নিজের কোমরে খুঁজে রেখেছিল খুনি।

একটা চাপা আর্তনাদ। জান্তব গোঙানী!

টের পেল গুলির আঘাতে খুনি তার কাছ থেকে কিছুটা দূরে ছিটকে পড়েছে, সেই সাথে তার গলাটাও মুক্ত হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটু সরে গিয়ে বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে নিলো।

খুনির গোঙানী থেমে গেছে এখন। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জেফরি বেগ আন্দাজ করার চেষ্টা করল ঘরের ঠিক কোথায়, কোন্ পজিশনে আছে। অন্ধকারে ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেছে সে।

বামহাতে বিছানার প্রান্ত ধরে উঠে বসল। এখনও হাফাচ্ছে। খুট করে একটা শব্দ হতেই

সেদিকে লক্ষ্য করে আরেকটা গুলি চালাল সে।

বিস্ফোরণের আগুনে ক্ষণিকের জন্যে ঘরের সেই অংশটুকু দেখতে পেল খুবই অল্প সময়ের জন্যে, কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে মেঝের সেই জায়গাটি খালি। ওখানে কেউ নেই!

মাই গড! ওখানেই তো খুনি ছিল! গেল কোথায়?

গায়ের সমস্ত পশম দাঁড়িয়ে গেল তার। আর সময় নষ্ট না করে অন্ধকারেই ছুটে গেল দরজার দিকে। একটু আগে রেবা বের হয়ে গেছে, ফলে দরজাটা খোলাই আছে।

কতো দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল ধারণাও করতে পারল না জেফরি। নিজের ফ্ল্যাট ছেড়ে প্রাণপণে দৌড়ে চলে এল মেইন রোডে। খুনিকে কোনো সুযোগ দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সে জানে তার কাছেও একটি পিস্তল আছে।

"রেবা! রেবা!" চিৎকার করে ডাকতে লাগল সে। অন্ধকার রাস্তায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না, তবে সে জানে রেবা অনেক আগেই তার ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। "রেবা!"

রাস্তার ডানদিকের ফুটপাতে একটি অবয়ব দেখতে পেল সে।

"রেবা!"

হঠাৎ চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠল। লোডশেডিংয়ের সমাপ্তি।

তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রেবা, ভয়ে কাঁপছে। তার দুচোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। জেফরিকে দেখামাত্রই দৌড়ে ছুটে এল, ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকে। কিছুই বলতে পারল না, শুধু জড়িয়ে ধরে কেঁদে চলল কিছুক্ষণ।

এই জীবনে এতোটা প্রশান্তি পায়নি জেফরি বেগ। তার কাছে মনে হলো এক মুহূর্তে সে হারানো সব কিছু ফিরে পেয়েছে।

***

একটি খুনের ব্যবচ্ছেদ

ভিটা নুভার দারোয়ান মহব্বত সেন্ট্রি বক্সে বসে আছে। ঘড়ির দিকে তাকাল সে। ৬টা বাজতে ১০ মিনিট বাকি। তার ডিউটি শেষ হবে ঠিক ছ টায়। গেট দিয়ে এক লোককে ঢুকতে দেখে সেন্ট্রি বক্স থেকে বেরিয়ে এল।

"কই যাইবেন?"

লোকটার হাতে খাকি ব্যাগ। একটা কার্ড বের করে দেখাল সে। "টাওয়ারে যাবো।"

মহব্বত আইডিকার্ডটা দেখে কোনো কিছু না বলে ফেরত দিয়ে দিলে লোকটা পার্কিং এরিয়ার লিফটের দিকে পা বাড়াল।

ভিটা নুভার নাইটগার্ড আসলাম ডিউটিতে এল দশ মিনিট পর। রাত থেকে ভোর পর্যন্ত ডিউটি করবে সে। ছুটি পেয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল মহব্বত।

***

রাত দুটো বাজে।

পূর্ণিমার আলোয় চারপাশটা অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে। ভিটা নুভার ছয়তলার ছাদের সেলফোনের টাওয়ারের উপর থেকে কালো ফুলহাতা হাইনেক গেঞ্জি, কালো প্যান্ট আর মাথায় ক্যাপ পরা এক লোক নেমে এল নিঃশব্দে। তার হাতে একটি খাকি ব্যাগ।

ছাদের দক্ষিণ দিকে এসে নিচের দিকে তাকাল সে, রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা। ব্যাগ থেকে বারো-তেরো ফুটের একটি দড়ি বের করে ছাদের রেলিংয়ের সাথে বেধে নিলো লোকটি। তার ঠিক নিচেই একটা বেলকনি। অন্যসব ফ্ল্যাটের মতো শেড কিংবা গ্রিল দিয়ে সুরক্ষিত করা নেই। মুচকি হাসল সে। এই ভবনের স্থপতিকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল। নিরাপত্তাকে

ছাপিয়ে গেছে সৌন্দর্য!

দড়ি বেয়ে আস্তে করে নেমে গেল সেই বেলকনিতে।

বেলকনির সাইডিং ডোরটা একটু ফাঁক করাই আছে। সিনথেটিক গ্লাভ পরা হাত দিয়ে সেটা আরেকটু সরিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর।

অন্ধকার ঘরে মেডিকেল বেডে একজন শুয়ে আছে। বেলকনির স্লাইডিং ডোর দিয়ে আসা জ্যোত্মার মৃদু আলো ঢুকে পড়েছে ঘরে, চারপাশটা দেখে নিয়ে পা টিপে টিপে বেডের কাছে গিয়ে থামল সে।

এই ঘরে এর আগেও এসেছিল, কয়েক দিন আগে, অন্য এক পরিচয়ে।

বেডের পাশে কফি টেবিলের উপর রাখা ল্যাপটপটির দিকে তাকাল। চালু অবস্থায়ই আছে। টাচপ্যাডে আঙুল ছোঁয়াতেই পর্দায় ভেসে উঠল ইয়াহু মেইলের হোমপেজ। আরেকবার মুচকি হাসল সে। তার কাজটা সহজ হয়ে গেল। তার মানে, তাকে আর জোর করে অসুস্থ লোকটার কাছ থেকে মেইল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড আদায় করার ঝামেলা পোহাতে হবে না।

বেডে শুয়ে থাকা লোকটির দিকে তাকাল। তার দুচোখ ভোলা।

"কে?" ফ্যাসফেসে কণ্ঠে অসুস্থ লোকটি বলল।

কালো পোশাকের লোকটি একটুও চমকালো না। তার নার্ভ বেশ শক্ত। অপেক্ষা করল সে। তার হাতে অনেক সময় আছে, তাড়াহুড়ার কোনো দরকার নেই। অসুস্থ লোকটি আর কিছু বলল না। আরেকটু সময় নিলো সে, তারপর বেডের কাছে গিয়ে একহাতে অসুস্থ লোকটার মুখ চেপে ধরে তার বুকের বামপাশে সজোরে ঘুষি চালাল।

পর পর তিনটি।

শেষে কনুই দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ঘৃণার সাথে আরেকটা আঘাত করল। এ রকম অথর্ব লোককে খুন করার মতো কাপুরুষ নয় সে। তাকে যখন এই খুনের লোভনীয় প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিল কিন্তু সব শুনে অবশেষে রাজি হয়ে যায়। তার নিয়োগকর্তা অবশ্য এসবের কিছুই জানে না। যারা শিশুদের উপর যৌননিপীড়ন চালায় তাদেরকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে সে। অনেক আগে, শৈশবে তার সাথেও এ রকমটি করার চেষ্টা করেছিল আরেকজন বিকৃত লোক। তার পরিণাম এই লোকটার চেয়েও খারাপ হয়েছিল।

অসুস্থ লোকটার মুখ থেকে হাত সরিয়ে দেখল, সে নিশ্চিত, কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হবে। কিন্তু তাকে বিস্মিত করে দিয়ে আচমকা চোখ খুলে যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বলে উঠল লোকটি : "...আমাকে ক্ষমা করে দিও!"

একটু চমকে উঠল খুনি! আরেকটা আঘাত করার জন্যে উদ্যত হতেই দেখতে পেল লোকটি নিস্তেজ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে।

পকেট থেকে একটা পেনড্রাইভ বের করে ল্যাপটপের কাছে গেল সে। পুরো কাজটা করতে মাত্র দশ মিনিট সময় লাগল।

বেলকনিতে এসে নিচের রাস্তার দিকে তাকাতেই তার চোখ আটকে গেল একটা দৃশ্য দেখে, নিচু হয়ে বসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

রাস্তার ফুটপাত থেকে এক ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেলকনিটা দেখছে!

একটু ভড়কে গেল খুনি। কিছুক্ষণ বসে থেকে বেলকনির রেলিং দিয়ে উঁকি মেরে দেখল ছেলেটা এখনও বেলকনির দিকেই তাকিয়ে আছে।

নিচু হয়ে বসে আরেকটু অপেক্ষা করল সে। কিছুক্ষণ পর রাস্তা থেকে হৈহল্লার শব্দ শুনে

আবারো উঁকি মেরে দেখতেই গায়ে কাটা দিয়ে উঠল।

পুলিশ!

ছেলেটা প্রাণপনে দৌড়াচ্ছে, তার পেছনে একটি পুলিশ জিপ ।

জিপটি দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলে খুনি আর দেরি করল না, দড়ি বেয়ে বেলকনি থেকে আবার উঠে পড়ল ছাদে।

দড়িটা খুলে ব্যাগে ভরে নিয়ে টাওয়ারের উপর গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে। এরপর ভিটা নভার নিচে পলিশের আগমন আর টের পায়নি। ফজরের আজানের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল খুনি।

আজান হতেই টাওয়ার থেকে নেমে এল। খাকি ব্যাগ থেকে একটা পাজামা আর পাঞ্জাবি বের করে পোশাক পাল্টে বাকি পোশাক আর দড়ির গোছাটা ব্যাগে ভরে নিলো সে। ছাদের উত্তর দিকে গিয়ে আস্তে করে নিচে ফেলে দিল ব্যাগটা। এই ভবনের উত্তর অংশে একটা লেক চলে গেছে। ব্যাগটা গিয়ে পড়ল লেকের পাশে থাকা সারি সারি গাছের নিচে।

তারপর ছাদ থেকে সিঁড়ি দিয়ে সোজা চারতলায় এসে অপেক্ষা করল হানিফসাহেবের জন্যে। দীর্ঘ দিন পর্যবেক্ষণ করে সে জানে, এই ভদ্রলোক এখনই ফজরের নামাজ পড়তে বের হবে। তিনতলার একটি ফ্ল্যাটে দরজা খোলার শব্দ হতেই সে সজাগ হয়ে উঠল। বুঝতে পারল হানিফসাহেব বের হচ্ছে। ভদ্রলোক লিফটে ঢোকার পর পরই দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গেল

হানিফসাহেব যখন লিফট থেকে বের হয়ে পার্কিং এরিয়া দিয়ে মেইনগেটের দিকে এগোতে লাগল খুনি তার পিছু নিলো। সদ্য ঘুম থেকে ওঠা হানিফসাহেব অবশ্য টের পেল না তার পেছনে আরেকজন আছে। টের পেলেও কোনো সমস্যা হতো না। ভদ্রলোক মনে করতো অন্য কোনো ফ্ল্যাটের গেস্ট হয়তো।

নাইটগার্ড ছেলেটি হানিফসাহেবকে দেখেই সালাম দিয়ে মেইনগেটটা খুলে দিল। খুনি নাইটগার্ডের দিকে তাকাল না, যেন হানিফ সাহেবের সাথে সাথে সে-ও নামাজ পড়তে যাচ্ছে এ রকম একটি ভান করে বের হয়ে গেল ভিটা নুভা থেকে।

অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে লেকের যে জায়গায় ব্যাগটা ফেলে দিয়েছিল সেটা তুলে নিতেই শুনতে পেল পুলিশের গাড়ি এসে মেইনগেটের সামনে থেমেছে। আর দেরি না করে লেকের ওয়াকওয়ে ধরে চলে গেল খুনি।

***

উপসংহার

বাস্টার্ড নামের খুনির ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক। এটা নিশ্চিত, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরও জেফরির আগেই ঘর থেকে বের হয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে সে, কারণ এরপর পুলিশ এসে ঘরে কাউকে খুঁজে পায়নি। সবচেয়ে বড় কথা কোনো রক্তপাতের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। পুলিশের ধারণা খুনিকে গুলি করতে ব্যর্থ হয়েছে জেফরি, কিন্তু সেটা অসম্ভব। খুনির তলপেটে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করেছে সে।

তবে জেফরি এ ঘটনায় একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে : খুনি সম্ভবত বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরে ছিল। গুলির আঘাতে একটু আহত হয়, তারপর গড়িয়ে বিছানার নিচে চলে যাবার সময় দ্বিতীয় গুলিটা করে জেফরি। আর ঘর থেকে সে বেরিয়ে যাবার ঠিক আগেই খুনি সেখান থেকে সটকে পড়ে।

জেফরিকে গুলি করার মোক্ষম সুযোগ পেয়েও তাকে গুলি করল না কেন?

সম্ভবত ফোনে সিদ্দিকীসাহেবের শেষ নির্দেশ মেনে খুনি এ কাজ করেনি।

পুরো ঘটনায় জেফরির একটাই প্রাপ্তিরেবা!

তার কাছে ফিরে এসেছে মেয়েটি। বাবা-মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে সব মেনে নিয়ে প্রবাসী এক পাত্রকে বিয়ে করার জন্যে রাজি হয়েছিল সে। কাবিন করে ছেলে চলে যাবে কানাডায় তারপর কয়েক মাস পর ফিরে এসে বিয়ের অনুষ্ঠান করে রেবাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু কাবিনের দিন যতোই ঘনিয়ে আসতে লাগে রেবার মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ততোই বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত কাবিনের আগের দিন রাতে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারেনি।

একটা ভয় জেঁকে বসে তার মধ্যে-জেফরিকে হারানোর ভয়। এক অচেনা মানুষের সাথে সারাজীবন কাটানোর ভয়। সাহস করে মুখোমুখি হয় বাবার। স্পষ্ট বলে দেয় তার পক্ষে এ বিয়ে করা সম্ভব নয়। পরিবারের কেউই তাকে বোঝাতে পারেনি। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকে সে। ভেঙে দেয়া হয় বিয়ে।

এ ঘটনার পর থেকে নিজের পরিবারে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে সে। গুমোট পরিবেশে একটা সপ্তাহ কাটিয়ে দেয়। নিজের বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই তার সঙ্গে শীতল আচরণ করতে শুরু করে। দম বন্ধ হয়ে আসে তার। সিদ্ধান্ত নেয়। জেফরির কাছে ফিরে যাবে। বাড়ি থেকে বের হয়ে সোজা চলে আসে তার ফ্ল্যাটে।

জেফরি বেগ এখন জায়েদ রেহমান হত্যাকাণ্ডের পুরো ঘটনাটা জানতে পেরেছে কিন্তু তার করার কিছুই নেই। এই ঘটনাটি সে কোনোভাবেই আইনের চোখে প্রমাণ করতে পারবে না। তবে তার মনে ক্ষীণ আশা সিদ্দিকীসাহেব হয়তো মিসেস রেহমান আর আলম শফিককে নির্দোষ প্রমাণ করার ব্যবস্থা নেবেন।

কিন্তু সাংবাদিক পাভেল আহমেদের খুন এবং সেই ইন্টারভিউটি একেবারেই আড়ালে চলে গেছে। কেউ জানে না লেখক জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের সাথে পাভেল আহমেদের হত্যার যোগসূত্র রয়েছে। অন্য অনেকের মতো এ ব্যাপারে জেফরির কোনো ধরাণাই নেই।

লেখক জায়েদ রেহমানের যে ইন্টারভিউটি নিয়েছিল পাভেল সেটাতে ছোট্ট একটি ঘটনা ছিল : সদ্য স্ট্রোকে আক্রান্ত লেখক মানসিকভাবে একটু ভারসাম্যহীন ছিল বলে ইন্টারভিউয়ের এক পর্যায়ে অসংলগ্নভাবে বলে ফেলেন, তিনি আশঙ্কা করছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ি এবং শিল্পপতি সি ই এ সিদ্দিকী তার ক্ষতি করতে পারেন।

সাংবাদিক পাভেল আহমেদ অনেক কষ্টে এই ইন্টারভিউটা নিতে পেরেছিল। মিসেস রেহমান একজন মিডিয়া সেলিব্রিটি হওয়ায় পাভেলের সাথে তার পরিচয় ছিল, ঐ

ভদ্রমহিলাই তাকে ইন্টারভিউ নেবার সুযোগ করে দেয়। তবে বিশাল অঙ্কের বিজ্ঞাপন হারানো এবং মানহানি মামলার ভয়ে সি ই এ সিদ্দিকীর মতো বিজনেস টাইকুনের বিরুদ্ধে বলা এ রকম অসংলগ্ন কথা প্রচারের ঝুঁকি নিতে চায়নি কেউ।

বিগত এক সপ্তাহ ধরে রেবা জেফরির সাথেই আছে। খুব শীঘ্রই বিয়ে করার জন্য তাগাদা দিচ্ছে সে তবে জেফরি তাকে বলেছে এভাবে এক ছাদের নিচে থাকতে তার ভালোই লাগছে। রেবা অবশ্য স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে তাকে, যতো এত সম্ভব মিসেস বেগ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। রেবার বাবা অবশ্য জেফরির সাথে যোগাযোগ করে তার সাথে দেখা করার জন্য বলেছিল, তবে এখন পর্যন্ত জেফরির সে-রকম কোনো ইচ্ছে নেই।

***

দু-দিন ধরে শৈত্যপ্রবাহ চলছে। গতকাল জগিং করা হয়নি, রেবার সাথে সারাটা সকাল বিছানায় গল্পগুজব করে কাটিয়ে দিয়েছে। তবে আজকে আর সেটা করেনি, প্রবল শৈত্যের মধ্যেও চলে এসেছে। রেবা অবশ্য বলেছিল এই ঠাণ্ডার মধ্যে জগিং না করলেও চলবে কিন্তু জেফরি তার কথা শোনেনি। এক দিন জগিং না করলেই তার শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে।

প্রায় বিশ মিনিটের মতো জগিং করার পর একটু ঘেমে উঠল সে। ধানমণ্ডি লেকের পাশ দিয়ে ছোট্ট একটা ওয়াকওয়ে ধরে আস্তে আস্তে দৌড়াচ্ছে। সামনের তিন-চার গজ দুরের দৃশ্য পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে বলে জগারের সংখ্যা নেমে এসেছে শূন্যের কোঠায়।

হঠাৎ টের পেল তার পেছনে আরেকজন জগার আছে। জগিংরত অবস্থায়ই ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখল সে, কিন্তু প্রচণ্ড কুয়াশার কারণে লোকটার চেহারা দেখতে পেল না। তার থেকে দশ-পনেরো গজ দূরে হবে, মাথায় হুড দেয়া একটি ট্রাকসুট পরে আছে, শুধু এটুকুই বুঝতে পারল।

কিছু দূর যাওয়ার পর টের পেল পেছনের লোকটি তার খুব কাছে এসে পড়েছে। অজানা এক আশঙ্কায় তার শরীরের সমস্ত পশম দাঁড়িয়ে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে না দেখে দৌড়ানোর গতি আরেকটু বাড়িয়ে দিল সে। পেছন থেকে নিশ্বাসের যে শব্দ শুনতে পাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে লোকটাও গতি বাড়িয়ে তার খুব কাছে চলে এসেছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে যাবে তার আগেই পেছন থেকে লোকটা তার গতি বাড়িয়ে জেফরিকে অতিক্রম করে চলে গেল সামনের ঘন কুয়াশার দিকে। হাফ ছেড়ে বাঁচলো সে। খামোখাই আশঙ্কা করেছিল।

মুচকি হেসে নতুন উদ্যমে দৌড়াতে শুরু করল জেফরি। প্রায় পঞ্চাশ গজ এগোবার পরই ওয়াকওয়েতে একটা এনভেলপ পড়ে থাকতে দেখে থেমে গেল সে। বুঝতে পারল এনভেলপটি এইমাত্র এখানে ফেলে দিয়ে গেছে কেউ।

বাস্টার্ড!?

চারপাশে তাকিয়ে দেখল কেউ নেই। জেফরির হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এনভেলপটি তুলে নিয়ে আবারো চারদিকে তাকাল। উপরে সুন্দর করে লেখা : জেফরি বেগ।

এনভেলপ খুলে দেখতে পেল ভেতরে ছোট্ট একটি চিরকুট আর দলা পাকানো একটি ধাতব বস্তু। স্লগ! ব্যবহৃত বুলেট। চিরকুটটা খুলে পড়ল সে :

তোমার বুলেট তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম! অযাচিত উপহার আমি গ্রহণ করি না।
আমাকে নিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি তোমার মতো জীবন যাপন করো, আমি আমার মতো। তোমার সাথে দেখা করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। তুমিও সে-রকম কোনো ইচ্ছে

পোষণ কোরো না। তোমার বিয়ের অগ্রীম শুভেচছা রইল।

বুলেটটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জেফরি বেগ, তারপর ছুঁড়ে মারল লেকের ঘোলা পানিতে।

জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের পুরো ঘটনাটি সে কোনো দিনই প্রমাণ করতে পারবে না। কাউকে বললেও বিশ্বাস করবে না বিশিষ্ট ব্যবসায়ি শিল্পপতি সি ই এ সিদ্দিকী তার ছেলের প্রতি জঘন্য এক অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে জনপ্রিয় এক লেখককে খুন করিয়েছেন।

অবশ্য সে যদি লেখক হোতো এই ঘটনাটি নিয়ে একটা বই লিখতে পারতো।

এই প্রথম জেফরি বেগ লেখকদের ঈর্ষা করল।